

Barcode - 4990010202817

Title - Chithipatra vol.6

Subject - LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE

Author - Tagore, Rabindranath

Language - bengali

Pages - 309

Publication Year - 1879

Creator - Fast DLI Downloader

<https://github.com/cancerian0684/dli-downloader>

Barcode EAN.UCC-13



4 990010 202817

স্বাক্ষর

চিঠিপত্র ১ ॥ শ্রী মৃগালিনী দেবীকে লিখিত

চিঠিপত্র ২ ॥ শ্রী রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

চিঠিপত্র ৩ ॥ শ্রীমতী প্রতিমা দেবীকে লিখিত

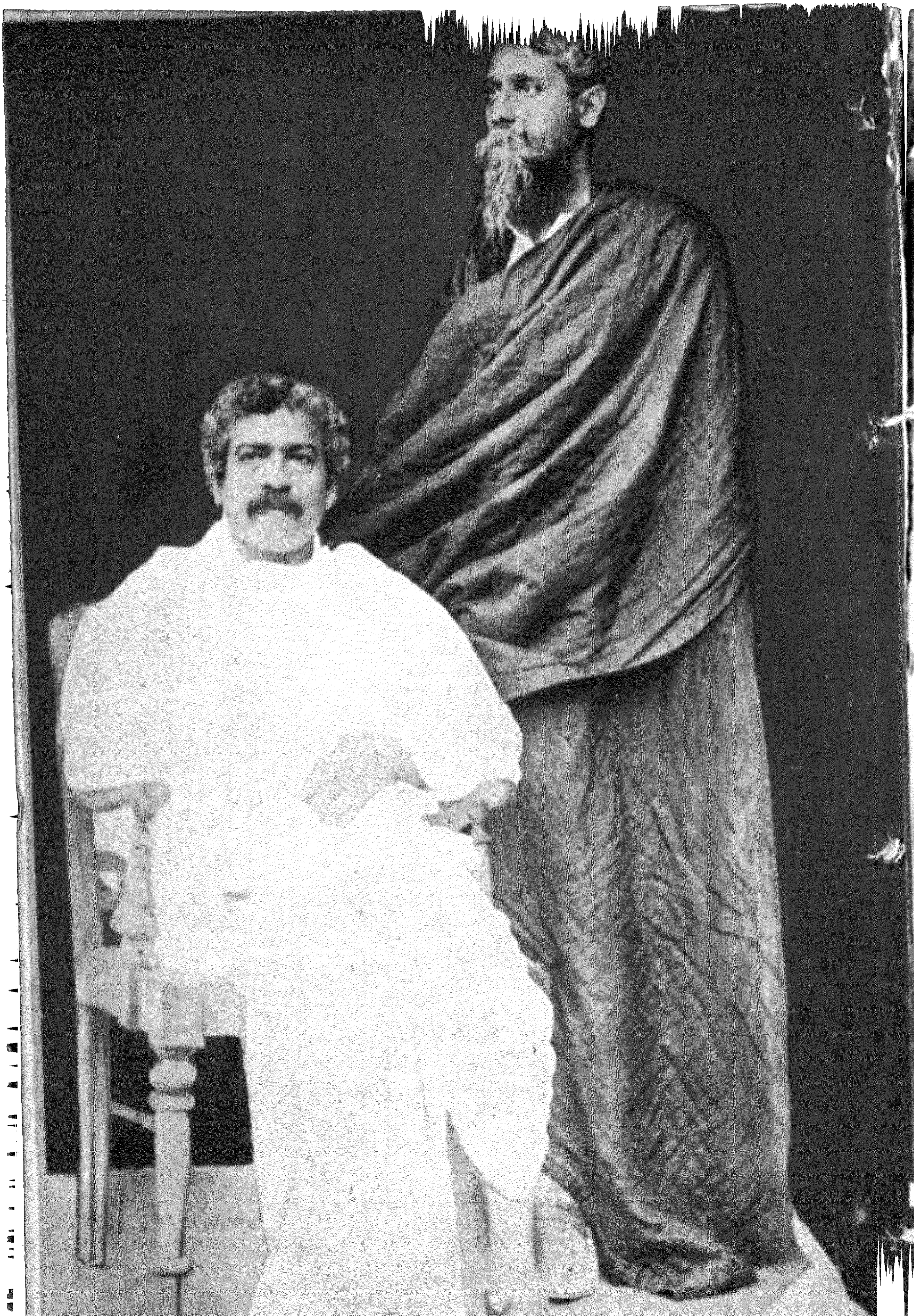
চিঠিপত্র ৪ ॥ বাধুরীলতা দেবী, শ্রীমতী মীরা দেবী, দোহিত্র নীতীন্দ্রনাথ, দোহিত্রী
শ্রীমতী নন্দিতা ও পৌত্রী শ্রীমতী নন্দিনীকে লিখিত

চিঠিপত্র ৫ ॥ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর,
শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী ও প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত

ছিন্নপত্র ॥ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে লিখিত

পথে ও পথের প্রান্তে ॥ শ্রীমতী রানী মহলানবীশকে লিখিত

ভাসুসিংহের পত্রাবলী ॥ শ্রীমতী রাঘু দেবীকে লিখিত



ষষ্ঠ খণ্ড

চিঠিপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

২, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা

चिठिपत्र ॥ षष्ठं खण्ड
प्रकाशः वैशाख १८१२ मे १२५१

श्रीपुलिनविहारी सेन -कईक संकलित

प्रकाशक श्रीपुलिनविहारी सेन
विश्वभावती । ७७ द्वावकानाथ ठाकुर लैन । कलिकाता १

मुद्रक : श्रीगोपालचन्द्र बाय
नाडाना प्रिन्टिं एआर्कस् प्राईभेट लिमिटेड
४१ गणेशचन्द्र अ्याभिनिउ । कलिकाता १७

সৃষ্টিপত্র

প্রবেশক : বিজ্ঞান-লক্ষীর প্রিয় পশ্চিমমন্দিরে	
আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুকে লিখিত পত্রাবলী	১
অবলা বসু মহোদয়াকে লিখিত পত্রাবলী	৮১
পরিশিষ্ট	
১ জগদীশচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কবিতা	২৭
২ রবীন্দ্রনাথের নিবন্ধ	১০৫
৩ রবীন্দ্রনাথের পত্র	১২২
৪ রবীন্দ্র-জগদীশ-প্রশ্নোত্তর	১৩৯
৫ জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে অন্যান্য পত্র	১৪৩
গ্রন্থপরিচয়	১৫৫

চিত্রসৃষ্টি

রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র	প্রবেশক
জগদীশচন্দ্র, লোকেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য	৩৪
বিলাতে জগদীশচন্দ্র	৩৫
পাতুলিপি-চিত্র	
১ সংবর্ধনা সংগীত : জয় হোক তব জয়	১০০
২ যেদিন ধরণী ছিল ব্যথাহীন বাণীহীন মরু	৭৪-৭৫
৩ আবাহন : মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন	৬৪
৪ রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার -প্রাপ্তিতে জগদীশচন্দ্র	৬২
৫ জগদীশচন্দ্রকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র	২৬

বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিমমন্দিরে
দূর সিদ্ধুতীরে,
হে বন্ধু, গিয়েছ তুমি ; জয়মালাখানি
সেথা হতে আনি
দীনহীনা জননীর লজ্জানত-শিরে,
পরায়েছ ধীবে ।
বিদেশের মহোজ্জ্বল মহিমা-মণ্ডিত
পণ্ডিত-সভায়
বহু সাধুবাদধ্বনি নানা কণ্ঠববে
শুনেছ গৌরবে !
সে ধ্বনি গভীর মন্ড্রে ছায় চারিধার
হ'য়ে সিদ্ধুপার ।

আজি মাতা পাঠাইছে—অশ্রুসিক্ত বাণী
আশীর্বাদখানি
জগৎ-সভার কাছে অখ্যাত অজ্ঞাত
কবিকণ্ঠে, ভ্রাতঃ !
সে বাণী পশিবে শুধু তোমারি অন্তরে
ক্ষীণ মাতৃস্বরে ।

आचाय जगदीशचन्द्र वसुके लिखित

ও

কলিকাতা

প্রিয়ববেষু

বলেন্দ্রনাথ ও আমার পুত্র রথীর রোগপরিচর্য্যাব জ্ঞান আমাকে হঠাৎ কলিকাতায় আসিতে হইয়াছে— প্রায় পনেরো দিন এইখানেই কাটিয়াছে, আরও দিন পাঁচ সাত কাটিতে পারে। নিজেও সুস্থ নহি।

এদিকে অকালবর্ষা নামিয়াছে— ঠিক শ্রাবণ মাসের মত। ইহাতে আমার কোন আপত্তি ছিল না, শঙ্কা হয় পাড়ে প্রকৃতি শ্রাবণ মাসে ফাঁকি দিয়া বসেন। দার্জিলিংএ যদি এখানকার অনুরূপ বর্ষার প্রাচুর্য্য হইয়া থাকে তবে আপনার সৌভাগ্য আমি ঈর্ষা করি না। পাহাড়ের বর্ষা আমাদের বাঙ্গালীর কাম্মার মত একঘেয়ে এবং অবিশ্রাম। তবু একবার আপনাদের শৈলনীড়ের মধ্যে অকস্মাৎ অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা হয়— কিন্তু অবকাশ এবং পাখা না থাকায় সে ছরাশা মনে স্থান দিই না। রোগতাপের মধ্যে লেখাপড়া বন্ধ আছে— সুযোগের অপেক্ষা করিতেছি— এক একবার ভাবি সুযোগও হয়ত আমার অপেক্ষা করিতেছে— জোর করিয়া মনটাকে

সংগ্রহ করিয়া আনিয়া একবার লিখিতে বসিলেই হয়—
কিন্তু সেই জোরটুকু সম্প্রতি পাইতেছি না ।

কতকগুলি পৌরাণিক গল্প আমার মস্তিষ্কের মধ্যে আশ্রয়
লইয়াছে— যেমন করিয়া হোক তাহাদের একটা গতি করিতে
হইবে— তাহারা আমার কণ্ঠাদায়ের মত— পার্লিকের সহিত
তাহাদের পরিণয় সাধন করিতে না পারিলে তাহারা অরক্ষণীয়
হইয়া উঠিবে— কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধে ও বাল্যবিবাহটা ভাল
নয়— উপযুক্ত বয়স পর্য্যন্ত ইহাদের কলরব ও উপদ্রব আমাকে
সহ্য করিতেই হইবে । শরীর আজ পীড়িত আছে— এইখানেই
বিদায় গ্রহণ করিলাম । ইতি ১৩ই জ্যৈষ্ঠ । ১৩০৬

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ও

শিলাইদহ
কুমারখালি
E. B. S. Ry.

প্রিয়ববেষু

দার্জিলিঙেব ঠিকানায় আমি আপনার পত্রেব উত্তর
দিয়াছিলাম, পাঠিয়াছেন কি না জানি না। আপনার পত্রে
দার্জিলিং ছাড়া আর কোন প্রকার বিশেষ ঠিকানা লিখিত
ছিল না। এ পত্র কলিকাতার ঠিকানায় লিখিলাম।

যেকপ প্রবল বর্ষা পড়িয়াছে এখন বোধ কবি নদীনির্মল
ও সঙ্ক সঙ্ক বহুতর ভূখণ্ড শিলাখণ্ড পাহাড় ডাড়িয়া নীচে
নামিয়া আসিতেছে— আপনারা কি শিখবদেশেই অটল হইয়া
থাকিবেন? যদি নাহেন ত এষ্ট পদ্মা নদীর পথটা কি অমুসবণ
করিতে পাবেন না? এখন আকাশ মেঘে, নদী জলে, এবং
পৃথিবী শস্যে পরিপূর্ণ। ঘরের বাহির হওয়া শক্ত কিন্তু
জানালি আছে কি করিতে? আপনাদের বাইসিকল্ চলিবার
মত একটা পথ গড়িয়া লওয়া গেছে।

আশ্বীষদের পীড়া লইয়া প্রায় এক মাস কলিকাতায়
ছিলাম— সম্প্রতি ফিরিয়া আসিয়া আপনাদের সেই অধ্বস্ত

গল্পটিতে হাত দিয়াছি। মাসিক পত্রিকার তাড়া নাই—
আপন মনে আশ্বে আশ্বে লিখি। কোন একদিন সায়াছে
আপনাদের সেই কোণেব ঘবে বসিয়া বোধ করি পড়িয়া
শুনাইবার অবকাশ পাঈব। ইতি ৪ঠা আষাঢ়। ১৩০৬

আপনাব

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শিলাইদহ

কুমাবখালি

১০ই আষাঢ় ১৩০৬

প্রিয়ববেষু—

আপনার পত্রখানি পড়িয়া আমি বিশেষ সাস্তুনা ও আনন্দ লাভ করিয়াছি। স্তুতিনিন্দার প্রতি উদাসীন থাকিতে বিশেষ চেষ্টা করি, কৃতকার্য হইতে পারি না বলিয়া যথাসম্ভব দূরে থাকি ; কিন্তু সংসারকে ফাঁকি দেওয়া চলে না ; প্রেমদাসের একটা গানে আছে :—

বৃথা শোচ কুছ কাম ন আওয়ে—

ভোগ বিনা নাহি মিটনা।

বৃথা শোক করিয়া কোন ফল হয় না— যাহা ভোগ করিবার তাহা না করিয়া এড়াইবাব যো নাহি। কিন্তু ছুঃখের মধ্যে পবন সুখ এই যে বন্ধুদের সম্মুখে হৃদয় নিজের বেদনার নিকট অগ্রসব হইতে দেখি।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় কৃষ্ণে ২০টি রেশমের গুটি আমার ঘরে ফেলিয়া গিয়াছিলেন। আজ দুই লক্ষ ক্ষুধিত কীটকে দিবারাত্রি আহার এবং আশ্রয় দিতে আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি— দশ বারোজন লোক অহর্নিশ

তাহাদের ডালা সাফ করা ও গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে পাতা আনার কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে— লবেন্স্ স্নান-আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কীট-সেবায় নিযুক্ত। আমাকে সে দিনের মধ্যে দশ বার করিয়া টানাটানি করে— প্রায় পাগল করিয়া তুলিল। ষ্ট্রবেজ জাতি কেন যে সকল বিষয়ে কৃতকার্য হয় তাহাব প্রত্যক্ষ কারণ দেখিতেছি। উহাদের শক্তি চালনা করিবার জন্য বিধাতা উনপঞ্চাশ বায়ু নিযুক্ত করিয়াছেন, অথচ উহাদের মধ্যে বোঝাই এত আছে যে কাং কবিত্তে পাবে না। এখন যদি আমাদের কীটশালায় একবার আসিত্তে পারিত্তেন তবে একটা দৃশ্য দেখিত্তে পাষ্টতেন। বৃহৎ ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। কোন এক সময় ছুটি পাষ্টলে এদিককার কথা স্মরণ করিবেন।

আমাব চাষ-বাসেব কাজও মন্দ চলিত্তেছে না। আমেবিকান ভূট্টাব বীজ আনাষ্টয়াছিলাম— তাহাব গাছগুলি দ্রুত-বেগে বাড়িয়া উঠিত্তেছে। মান্দ্রাজি সব ধান বোপণ কবাষ্টয়াছি, তাহাতেও কোন অংশে নিবাস হষ্টবার কাঙ্গ দেখিত্তেছি না। দ্বিজেন্দ্রলালবাবু সোমবাবে সঙ্গীক আমাব শস্ত্রক্ষেত্র পর্যাবেক্ষণ করিত্তে আসিবেন।

আপনাবা উভয়ে আমাদের আশ্চরিক শ্রীতি-অভিবাদন গ্রহণ করিবেন।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রিয় বন্ধু,

চুপচাপ বসে একখানা ফরাসী বাকবণ নিয়ে ওল্টাচ্ছিলুম এমন সময় চিঠিখানি পেয়ে মত ভেকের মধ্যে তড়িৎ-প্রবাহের সঞ্চাব হ'য়ে খুব ধড়ফড় ক'বে উঠেছি। লোকেনকে, সুবেনকে আপনাব চিঠিখানা দেখাবার জন্যে ছটফট কবচি, কিন্তু তাবা দূবে, আজই তাদেব লিখে পাঠাতে হবে। যুদ্ধ ঘোষণা ক'বে দিন্। কাউকে বেয়াং কব্বেন না— যে হতভাগা surrender না কব্বে, লর্ড ববার্টসেব মত নিশ্চয় চিত্তে তাদেব পুৰাতন ঘব-ছ্যাব তর্কানলে ছালিয়ে দেবেন— আপনি এক সৈন্য-সম্প্রদায়ের সঙ্গে আব-এক সৈন্য-সম্প্রদায় গৌথে যে-বকম বাহ বচনা কবেচেন তাতে প্রিটোবিয়ায় ত্রিষ্টমাস্ কবতে পাব্বেন ব'লে আমাব দৃঢ় বিশ্বাস। তাবপবে আপনি জয় ক'বে এলে আপনাব সেই বিজয়গৌবব আমবা বাঙ্গালীবা মিলে ভাগ ক'বে নেব— আপনি কি কব্বলেন তা বোঝবাব কিছু দবকাব হবে না, না বুদ্ধি, না অর্থ, না সময় কিছুই খরচ কবতে হবে না, কেবল টাইম্ পাত্রে ইংবেজের মুখ থেকে বাহবা শোনবামাত্র সেই বাহবা আমবা লুফে নেব। তখন

আমাদের দেশীয় কোন বিখ্যাত কাগজে বলবে, আমরা বড় কম লোক নই ; অন্য কাগজে বলবে, আমরা বিজ্ঞানে নব নব তথ্য আবিষ্কার কব্চি ;— এদিকে আপনার জন্মে কাবো সিকি পয়সার মাথাব্যথা নেই, কিন্তু যখন জগৎ থেকে যশের কমল হবে আনবেন তখন আপনি আমাদের ;— চাষের বেলা আপনি একা, লাভের বেলা আমরা সবাই . অতএব আপনি জয়ী হ'লে আপনার চেয়ে আমাদেরই জিৎ ।

আপনি 'ক' বিন্দুতে কম্পমান, আমি 'খ' বিন্দুতে দিবা নিশ্চেষ্টে নিকদ্বিগ্ন হ'য়ে ব'সে আছি— আমার চাবিদিকে আমন ধান এর আখের ক্ষেত আসন্ন শবদের শিশিরাক্ত বাতাসে দৌড়লামান । শুনে আশ্চর্য্য হবেন, একখানা Sketch book নিয়ে ব'সে ব'সে ছবি আক্চি । বলা বাহুল্য, সে-ছবি আমি প্যাবিস সেলোন-এর জন্মে তৈরী কব্চিনে, এক কোন দেশের গ্যাশগানা গ্যালাবী .য এগুলি স্বদেশের ট্যাগ বাডিয়ে সতসা কিনে নেবেন এরকম আশঙ্কা আমার মনে লেশমাধ নেই । কিন্তু কুৎসিত ছেলের প্রতি মার যেমন অপূর্ণ ক্ষেত জন্মে .যেমন যে বিজাটা ভাল আসে না সেট্টেটের উপর অস্থবের একটা টান থাকে । সেই কারণে যখন প্রতিজ্ঞা কব্লুম, এবাবে .যাল আনা কুঁড়েমিতে মন দেবো তখন ভেবে ভেবে এই ছবি আকাটা আবিষ্কার কবা গেছে । এই সম্বন্ধে উন্নতি লাভ কব্বার একটা মস্ত বাধা হয়েছে এই যে, যত পেন্সিল চালাচ্ছি তার চেয়ে ঢের বেশী ববার চালাতে

হচ্ছে, সুতরাং এই ববাব চালনাটাই অধিক অভ্যাস হয়ে
 যাচ্ছে— অতএব মৃত ব্যাফেল্ তাঁর কবরের মধ্যে নিশ্চিন্ত
 হয়ে মরে থাকতে পাবেন— আমার দ্বারা তার যশের কোন
 লাভ হবে না।

লোকের আসন্ন পূজার ছুটিতে আমাকে তার ভ্রমণের
 সহচর করে সিমলা-শিখরে টান্ডার জগো চড়া করতে— কিন্তু
 আমি নড়চিনে। ঋষিরা যখন পবিত্র-শিখরে উপস্থিত করতে
 যেতেন তখন সে এক সময় ছিল— কিন্তু এখন যে গিরিশঙ্কর
 শিখরে নেই সে কথা আপনার আগেচর নেই। আশা করি,
 দার্জিলিং-এর সেই পথে-পাওয়া বন্ধটিকে ভোলেননি। আমি
 আমার পদ্মা-তীরের কলহ স-মুখের বালুতে শাবদ্রার শুভ
 শুভ সমাগম প্রতীক্ষা করছি। বোধ করি, মনে আছে, আপনি
 আমাকে একটি ভ্রমণ-সঙ্গ-দানের প্রতিশ্রুতি করেছেন, কাশ্মীরে
 থাক্, উড়িষ্যায় থাক্, ত্রিবন্ধুরে থাক্, আপনার সঙ্গে ভ্রমণ
 করে আপনার জীবনচরিত্রের একটি অধ্যায়ের মধ্যে ফাঁকি
 দিয়ে স্থান পেতে ইচ্ছে করি। আশা করি, বর্ণিত করবেন
 না— সেই ভবিষ্যৎ কোন একটা ছুটির জগো পাথের সপ্ন
 করে রাখি। গৃহিণী আমার অনতিদূরে একটা কেদারায় বসে
 আমাকে স্নানাত্মক জগো অত্যন্ত তাগিদ করছেন— বেলাও
 হয়েছে। অতএব ক্ষণকালের জগো মাঙ্কনা করবেন— আমার
 অধিক দেবী হবে না।

লোকের আমার যে কাব্য-চয়ন প্রকাশে প্রবৃত্ত ছিল

মাঝখানেে বলাতে গিয়ে তার উত্তম কিছু যেন ক'মে এসেছে ।
 সে যদি কিছু না মনে করে তা'হলে আমি নিজেই এ কাজে
 হাত দিতে পারি । আমি ছবি আঁক্চি শুনে যদি আশ্চর্য্য হন
 ত লোকেন কবিতা লিখতে ব'সে গেছে শুনে বোধহয় কম
 আশ্চর্য্য হবেন না । তার এতই ছববস্থা হয়েছে ! বেচাবাকৈ
 শেষকালে কবিতা লেখালে । ওমার খায়েমের বাঙ্গলা
 পদ্যাবাদ কব্চে । ছই-একটা নমুনা দেখলে তাব মনেব
 অবস্থা কতকটা বুঝতে পারবেন :—

মূঢ় তোবা, ত্যজি' সুখ স্বর্গসুখ-আশে
 থাকিস্ মুক্তিব তবে অন্ধ কাবাবাসে ।
 সুদ পাবি ব'লে ফেলে বাখিস্ পাওনা,
 ছাড়ি না নগদ আমি যাহা হাতে আসে !

এই সমস্ত কবিতায় লোকেন মূলধন ফুঁকে দিয়ে ব্যবসা
 চালাবাব প্রস্পেক্টস্ জাবি কবেচে— সুদ চায় না, লাভ চায়
 না, যা কিছু জমা আছে সব উড়িয়ে দিতে চায়— আমি এ
 ব্যবসায়ে শেয়ার কিন্তে প্রস্তুত নই ।

আপনাব শ্যালকজায়া আর্ষা সবলা, বিদ্যার্ণবের কাছ
 সম্প্রতি সংস্কৃত পড়তে আবস্থ কবেচেন । শিক্ষা-প্রণালীটি
 আমাব রচিত । খুব দ্রুত উন্নতি লাভ কর্চেন— পণ্ডিতমশায়
 এমন বুদ্ধিমতী ছাত্রী পেয়ে ভাবী খুসীতে আছেন । আমি
 তাঁকে পূর্বেই আশ্বাস দিয়েছি আমার পদ্ধতি মতে যদি তিনি
 সংস্কৃত শেখেন তাহ'লে এক বৎসবের মধ্যেই তাঁর সংস্কৃত

ভাষায় অধিকার জন্মাবে। তাঁর সংস্কৃত-চর্চায় আমি ভারি আনন্দিত হয়েছি। আমাদের বর্তমান শিক্ষিত মেয়েদের অতিমাত্রায় ইংরেজী চর্চার সামঞ্জস্য রক্ষার জন্মে সংস্কৃত শেখাটা একান্ত দরকার হয়েছে।

মশায়, আপনাব জন্মে পুরীর জমীটি ঠেকিয়ে রাখতে পাবব বলে আশা হচ্ছে না, তার প্রতি ম্যাজিস্ট্রেটের দৃষ্টি পড়েচে। কর্তা আমাকে লিখেচেন, পুরী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের আমাব ঐ ভূখণ্ডটুকুতে ভারি প্রয়োজন হয়েছে। জোব যার মুন্নুক তাব যদি সত্য হয় তাহলে ও জমিটুকু বক্ষা হবে না। আপনি যদি এখানে থাকতে থাকতেই বাড়ী আদম্ব ক'বে দিতে পাবতেন তাহলে ও লোকটা দাবী করতে পাবত না।

আজকের দিনটা ঝোড়া। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন— মানে মানে হঠাৎ মুঘলধারে বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে— মানে মানে বাতাসের দমকা এসে জানলাদবজাগুলো ছুদাড়া ক'বে দিয়ে যাচ্ছে। এই ঝড়-বৃষ্টি-বাদলে বেশ একটি ছুটীক ভাব এনেছে— সেই কম্পপবায়ণ পশ্চিম দেশে এই ভাবটা ঠিক অনুভব করতে পারবেন না। একে ত সপ্তাহের মধ্যে সাত দিন কাজ কবিনে— তাব পরে আবার যেদিন একটু বাদলা হয়, বা শরতের রৌদ্র ওঠে, বা দক্ষিণেব হাওয়া বয়, সেদিন আদও বেশী ছুটী নিতে ইচ্ছে হয়। আমি ঘরের দবজা খুলে শানিগুলো বন্ধ ক'বে বাসে আছি— ঝবঝব শব্দে প্রবল বেগে বৃষ্টি পড়েচে।

পত্রাবৃত্ত দানের বিশ্বাস হ'লে যদি নিকৃতি পেতে ইচ্ছা
করেন তাহলে আর্গ্যাব শরণাপন্ন হ'বেন— তিনি যদি আপনার
হ'য়ে উত্তর দেন তাহলে আমার কোন নালিশ থাকবে না।
তাকে আমার সাদর অভিবাদন জানাবেন। আপনি যে কাজে
গেছেন তার প্রত্যেক টুকরো খবরটুকু পর্য্যন্ত আমার কাছে
পদম উপাদেয়, এটুকু মনে রাখ'বেন। কে কি বল'চে, কি
লিখ'চে, কি হ'চ্ছ' সমস্ত আত্মোপায় জান'বার জন্যে সতৃষ্ণ
হ'য়ে আছি। ইতি শ্রী আশ্বিন ' ১৩০৭]

আপনার
শ্রী বীন্দ্রনাথ সাকুর

বন্ধু

সৌভাগ্য যে নৌকায় চড়ে ন সে নৌকা কি কখনও ডুবিতে পারে ? মহৎ কৰ্ম্ম আপনাকে আশ্রয় করিয়া আছে, আপনাকে অতি শীঘ্র সাবিত্যা উঠিতে হইবে।

আমার একটি লাতুপ্পত্র সাংঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত বলিয়া আমি কলিকাতায় আসিয়াছি— প্রায় আট দ্বি-ঘন্টায় অবসর পাঠি না। তাই আজ মাথার ঠিক না— শরীর অবসন্ন। কাল হইতে তাহার বিপদ কাটিয়াছে বলিয়া আশ্বাস পাঠিয়াছি এখন নিঃসন্দেহ প্রতী দৃষ্টিপাত করিবার সময় আসিয়াছে। মনে করিয়াছি দুই-চারি দিন বালপদ ষাণ্ঠি-নিকটতনে যাইব।

আমার সমস্ত ছোট গল্প একে ছাপিতে পূর্ণ হইয়াছে। প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছে দ্বিতীয় খণ্ডের অপেক্ষায় আপনাকে পাঠাইতে পারি না। ক্ষেপে, আপনার প্রস্তাব উপলক্ষে প্রথম খণ্ডে পাঠাইতেছি। দ্বিতীয় খণ্ডে অধিকাংশ ভাল গল্প বাহির হইবে। প্রথম খণ্ডে তুচ্ছমান যোগ্য গল্প বোধ হয় নিম্ন কয়েকটি হইতে পারে.— পোষ্টমাষ্টার, কদমল, নিশাথে, কাবুলিওয়াল। এক প্রতিবেশিনী। কিন্তু Mrs. Knight-এর বচনানুগোচর প্রতী আমার বড় একটা আশা না।

ত্রিপুরার মহাবাজাকে আপনার সমস্ত খবরই আমি

পাঠাইয়া থাকি। আপনার প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধার পরিচয় পাইয়া আমি বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছি। তিনি বলিয়া পাঠাইয়াছেন আপনার কার্যের সহায়তার জন্ত তাঁহার পূর্বপ্রতিশ্রুত দানের অপেক্ষা আরো অনেকটা দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

বিজ্ঞাতে কাজ লওয়া সম্বন্ধে কি স্থির করিলেন? এ সম্বন্ধে আমার মত পূর্বেই বলিয়াছি— আপনি দ্বিধামাত্র করিবেন না। আপনার সফলতার পথে যদি আপনার স্বদেশও অস্তুবায় হয় তবে তাহাকেও ক্ষুণ্ণ মনে বিদায় দিতে হইবে।

শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত। একান্ত মনে প্রার্থনা করি সুস্থ হইয়া উঠুন।

আপনার চিরন্তন
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বন্ধু

কিছুকাল থেকে সাংসারিক নানা কাজে আমাকে কলকাতায় বন্ধ থাকতে হয়েছে। কিন্তু কলকাতায় আমার সুখ নেই। পূর্বে এখানে যখন আসতুম তোমাদের ওখানেই সর্বপ্রথমে ছুটে যেতুম, এবারে সে-রকম আগ্রহের সঙ্গে কোনখানে যাবার নেই। আজ প্রভাতেই তোমার চিঠিখানি পেয়ে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হল— তোমার সেই ছোট ঘরটি থেকে তোমার আলাপগুঞ্জন যেমন আমি হৃদয়ে পূর্ণ করে নিয়ে আসতুম নিজেকে আজও সেই রকম পূর্ণ বোধ করছি। এক এক সময় সাংসারিক নানা ঝঞ্জাটে হৃদয় অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে, কাজ করবার শক্তি শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন তোমার সঙ্গে আলাপ কবে এলে কর্তব্যের গৌরব পুনর্বার নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করতে পারি— সংসারের সমস্ত জটিল বাধা তুচ্ছ করবার মত বল মনেব মধ্যে সঞ্চয় করি। তোমার চিঠিতেও আজ অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যে আমার সংসারবন্ধন লঘু হল।

ত্রিপুরার মহারাজ এখন কলকাতায়। তোমার সফলতায় তিনি যে কি রকম আশ্চর্যিক আনন্দ অনুভব করেন তা তোমাকে আর কি বলব! বাস্তবিক তিনি যে হৃদয়ের সঙ্গে

তোমাকে শ্রদ্ধা কৰেন এতেই তিনি বিশেষৰূপে আমাৰ হৃদয়
আকৰ্ষণ কৰেচেন। আজি তোমাৰ চিঠি নিয়ে তাঁৰ ওখানে
যাব— তিনি খুব খুসি হবেন। তুমি তাঁকে অল্পদিন হল যে
চিঠি লিখেছিলে সেখানি পেয়ে তিনি যেন বিশেষ সম্মানিত হয়ে
উঠেছিলেন এমনি উৎফুল্ল হয়েছিলেন। কোনৰূপে তোমাকে
সহায়তা কৰিবাব জন্মে তিনি যেন বাঞ্ছনীয় হয়ে আছেন।

লোকেনকে আমাৰ গল্প তৰ্জমাৰ জন্যে ধৰেছি— কিন্তু সে
নিতাম্বু কড়ে এব নিজেৰ শক্তিব প্রতি বিশ্বাসহীন। সেই জন্মে
তাঁকে কোন কাৰ্যে প্ৰবৃত্ত কৰাতে পাৰি নে। সে এখন আমাৰ
কাৰানিক্ৰমাচনে বাস্তব আছে। তাৰ সঙ্গে অনেক যুদ্ধ কৰে
তাঁকে পৰাস্ত কৰেছি— তাৰ অনেকগুলি সখিব কবিতা এই
Selection থেকে নিৰ্বাচিত কৰে বইটাকে সৰ্বসামান্যৰূপে
গ্ৰহণযোগ্য কৰে তোলা গৈছে এখনো দুই এক জায়গায়
একটি আধটি কণ্টক লুকিয়ে আছে — সে আৰ পাবা গেল না।

আমি আজকাল নানা গোলমালৰ মধ্যে “নৈবেদ্য” বলে
এক একটি কবিতা প্ৰত্যাহ আমাৰ কোন এক অবসৰে লিখে
ফেলে আমাৰ অস্থায়ীমৌক নিবেদন কৰে দিই। আমাৰ
জীৱনেৰ সমস্তু কৃত কৰ্মেৰ সমস্তু চিহ্নিত সকলোৰ সমস্তু দুঃখ-
সুখেৰ কেন্দ্ৰস্থলে যিনি ক্ৰম নিশ্চলভাৱে বিবাহ কৰেচেন এব
সেই সঙ্গে সমস্তু অণুপৰমাণু সমস্তু বিদাট জগৎমণ্ডলেৰ যিনি
একটিমাত্ৰ একান্তুল- — তাৰ কাৰ্যে নিজনে গোপনে প্ৰত্যাহ
জীৱনেৰ একটি একটি দিন সমপূৰ্ণ কৰে দিছি। সে দিনগুলিকে

যদি কেশব দ্বারা পবিত্র করি দিতে পারতুম তাহলেই ভাল হত কিন্তু অমৃত তাতে পত্রপুটে ফুলের মত একটি করে গান সাজিয়ে আমার জীবনের নদীর ঘাটে সেই সমস্তই উদ্দেশ্যে ভাসিয়ে দিয়ে ও সুখ আছে। শীঘ্রই এগুলো ছাপতে দেব— বোধ হয় তুমি ইংলণ্ড থাকতে থাকতেই পাবে। কিন্তু, সখানকার কক্ষ-কোলাহলের মধ্যে আমাদের ভারতবর্ষের নিজস্ব দেবী-লয়ের এই গানগুলি ঠিক যুগে বাজবে কি না জানি না — এর আনন্দ এবং বিষাদ এর শাস্তি সেখানে কি বকম শানাবে ?

মহাবাজের সঙ্গে দেখা করে এলুম— তারে তোমার চিঠি শোনালুম— তিনি ভারি খুশি হলেন। আচ্ছা, তুমি এদেশে থেকেই যদি কাজ করতে চাও তোমাকে কি আমরা সবলে মিলে স্বাধীন করে দিতে পারি নে ? কাজ করে তুমি সামান্য যে টাকাটা পাও সেটা যদি আমরা পবিত্র দিতে না পারি তা হলে আমাদের শিক্ । কিন্তু তুমি সাহস করে এ প্রস্তাব কি গ্রহণ করবে ? পায়ে বন্ধন ছাড়িয়ে পদে পদে লাড়না সহ্য করে তুমি কাজ করতে পারবে কেন ? আমরা তোমাকে মুক্তি দিতে ইচ্ছা করি - সেটা সাধন করা আমাদের পক্ষে যে দুকঠ হবে তা আমি মনে করি না। তুমি কি বল ?

অনেক দিন বিবহী আছি— শিলাউদেহের নীড়টির ডালো প্রাণ কান্দে। ৫ই অগ্রহায়ণ ১৩০৭

তোমার

ব্রাহ্মদেবনাথ ঠাকুর

বন্ধু,

পীড়িত ছিলাম বলিয়া কিছুদিন পত্র বন্ধ ছিল। সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া ঘুবপাক খাইয়া বেড়াইতেছি। বিসর্জন নাটকের অভিনয় হইবে; আমি বঘুপতি সাজিব, সেইজন্য সঙ্গীতসমাজের অনুরোধে পড়িয়া শিলাইদহেব বিবহ স্বীকার করিয়া এই পাষণপুরীর বন্ধনে ধরা দিয়াছি। যত পাব তোমার খবর আমাকে পাঠাইবে— তন্ন তন্ন বিবরণেব জন্য আমি ক্ষুধাতুর— কোন কথা সামান্য জ্ঞান কবিয়া বাদ দিয়ো না। তোমার কৌতুকানীভ মহাভোজের কণাটুকু হইতেও আমি বঞ্চিত হইতে চাই না। ত্রিবেদী তোমাব নবপ্রকাশিত পুস্তিকা হইতে একটা প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন— এ সম্বন্ধে আলোচনাব জন্য তাহার সহিত একবার দেখা করিব।

আমার গল্পেব দ্বিতীয় খণ্ড আর দিন দশেকের মধ্যেই বাহিব হইয়া যাইবে। দুইখণ্ড তোমাব হস্তগত হইলে নিব্বাচন করিবাব সুবিধা হইবে। আমার রচনা-লক্ষ্মীকে তুমি জগৎ-সমক্ষে বাহিব কবিতে উদ্যত হইয়াছ— কিন্তু তাহার বাঙ্গলা-ভাষা-বস্তুখানি টানিয়া লইলে দ্রৌপদীর মত সভাসমক্ষে তাহার অপমান হইবে না? সাহিত্যের ঐ বড় মুষ্কিল—

ভাষাব অস্ত্যুপুবে আত্মীয়-পৰিজনৰ কাছে সে যে ভাবে
প্রকাশমান, বাহিবে টানিয়া আনিত্তে গেলেই তাহার ভাবাত্মব
উপস্থিত হয় । ঐখানে তোমাদেব জিৎ— জ্ঞান ভাষাব অপেক্ষা
তেমন কবিয়া বাখে না, ভাব ভাষাব কাছে আপাদমস্তক
বিকাশিয়া আছে ।

গবশ্শ্ৰুটি যদি তোমাকে ছুটি দিতে সম্মত না হয়, তুমি কি
বিনা বেতনে ছুটি লইতে অধিকাৰী নও ? যদি সে-সম্ভাবনা
থাকে তবে তোমাব সেই ক্ষতিপূৰণেব জনা আমবা বিশেষ
চেষ্টা করিতে পাৰি । যেমন কবিয়া হোক তোমাব কাৰ্য্য
অসম্পন্ন রাখিয়া ফিৰিয়া আসিও না । তুমি তোমাব কশ্শ্ৰু
ক্ষতি কৰিও না, যাহাতে তোমাব অৰ্থেব ক্ষতি না হয় সে
ভাব আমি লইব ।

আমাব গল্পেব অস্ত্যুবাদ ছাপাইয়া কিছু যে লাভ হইবে,
ইহা আমি আশা কৰি না— যদি লাভ হয় আমি তাহাতে
কোন দাবী বাখিতে চাহি না— তুমি যাহাকে খুসি দিয়ো ।

বিসৰ্জন নাটকেব বিহাসাল আমাকে তাগিদ কৰিতেছে—
অতএব বিদায় । ইতি ১২ই ডিঃ [ডিসেম্বৰ ১৯০০]

তোমাব
শ্ৰীববৌন্দ্রনাথ

୮
['ଉତ୍କଳ'ର ୧୦୦]

['ଉତ୍କଳ'ର ୧୦୦]

୬

ବନ୍ଧୁ,

ଆମାଙ୍କେ ତୁମି କି ଏକ ଦିଗ୍‌ଗଞ୍ଜ ପୁରାତତ୍ତ୍ଵ ବଲିୟା ଭ୍ରମ
କବିୟାତ୍ ? ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତବର୍ଷେ ବିଜ୍ଞାନେବ କି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଆଲୋଚନା ହୁଅନ୍ତା ତାହାର ବିନ୍ଦୁ-ବିସର୍ଗ ଓ ଜାନି ନା । ଦ୍ଵିବେଦୀ
ସେକାଳେବ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ (astronomy) ସମ୍ବନ୍ଧେ ଦୁଇଟି ପ୍ରବନ୍ଧ
ତାହାର “ପ୍ରକୃତି” ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥେ ପ୍ରକାଶ କବିୟାତ୍— ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥ
ତୋମାଙ୍କେ ପାଠାନ୍ତୁ ଦିବ । ଅନ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧେ କୋଥା ଓ କିଛି
ଦେଖିୟାତ୍ ବଲିୟା ମନେହି ପଡ଼େ ନା ।

କିଛି ଦିନ ବୋଗାଣାରେ କାଟାନ୍ତୁ ଦିୟାତ୍ । ତାହାର ପର
ଶାସ୍ତ୍ରନିକେତନେବ ଉତ୍କଳରେବ ଜନ୍ମ ଏକ ବନ୍ଧୁତା ଲିଖିତେ ହୁଅନ୍ତା—
ତାହାର ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନ୍ମ “ଚିତ୍ରକୂମାର ସଭା” ଲିଖିତେ ହୁଅନ୍ତା—
ତାହାର ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ-ସମାଜେ ବିସଞ୍ଜନ ନାଟକେବ ଅଭିନୟେବ
ବିହାରୀୟା ଦେଓୟା ଗେଲ— ଆମାଙ୍କେ ବସୁଧାତ୍ ସାଜିତେ ହୁଅନ୍ତା
—ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତା ବିବ୍ରତ ଥିଲ୍ୟା ।

ବିସଞ୍ଜନେବ ଅଭିନୟ ଯତନ ହୁଅନ୍ତା ତୁମି ତତନ ସାତ
ସମୁଦ୍ର ପାରେ କି କବିତେଥିଲେ ? ଉପସ୍ଥିତ ଥାକିଲେ ତୁମି ଧୂମି
ହୁଅନ୍ତା— ଆମିଓ ହୁଅନ୍ତାମ, ବଳା ବାହୁଳ୍ୟା ।

ବଡ଼ ଦାଦା ତାହାର ପାଞ୍ଜିଲିପି ତାମାକେ ପାଠାଣିବାର ଡ଼ଗା
 ଆମାବ ହାତେ ଦିଆଛନ୍ତି । କେନ ଗଣିତ ଓସାଳାକେ ଦିଅ, ଏକବାର
 ଯାଚାଣି କଦିୟା ଲ଼ିତେ ଚାନ - ନିକ଼ସାହଜନକ ବଥା ହ଼ିଲେ
 ବଲିତେ କୁଚ୍ଚିତ ହ଼ିତେ ନା । ତାହାର ଗତେ ହ଼ିତା କିଢ଼ ଡ଼ଟିଲ ଓ
 ବାଢ଼ଲାମସ ହ଼ିୟା ଥାକିତେ ପାଦେ, କିଢ଼ ଦେଧା ବଦିୟା ଦାସିଲେ
 ହ଼ିତାବ ଗଦୋ ନୂତନ ପଦାଥ ମଲା ଅସମ୍ଭବ ନାହ । ଯଦି କହ
 ହ଼ିତାକେ [ସହଜ] କାଦିବାର ଡ଼ଗା କେନ ହ଼ିଚ୍ଛା ଡ଼ାପନ
 କେନେ ତାହା ତିନି ଶିଢ଼ୋଦାସା କଦିୟା ଲ଼ିତେନ । ଅଥବା କହ
 ଯଦି ହ଼ିତାବ ଗମ୍ପାଟା ଦାସିୟା କିଢ଼ ପାଦବହନ କଦିୟା ଡ଼ାପାଣିତେ
 ହ଼ିଚ୍ଛକ ଡ଼ନ, ତିନି ତାହାତେ ସମ୍ପା ।

ଏବାର ଶିଳାହ଼ିତେ କିଦିୟା ପଦାବ ଚାଦେ ଦାଟେ ଆକ୍ଷୟ
 ଲ଼ିତେ ବଲିୟା ଗ୍ରିଦ କଦିୟା ଦାସିୟାଢ଼ି । ଏକେନ ଶା଼େନ ଦିନେ
 ପଦା ତାହାର ଗାଦେ ଆମାବ ଅଧାଧନାର ଡ଼ଗା ଡ଼ୁଲ ଯଦାମ
 ବିଢ଼ାଣିୟା ଅପ଼କା କଦିୟାତେ— ଯେ କଦିୟା ତୁମି ଏକଦାନ
 ଦ଼ାଢ଼ାଣିୟା ଯାହାତେ ପାଦିବେଲ ଦକ୍ଷ ହ଼ିତେ ।

ତାମାବ ବଦି

୩୧— ବଡ଼ଦାନାବ ଏହା ଯାହାବ କାନି ନକଲ ନାହିଁ ।

আশুয়ারি ১৯০১ ?

ও

বন্ধু,

অসময়ে ভারতবর্ষে ফিরিলে পাছে তোমার কৰ্ম-সমাধা সম্বন্ধে ব্যাঘাত ঘটে এ আশঙ্কা আমি দূর করিতে পারিতেছি না। সকল প্রকারেই ত্যাগ স্বীকার করিয়া তোমাকে তোমার কৰ্ম সম্পন্ন করিতে হইবে। যে বৈজ্ঞানিক রশ্মি তোমার মাথার মধ্যে স্পন্দিত হইতেছে তাহাকে বিশ্বসংসারের গোচর করিতে হইবে। তোমার কাজে আমাদের স্বার্থ— সুতরাং সেই কার্য্য সমাধার ব্যয় আমাদেরই বহনীয়। তুমি অসময়ে তোমার কৰ্ম অসম্পন্ন রাখিয়া ফিরিয়ো না— আমার ত এই পরামর্শ।

এখনো বোধ হয় ডাক্তারের হাতে রহিয়াছ— আমার এই চিঠি যখন পৌঁছবে, আশা করি, ততদিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া উঠিয়াছ। আমার একান্ত মনের প্রার্থনা এই যে, তোমার প্রদত্ত নূতন জ্ঞানালোকের দ্বারা নব শতাব্দীর আরম্ভ ভাগ অপূৰ্ব উজ্জ্বলতা লাভ করুক।

তোমার রবি

ও

বন্ধু,

অনেক দিন তোমার পত্র পাই নাই, আমিও লিখি নাই। তুমি লেখ নাই তাহার ভাল জবাবদিহি আছে— আমি যে লিখি নাই তাহার কারণ অতি ক্ষুদ্র অথচ বিপুল। নানা সাংসারিক সঙ্কটে বিজড়িত হইয়া আমি অত্যন্ত পীড়িত চিন্তে আছি— কোন রকমে মনের অবসাদ ঝাড়িয়া ফেলিয়া লেখা-পড়ায় মন দিতে চাই— কিন্তু কমলি নেই ছোড়া।

শরীরটা কিছু ক্লিষ্ট হওয়ায় সম্প্রতি মহারাজের সঙ্গে দার্জিলিংয়ে আসিয়াছি। তাহার আতিথেয় ও প্রকৃতির শুশ্রুষায় শরীর ও মনের স্বাস্থ্য লাভ করিব প্রত্যাশা করিতেছি। কিন্তু অধিক দিন থাকিবার সম্ভাবনা নাই। কেন নাই, সে খবরটা তোমাকে দেওয়া যাক।

বেলার বিবাহ এই মাসেই স্থির হইয়াছে। আর তিন সপ্তাহ মাত্র অবশিষ্ট আছে। আমি এমনি হতভাগ্য, আমার কোন বন্ধুই বিবাহে উপস্থিত থাকিবেন না। তুমি বিলাতে, লোকেন তথৈবচ, মহারাজ সে-সময় বোধ করি আগরতলায়, নাটোর নীলগিরিতে। আমার গৃহে এই প্রথম বড় কাজ— কিন্তু তোমাদের অভাবে আমার উৎসব নিরানন্দ হইবে।

কিন্তু তুমি এমন কোনও তারহীন বিদ্যুৎ-যান এখনো
কি প্রস্তুত কর নাই যাহা অবলম্বন করিয়া বন্ধুর আনন্দ-
উৎসবে প্রসন্ন মঙ্গলহাস্য বিকীর্ণ করিতে পার ? নব দম্পতিকে
আশীর্বাদ করিয়ো ।

তোমাকে একটি কাজের ভার দিতে চাই । যুবরাজের
জন্ম বিলাত হইতে একটি ভাল শিক্ষক নির্বাচন করিয়া
পাঠাইতে হইবে । যুবরাজ ত্রিপুরা হইতে দূরে থাকিয়া
সম্পূর্ণ তাহার শাসনাধীনে শিক্ষালাভ করিবেন । শিক্ষকটি
বিজ্ঞানবিৎ হইলেই ভাল হয় । একরূপ গুরুতর দায়িত্ব স্বন্ধে
লইতে তুমি সঙ্কোচ বোধ করিবে, আমি জানি ; কিন্তু তবু
তোমাকে লইতে হইবে । অবশ্য, তুমি যাহাকে ভাল মনে
করিয়া বাছিয়া দিবে ভাবতবর্ষের জলহাওয়ার গুণে দুই দিনেই
সে মন্দ হইয়া দাঁড়াইতে পাবে— মহারাজা সেজন্য তোমাকে
দোষী করিবেন না । বর্তমানে তুমি যাহাকে যোগ্য এবং ভাল
মনে করিবে, যিনি যুবরাজকে যথোচিত সংযমে রাখিতে
পারিবেন, অথচ অনাবশ্যক উদ্ধত হইবেন না এমন একটি
লোক দেখিয়া, তাহার বেতন প্রভৃতি কিরূপ হইতে পারে
জানিয়া লিখিবে ।

বঙ্গদর্শন কাগজখানি পুনর্জীবিত হইতেছে । আমাকে
তাহার সম্পাদক করিয়াছে । মহাবাজও এই পত্রটিকে আশ্রয়
দান করিয়াছেন । কণ্ঠকে বিদায় দিয়া এই পত্রের প্রতি মন
দিতে হইবে ।

তোমাকে বেলার হাতে কপি-করা একখানি কবিতার খাতা পাঠাইয়াছি, নিশ্চয় পাইয়াছ।

বন্ধুজ্যাকে আমার নববর্ষের সাদর অভিবাদন জানাইবে। শুনিলাম, তিনি অন্নপূর্ণা মূর্তিতে প্রবাসী বাঙ্গালীকে মাছের ঝোল ভাত খাওয়াইয়া পুণ্য লাভ করিতেছেন— তাঁহার মাছের ঝোল এখনও ভুলি নাই।

তোমার রবি

পুনশ্চ— মহারাজ আবার তোমাকে বলিবার জ্ঞা আমাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন— তিনি এ বিষয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন— তোমাকে পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিতে চাহেন। শিক্ষকটির বাসস্থান ও আহারাদির খরচ নিজে হইতে লাগিবে না। কুচবিহার বলেন, বেতন পাঁচ শত হইতে আরম্ভ করিয়া আট শত পর্য্যন্ত হওয়াই নিয়ম। যদি তার চেয়ে অধিক দিতে হয় ও নির্দিষ্ট সময় বাঁধিয়া দিতে হয় তাহাও চলিতে পারিবে।

বন্ধু

অনেকদিন থেকে তোমার চিঠির জন্মে প্রত্যাশিত হয়ে ছিলাম। আজ পেয়ে খুব খুসি হলাম। পাছে তোমার কাজের লেশমাত্র ক্ষতি হয় সেই জন্মে আমি তোমাকে কখন তাগিদ করি নে।

পৃথিবীকে সর্বত্র চিম্টি কাটবার যে উপায় তুমি বের করেছ সেইটে পড়ে গর্ব অনুভব করা গেল। এতদিন জড় পদার্থ আমাদের বিধিমতে পীড়ন করে আসছিলেন এবারে তোমার কল্যাণে তাদের উপর প্রতিশোধ নিতে পারব। তাদের দেদার চিম্টি কাট আর বিষ খাওয়াও— ওগুলোকে কোনমতে ছেড়োনা। এখন থেকে আদালতে যদি অপরাধী জড় পদার্থের বিচার হয় তাহলে বিচারক তাদের চিম্টি দণ্ড বিধান কর্তে পারবে।

যদি পাঁচ ছ বৎসর তোমাকে বিলাতে থাকতে হয় তুমি তারই জন্মে প্রস্তুত হোয়ো, অনর্থক ভারতবর্ষের ঝঞ্জাটের মধ্যে এসে কাজ নষ্ট কোরো না। তুমি আমাকে একটু বিস্তারিত করে লিখো এই ৫১৬ বৎসর সেখানে থাকতে গেলে ঠিক কি পরিমাণ সাহায্য তোমার দরকার হবে। আমার

কু

একদিন যেরূপ তোমার দর্শন
করে প্রত্যক্ষিত হইল দৃষ্টব্য। অর্থাৎ
যেই মূঢ় মূর্খ হইল। অর্থাৎ
তোমার কাছের লোকসমূহ অর্থাৎ
তুমি সেই করে আমি তোমাকে কখন
আসিত করিব।

স্বাভাবিক অর্থাৎ স্বাভাবিক কারণে যে
উপায় তুমি বের করো সেইভাবে অর্থাৎ
যদি মনুষ্যের কারণে। এতদিন এত
অন্য আমায় বিধিমাতে মীড়ক এর
আনন্দিলেব এতৎ তোমার কারণে।
আমি উপায় প্রতিক্রমী কিত্তে পারব।
এতৎ এতৎ স্বাভাবিক কারণে আর কি
যাউযাউ - ৩ উল্লাকে কোষমতে দিওনা।

ଏମକ ଯେକ ଆଦାଲତେ ପଦି ଆପଣା
କତ ଆଦାଲତେ ବିଚାର ହୁ ତେହଲେ
ବିଚାରକ ତାମର ବିଚାର ଦାତ ବିଚାରକ କର୍ତ୍ତ
ଧାରକେ ।

ପଦି ପାଠ ହୁ ତେମର ତୋମାକ ବିଲୀତ
ଧାରକେ ହୁ ତୁମି ତେହ କଲେ ଅଧୁତ ତୋମ,
ଅଧୁକ ତାବତକାର୍ତ୍ତେ କଲ୍ଲୀକାର୍ତ୍ତେ ମାତ୍ ଏମ
କେକ ବଧ କୋବୋନ । ତୁମି ଆମାକ ଏକ
ବିଚାରକ କର୍ତ୍ତେ ନିଲୋ ଏହ ୧/୬ ତେମର
ତୋମାକେ ଧାରକେ ତୋଲେ ନିକ କି ଆଦାଲ
କାର୍ତ୍ତେ ତୋମାକ ଦରକାର ହେ । ଆମାକ
କର୍ତ୍ତେ ନିକାମାତ୍ର ମାକୋକ କୋବୋନ ।

ତେମର ତୋମାକେ କତ ଆଦାଲତେ ନିଲୋ
ତୁମି ବିନା ବେତକେ ନିକ କର୍ତ୍ତେ ନିକେ ମାତ୍
ଆମାକେ ନିଲୋ । ପାତ ତୁମି କର୍ତ୍ତେ
୩ ବିଚାରକ କର୍ତ୍ତେ ତୋମାକେ ଯେକେ ତୋମା
କାକ କର୍ତ୍ତେ ମାତ୍ ତୋମି କୋ ହୁ ତୋ
ତେମା କର୍ତ୍ତେ ନିକେ ମାତ୍ । ତୁମି ଆମାକ
ନିଲୋ କର୍ତ୍ତେ ନିଲୋ ।

ଆଜ୍ଞା ଦା ପଢ଼ାଅଛି ।

ଠିକ୍‌ଠାଳି ପ୍ରଥମ ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟିରେ । ନିଜ
ପ୍ରାଥମିକ ଆଶା ସବୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ସି -
ଆଜ୍ଞାକୁ ପୁନର୍ବାର ଯୋଗ ଦେଉ । ଆଜ୍ଞା
ଏକତ୍ର କରାଯିବ ଏକ ବିକଳ ହାତ ଦେଇ
ତା ଆଜ୍ଞାକୁ ଯୋଗ ଦେଉ । ତାଙ୍କୁ
ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ ନିଜ ଦେଇ ।

ତାଙ୍କୁ ଦେଇ

কাছে লেশমাত্র সঙ্কেচ কোবো না । বৎসবে তোমাকে কত পবিমাণে দিলে তুমি বিনা বেতনে দীর্ঘ ছুটি নিতে পাব আমাকে লিখো । যাতে তুমি স্বচ্ছন্দে ও নিশ্চিন্ত চিন্তে সেখানে থেকে তোমার কাজ করতে পাব আমি বোধ হয় তাব ব্যবস্থা করে দিতে পাবব । তুমি আমাকে খোলসা করে লিখো ।

লোকেন যাত্রা করে বেবিয়ে পড়েছে । এতদিনে সে তোমাব সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা কবেছে । তাব প্রতি আমাব ঈশা হচ্ছে । আমাব ভাবি ইচ্ছা করচে আমবা জন দুই তিনে মিলে তোমাব ওখানে মাছেব ঝোল খেয়ে আঙনের কাছে ধবেব কোণে ঘটা দুই তিনেব জন্তে জমিয়ে বসি । আব একবাৰ আমি লোকেনেব সঙ্গে লঙনে গিয়েছিলুম— তখন তোমবা কেউ সেখানে ছিলেনা— আমি দুদিন থেকেই নিতামু দিকাব সহকাৰে সেখান থেকে দৌড় দিয়েছিলুম । কিন্তু তোমাব যদি বিলাতে পাঁচ ছয় বৎসব থাকা হয় তাহলে কি একবাৰ সেখানেই তোমাব সঙ্গে দেখা হবে না ? আশা কৰচি দেখা হবে । হয় ত কোন দিন তোমাব দবজায় ঠক্ঠক্ শব্দে ঘা পড়বে ।

বঙ্গদর্শন প্রথম সখা বেবিয়েছে । নানা শাস্ত্রমে আমি মন দিতে পাবি নি— অনেক ভুলচুক থেকে গেছে । আমাব একটা কবিতা এমন বিকৃত হয়ে গেছে তাব মানেই বোঝা যায় না । তোমাকে পাঠিয়ে দিতে বলে দেব ।

তোমাব ববি

ও

বন্ধু,

ধন্যোহং কৃতকৃত্যোহং ! তোমাদের চিঠি পাইয়া আমি প্রাতঃকাল হইতে নূতন লোকে বিচরণ করিতেছি। যে ঈশ্বর তোমার দ্বারা ভারতের লজ্জা নিবারণ করিয়াছেন আমি তাঁহার চরণে আমার হৃদয়কে অবনত করিয়া রাখিয়াছি। কোন্ দিক্ দিয়া তিনি আমাদের দেশকে গৌরবান্বিত করিবেন অদ্য আমি তাহার অরুণাভামণ্ডিত পথ দেখিতেছি। তোমার নিকট পূজা প্রেরণ করিবার জগ্য আমার অন্তঃকরণ উন্মুখ হইয়া আছে— বন্ধু, আমার পূজা গ্রহণ কর ! তোমার জয় হউক। তোমাতে আমাদের দেশ জয়ী হউক ! নব্য ভারতের প্রথম ঋষিরূপে জ্ঞানের আলোকশিখায় নূতন হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর।

তোমাকে বারম্বার মিনতি করিতেছি— অসময়ে ভারতবর্ষে আসিবার চেষ্টা করিও না। তুমি তোমার তপস্যা শেষ কর— দৈত্যের সহিত লড়াই করিয়া অশোকবন হইতে সীতা-উদ্ধার তুমিই করিবে, আমি যদি কিঞ্চিৎ টাকা আহরণ করিয়া সেতু বাধিয়া দিতে পারি তবে আমিও কঁাকি দিয়া স্বদেশের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিব।

বেলার বিবাহের আর ১০।১১ দিন বাকি আছে । তোমার জয়সংবাদে আমার সেই উৎসব দ্বিগুণতর উৎসবময় হইয়া উঠিয়াছে । আমার সভার মধ্যে তুমি তোমার অদৃশ্য কিবণের আলোক জ্বালিয়া দিয়াছ । অনেক ঝঞ্জাটের মধ্যে পড়িয়াছিলাম — আমি সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছি । আমাব একান্ত দুঃখ রহিল তোমার জয়ক্ষেত্রে আমি উপস্থিত থাকিতে এবং তোমার জয়লাভের পবে তোমার হস্তস্পর্শ কবিত্তে পাবিলাম না ।

তোমার ক্ষুদ্র বন্ধু মৌবাকে তোমাব জয়সংবাদ দিলাম, সে কিছুই বুঝিল না । যখন বুঝিবার বয়স হইবে তখন স্মরণ কবিয়া খুসী হইবে ।

এইবার বিবাহের আয়োজনে মন দেইগে । ইতি—
২১শে জ্যৈষ্ঠ । [১৩০৮]

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ

বন্ধু

আমার কন্যার প্রতি তোমার আশীর্ব্বাদসহ সুন্দর উপহারখানি পাইয়া আনন্দলাভ করিলাম। তোমার হস্তাক্ষর-সহ এই গ্রন্থখানি বেলা উপযুক্ত আদর করিয়া পড়িবে ও রাখিবে সন্দেহ নাট। আমার জামাতাটি মনের মত হইয়াছে। সাধারণ বাঙালির ছেলের মত নয়। ঋজুস্বভাব, বিনয়ী অথচ দৃঢ়চরিত্র, পড়াশুনা ও বুদ্ধিচর্চায় অসামান্যতা আছে— আর একটি মহৎগুণ এই দেখিলাম, বেলাকে তাহার ভাল লাগিয়াছে। এইবার শিলাইদহ হইতে ফিরিয়া গিয়া বেলাকে মঙ্গলফরপুবে তাহার স্বামীগৃহে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতে হইবে।

লোকেন বিলাতে গিয়া এমনি মাতিয়া আছে যে, আমাকে কিম্বা বেলাকে একটা ছত্র চিঠিও লিখিল না। তোমার সঙ্গে কি তাহার দেখা সাক্ষাৎ হইয়া থাকে?

আমি সাহসে ভর করিয়া ইলেক্টিশ্যান্ প্রভৃতি হইতে সংগ্রহ করিয়া শ্রাবণের বঙ্গদর্শনের জন্ম তোমার নব আবিষ্কার সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছি। প্রথমে জগদানন্দকে লিখিতে

দিয়াছিলাম— পছন্দ না হওয়াতে নিজেই লিখিলাম। ভুলচুক
ধাকার সম্ভাবনা আছে— দেখিয়া তুমি মনে মনে হাসিবে।

আঘাটের বঙ্গদর্শনে যেটুকু আভাস দিয়াছিলাম তাহা
বোধ হয় বৈজ্ঞানিক হিসাবে যথার্থ হয় নাই— তখন
ইলেক্টিশ্যান্ দেখিতে পাই নাই।

তুমি আরো কিছুকাল বিলাতে থাকিয়া যাইবার
কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছ খবর দিলে না কেন? আমি সেকথা
জ্ঞানিতে উৎসুক হইয়া আছি। অগ্ণাণ সভায় তোমার মত
প্রচার কি ভাবে অগ্রসর হইতেছে তাহাও জ্ঞানিবার জন্ত
আমাদের মন উৎকণ্ঠিত। জর্মানি ও আমেরিকায় যাইবার
কোনপ্রকার সুযোগ করিতে পারিবে না কি? তুমি যদি দীর্ঘ-
কাল যুরোপে থাক তবে যেমন কবিয়া হৌক্ একবার সেখানে
গিয়া তোমার সঙ্গে দেখা কবিয়া আসিব।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। খুব বর্ষা পড়িয়াছে।

তোমার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ

বন্ধ,

তোমার কক্ষ কেন সম্পূর্ণ সফল না হইবে ? বাধা যতই
 গুরুতর হউক তুমি যে-ভাব গ্রহণ করিয়াছ তাহা সমাধা না
 করিয়া তোমার নিকৃতি নাহি ; সেজন্য যে কোন প্রকার ভাগ-
 স্বাকার প্রয়োজন তাহা তোমাকে কবিত্তে হইবে । একথা
 তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেও অসম্মোচে বলিতে পারিতাম
 না । বলিতে পারিতাম না যে, দাবিদ্রা, অর্থসঙ্কট, সা সাবিক
 অনর্থিত গ্রহণ কর । আমি নিজে হইলে হযত পারিতাম
 না— কিন্তু তোমাকে আমি নিজেই চেয়ে বড় দেখি বলিয়াই
 তোমার কাছে দাবীর সীমা নাহি । তুমি যাহা আদিকার
 কবিত্তেছ ও করিবে তাহাতে জগতেই যে-শিক্ষা লাভ হইবে,
 কর্তব্যের অন্তর্বোধে যে-দুঃখভাব গ্রহণ করিবে তাহাতে তাহার
 চেয়ে কম শিক্ষা দিবে না । আমাদের মত বিষয়পদায়ণ
 সাবধানী, নিষ্ঠাবিহীন, ক্ষুদ্র লোকদের পক্ষে এই দৃষ্টান্ত,
 এই শিক্ষা একান্তই আবশ্যিক হইয়াছে । তুমি
 যদি ফাল্গুনী না পাও তবে একবার এখানে আসিযো ।
 যথাসাধা ভাল বন্দোবস্ত করিয়া একেবারে যাত্রা করিয়া
 বগক্ষেত্র বাহির হইবে । ইহা ছাড়া আর কি পরামর্শ দিতে
 পারি ? একবার দেখা পাইলে বড় আনন্দিত হইব— না

যদি পাঠ, তবু, তুমি তোমার কার্যে অগ্রসর হইতে পারিতেছ
 ঠে খবর পাঠিলে আর কিছুই চাই না। তোমার উপরে
 আমার একান্ত নির্ভর আছে—বর্তমান যুবোপ তোমাকে
 গ্রহণ করিল কি না তাহা লইয়া আমি অতিমাত্র উৎকণ্ঠিত
 হইতেছি না— তুমি যাহা দেখিতে পাঠিয়াছ তাহা বৈজ্ঞানিক
 মায়-মতীচিকা নহে তাহাতে আমার সন্দেহমাত্র, দ্বিধা না
 আছে। তোমার উদ্ভাবিত সত্য একদিন বৈজ্ঞানিক সিংহাসনে
 অভিষিক্ত হইবে— সেদিনের জন্য দৈর্ঘ্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতে
 পারিব।

ইতিমধ্যে তুমি একবার ডাম্পানি বা আর্মবিকায় যাঠতে
 পারিলে বেশ হইত। এবারে না হয় আর একবার চেষ্টা দেখিতে
 হইবে।

কল্যাণক ইতিমধ্যে স্বামীগৃহে রাখিয়া আসিলাম। পথে
 মধ্যে কিছুদিন শাস্ত্রনিকর্তনে দাস করিয়া আদাম লাভ
 করিয়াছি। সেখানে একটা নিষ্ঠুর অধ্যাপকের ব্যবস্থা
 করিবার চেষ্টায় আছি। ছুই একজন ভাগ-স্বাকারী বঙ্গচারী
 অধ্যাপকের সঙ্কানে ফিরিতেছি।

তোমার বনি



বন্ধ,

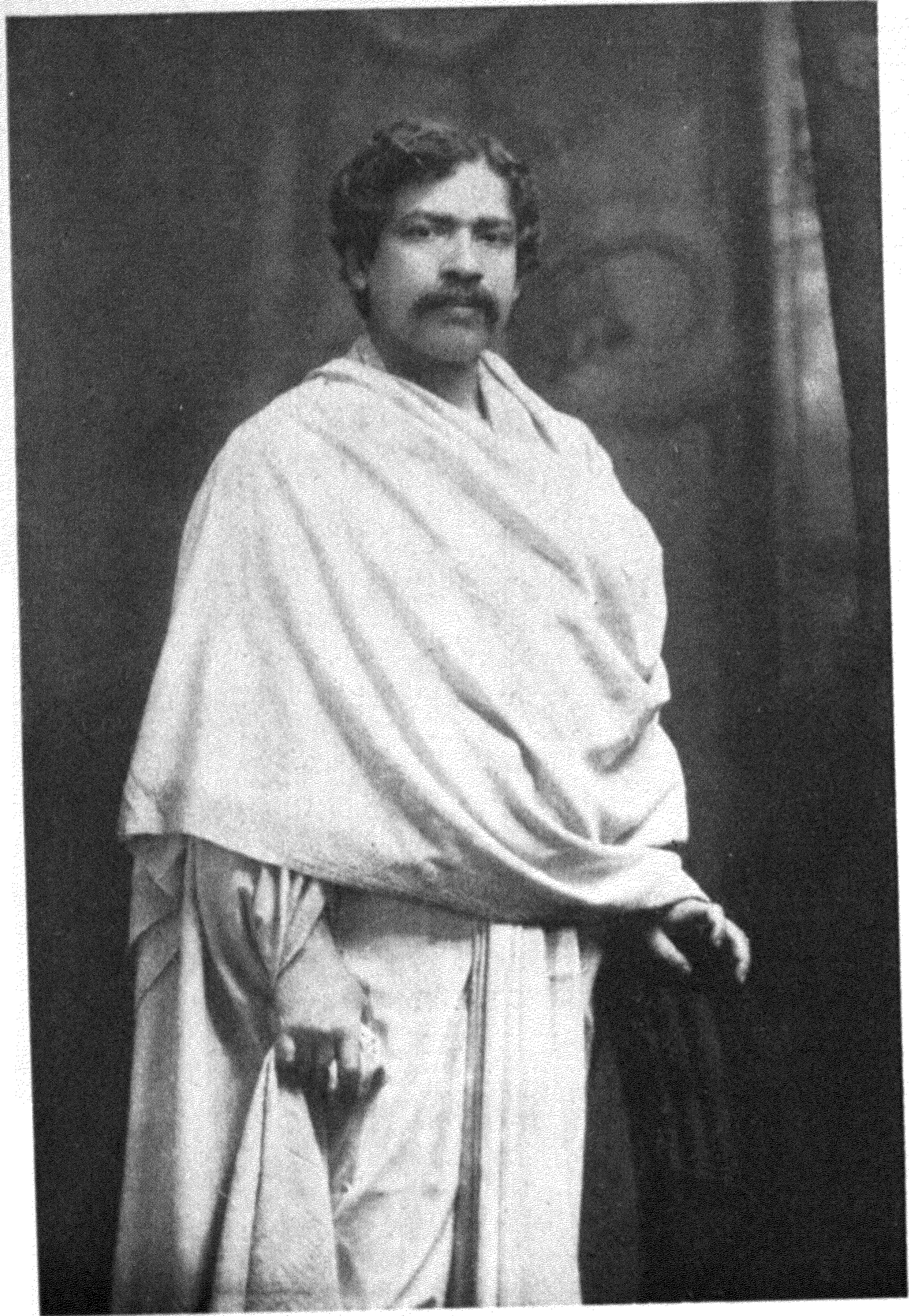
আজ রমেশবাবুর চিঠি পাইয়া বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছি । তোমার প্রীতি, স্মৃত্যুৎর প্রদেশের প্রীতি, তাঁহার স্নেহদয় অল্পরাগে আমার হৃদয় স্পর্শ করিল । আমার সেই এক কথা । বিলাতে থাকিয়া তোমাকে স্বাধীন ভাবে কর্ম সমাধা করিতে হইবে । একবার কেবল ছই তিন মাসের অল্প দেশে ফিরিয়া এসো— তোমার সঙ্গে একবার সকল কথা পরিষ্কার-রূপে আলোচনা করিয়া লইতে চাই ।

তোমার স্পন্দন-রেখার খাতাখানি পাইয়া অনেকটা পরিষ্কার ধারণা হইল । বঙ্গদর্শনে এইগুলি খোদাইয়া ছাপাইবার ইচ্ছা আছে ।

তোমার সঙ্গে শীঘ্র দেখা হইবার সম্ভাবনার কল্পনা করিয়া আগ্রহান্বিত হইয়া আছি ।

তোমার রবি

উপবিষ্ট : অগদীশচন্দ্র, লোকেন্দ্রনাথ, বরদীন্দ্রনাথ
দণ্ডায়মান : বরদীন্দ্রনাথ, মহিমচন্দ্র ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর



বিলাতে জগদীশচন্দ্র । ১৯০১

বন্ধু,

তোমার ছবি আজ পাইয়া বড় খুসী হইলাম। ভারি সুন্দর ছবি হইয়াছে— এ ছবি আমার লিখিবার ঘর বিভূষিত করিয়া থাকিবে। কিছু দিন পূর্বে সাহিত্যে তোমার ছবি ছাপিবার জন্য সমাজপতি তোমার ফোটা চাহিয়া পাঠাইয়াছিল। আমাদের শিলাইদহের গ্রুপ ছাড়া তোমার ছবি আমার কাছে ছিল না। সেটা তেমন ভাল না, কিন্তু অগত্যা সেইটেই সমাজপতিকে দিতে হইয়াছে। তোমার এ ছবিখানি চাহিলেও আমি দিতাম না— কারণ, চুরি করিতে অনেক ভদ্রলোক সঙ্কোচ বোধ করেন বটে, কিন্তু জিনিষ ধার লইয়া ফিরাইয়া না দেওয়াকে তাঁহারা অপহরণের নামাস্তর বলিয়া জানেন না। তোমার প্রেরিত আশা ছবিখানিও ভাবে পূর্ণ। ভারতবর্ষীয় আশার সপ্ততন্ত্রী বীণার মধ্যে কোন্ তারটা অবশিষ্ট আছে? ধর্ম, না, কর্ম; ধ্যান, না, জ্ঞান; বিজ্ঞা, না, উত্তম?

শাস্তিনিকেতনে আমি একটি বিদ্যালয় খুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। সেখানে ঠিক প্রাচীন কালের গুরুগৃহ-বাসের মত সমস্ত নিয়ম। বিলাসিতার নাম-গন্ধ থাকিবে না— ধনী দরিদ্র সকলকেই কঠিন ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত

হইতে হইবে। উপযুক্ত শিক্ষক কোন মতেই খুঁজিয়া পাইতেছি না। এখনকার কালের বিদ্যা ও তখনকার কালের প্রকৃতি একত্রে পাওয়া যায় না। স্বার্থ-চেষ্টা এবং আড়ম্বর হইতে কোন মহৎ কার্যকে বিচ্যুত করিতে গেলে কাহারো মুখরোচক হয় না। এতদিনকার ইংরেজি বিদ্যায় আমাদের কাহাকেও যথার্থ কর্মযোগী করিতে পারিল না কেন? মহারাষ্ট্র দেশে ত তিলক ও পরঞ্জপে আছে, আমাদের এখানে সে-রকম ত্যাগী অথচ কর্মী নাই কেন? ছেলেবেলা হইতে ব্রহ্মচর্যা না শিখিলে আমরা প্রকৃত হিন্দু হইতে পারিব না। অসংযত প্রবৃত্তি এবং বিলাসিতায় আমাদেরকে ভ্রষ্ট করিতেছে— দারিদ্র্যকে সহজে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না বলিয়াই সকল প্রকার দৈন্যে আমাদের পরাভূত করিতেছে। তুমি যদি ইতিমধ্যে একবার এখানে এস তবে তোমাকে লইয়া আমার এই কাজটি পূর্ণ করিতে হইবে।

বিংশ শতাব্দীতে নৈবেদ্যের যে-সমালোচনা বাহির হইয়াছে তোমাকে পাঠাই। নৈবেদ্যকে আমি আমার অগ্ৰাণ্য বইয়ের মত দেখি না। লোকে যদি বলে কিছুই বৃষ্টিতে পারিতেছি না বা ভাল হয় নাই তবে তাহাতে আমার হৃদয় স্পর্শ করে না। নৈবেদ্য ষাঁহাকে দিয়াছি তিনি যদি উহাকে সার্থক করেন তবে করিবেন— আমি উহা হইতে লোকস্তুতি বা লোকনিন্দার কোন দাবীই রাখি না।

সেদিন সরস্বতী নামক এক হিন্দী কাগজে দেখিলাম,

আমার “মুক্তির উপায়” নামক ছোট গল্পটি তর্জমা করিয়াছে ।
হিন্দিতে পড়িতে বেশ লাগিল— বস কিছুই নষ্ট হয় নাই ।

একটা খবর তোমাদের দেওয়া হয় নাই । হঠাৎ আমার
মধ্যম কন্যা রেণুকার বিবাহ হইয়া গেছে । একটি ডাক্তার
বলিল, বিবাহ করিব— আমি বলিলাম, কব । যেদিন কথা
তাব তিন দিন পরেই বিবাহ সমাধা হইয়া গেল । এখন
ছেলেটি তাহার অ্যালোপ্যাথি ডিগ্রির উপর হোমিওপ্যাথিক
চূড়া চড়াইবার জন্ত অ্যামেরিকা রওনা হইতেছে । বেশী দিন
সেখানে থাকিতে হইবে না । ছেলেটি ভাল, বিনয়ী, কৃতী ।

ভয় নাই— তোমার বন্ধুটিকে তোমার প্রতীক্ষায় রাখিব ।
ফস্ করিয়া তাহাকে হস্তান্তর করিব না ।

তোমার রবি

বন্ধু

আজ মিস্ নোব্লে'র চিঠিতে তোমার কথা পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইয়াছি। আমরা এখন বোলপুরে শান্তিনিকেতনে বাস করিতেছি। তুমি এখানে কখনো আস নাই। জায়গাটি বড় রমণীয়। আলোকে আকাশে বাতাসে আনন্দে শান্তিতে যেন পরিপূর্ণ। এখানকার আকাশে চলিবার ফিরিবার সময় নিয়ত যেন একটি মঙ্গলের স্পর্শ অনুভব করি। এখানে জীবন বহন করা নিতান্তই সহজ ও সবল। কলিকাতার আবর্তের মধ্যে আমার আর কিছুতেই ফিরিতে ইচ্ছা করে না। এখানে নিভতে নিৰ্জনে ধ্যানে ও প্রেমে নিজের জীবনকে ধীরে ধীরে বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ জন্মিয়াছে। পূর্বেই লিখিয়াছি এখানে একটি বোর্ডিং বিদ্যালয় স্থাপনের আয়োজন করিয়াছি। পৌষ মাস হইতে খোলা হইবে। গুটি দশেক ছেলেকে আমাদের ভারতবর্ষের নিৰ্ম্মল শুচি আদর্শ মানুষ করিবার চেষ্টায় আছি।

ত্রিপুরার মহারাজ কাল আমার কাছে একটি কৰ্মচারী পাঠাইয়াছেন। তোমার সম্বন্ধে আমার সঙ্গে বিস্তারিত আলাপ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আমি আর দিন দশ বারো পরে ত্রিপুরায় গিয়া মহারাজের সঙ্গে দেখা

করিব। তোমার প্রতি আনুষ্ঠানিক শ্রদ্ধাশ্রুতিতে মহারাজ আমার হৃদয় দ্বিগুণ আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার শ্রেণীর লোকের পক্ষে একরূপ বিনীত গুণগ্রাহিতা অত্যন্ত বিবল।

এখন ত তুমি প্রবাসেই থাকিয়া গেলে। দীর্ঘকাল তোমার বিচ্ছেদ বহন করিতে হইবে। বিলাতে যাইবার লোভ এখন আমার মনে নাই— কিন্তু একবার তোমার সঙ্গে দেখা করিয়া কথাবার্তা করিয়া আসিবার জন্য মন প্রায়ই ব্যগ্র হয়। তোমার সার্কুলার রোডের সেই ক্ষুদ্র কক্ষটি এবং নৌচব তলায় মাছের ঝোলার আশ্বাদন সর্বদাই মনে পড়ে। এখন যদি ভারতবর্ষে থাকিতে তবে কিছু দিনের জন্যে তোমাকে শান্তিনিকেতনে বাথিয়া নিবিড় আনন্দ লাভ করিতাম। যদি কোন সুযোগ পাই একবার তুমি থাকিতে থাকিতে ইংলণ্ডে যাইবার বিশেষ চেষ্টা করিব। তোমার বন্ধু যে আমাকে এমন প্রবল ও গভীর ভাবে আকৃষ্ট করিবে তাহা এক বংশব পূর্বে জানিতাম না।

তোমার রবি

৬

আগবতনা

কার্তিক ১৩০৮

বন্ধু

আমি তোমার কাজেই ত্রিপুরায় আসিয়াছি। এইখানে মহাবাজের অতিথি হইয়া কয়েক দিন আছি। তোমার প্রতি তাঁহার কিরূপ শ্রদ্ধা তাহা ত জানই— সুতরাং তাঁহার কাছে আমান প্রার্থনা জানাইতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করিতে হয় না। তিনি শীঘ্রই বোধ হয় দুই এক মেলের মধ্যেই তোমাকে দশ হাজার টাকা পাঠাইয়া দিবেন। সে টাকা আমার নামেই তোমাকে পাঠাইব। এই বংশের মধ্যই তিনি আরো দশ হাজার পাঠাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইহাতে বোধ করি তুমি বর্তমান সঙ্কট হইতে আপাতত উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। প্রাসাদ নিম্মান প্রভৃতি বলবায়সাহা কায়ে সম্প্রতি মহাবাজে ডিউত আছেন নতুবা তিনি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া তোমাকে পঞ্চাশ হাজার পর্য্যন্ত সাহায্য করিতে পারিতেন। তাঁহার এই উৎসাহে তিনি আমার হৃদয় আবেগ দৃঢ়তরূপে আকর্ষণ করিয়াছেন— স্বাভাবিক উদ্যোগে এমন উজ্জল আদর্শ আমি আর দেখি না। তুমি অবসাদ হইতে নিজেকে বক্ষা কর। ফললাভ করিতে তোমার যতই বিলম্ব হউক আমাদের শ্রদ্ধা এবং আনুভবিক প্রীতি সর্বদাই ধৈর্য্য-

সহকারে তোমার পার্শ্বচর হইয়া থাকিব। .তোমাকে আমরা
 .লক্ষ্যমাত্র তাড়া দিতেছি না, যাহাতে কল্প সম্পূর্ণ করিবার
 জন্য তুমি যথাচিত বিলম্ব করিতে পার আমরা তাহাবই
 সহায়তা করিতে প্রস্তুত হইয়াছি— আমাদের পক্ষ .সেই আস্থা
 তুমি দৃঢ় রাখিও। .তোমার কাছে আমরা আবেদন কর দাবী
 করিব ? তুমি যাহা করিয়াছ তাহাব জন্যই যদি আমরা বৃত্ত
 না হইতে পারি তবে আমাদেরিগকে বিক্। তুমি যাহা করিয়াছ
 আমরা তাহাব উপযুক্ত প্রতিদান কিছুই দিতে পারি না।
 আমি যে চেষ্টা করিতেছি তাহা ব .টুকু এর তাহাব মলাই বা
 কি ? এইটুকু দিয়া তোমার উপরে দাবী চালাইতে পারি না।
 .তোমাকে অদেয়ব গণের শ্রীতি ছাড়া আর কিছুই দিতে নাহি
 জানিব, সে শ্রীতি বৈধতা বলিতে জানেন এর শ্রীতি ছাড়া
 আর কিছুই ফিবিয়া চাহে না। মহাবাহেব সম্প্রক্ষে একক
 নিশ্চয় জানিয়েছি তিনি তোমাকে স্তমী করিবার জন্য অর্থসাহায্য
 করেন নাহি তিনি তোমার স্বর্ণ পরিশোধ করিতেছেন। তিনি
 .তোমাকে প্রতিভা দান করিয়াছেন তিনিই তোমাকে উদ্যম ও
 আশা প্রবণ করিয়া সেই প্রতিভাবে সার্থক করন।

.তোমার
 বনি

ওঁ

বন্ধু

তোমাকে চিঠি লিখিতে পারি নাই কিন্তু কত দিন যে তোমাকে লইয়া কাটাইয়াছি, হৃদয়ের অন্তরঙ্গ প্রদেশে তোমাকে অনুভব করিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। আজ তোমার জয়সংবাদ পাইয়া নবমেঘগর্জনপুলকিত ময়ূরের মত আমার হৃদয় নৃত্য করিতেছে। মাতাল মদের বোতলের শেষ বিন্দুটি পর্য্যন্ত যেমন পান করে তোমার চিঠির ভিতর হইতে আমি সমস্ত মত্ততাটুকু একেবারে উপুড় করিয়া ধরিয়া চাখিবার চেষ্টা করিতেছি। বহু বিলম্বে তোমার জয় হইলেও আমি হতাশ্বাস হইতাম না— তবু নগদ পাওনার প্রবল আনন্দ।

গত কাল প্যারিসে তোমার বলিবার কথা ছিল— নিশ্চয় সেখানে তোমার জয় হইয়াছে— তোমার সেই বক্তৃতাসভায় আমাদের হৃদয় উপস্থিত ছিল।

যুরোপের মাঝখানে ভারতবর্ষের জয়ধ্বজা পুঁতিয়া তবে তুমি ফিরিয়ে— তাহার আগে তুমি কিছুতেই ফিরিয়ে না। গারিবান্দি যেমন জয়ী হইয়া রণক্ষেত্র হইতে কৃষিক্ষেত্রে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন তেমনি তোমাকেও অভ্রভেদী জয়-তোরণের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষের গভীর নির্জনতার মধ্যে

দারিদ্র্যের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় লইতে হইবে— তখন
 তোমাকে সকলে খুঁজিয়া লইবে তুমি কাহাকেও খুঁজিবে
 না— তখন তোমার কাছে আসিতে ভারতবর্ষের কাছে
 সকলে মাথা নত করিবে— বিদেশী ছাত্রকে ডাকিবার জন্ত
 বিদেশের প্ল্যানে প্রাসাদ রচনা করিলে চলিবে না— মাঠে
 মধ্যে কুটীবের মধ্যে যুগচক্ষু যে বসিবে সেই তোমাকে
 পাইবে। ভারতবর্ষের দারিদ্র্যকে এমন প্রবল তেজে জয়ী
 করিবার ক্ষমতা বিধাতা আমাদের আব কাহারো হাতে
 দেন নাই— তোমাকেই সেই মহাশক্তি দিয়াছেন। যেদিন
 স্নিগ্ধ পবিত্র প্রভাতে প্রাতঃস্নান করিয়া কাষায় বসন পরিয়া
 তোমার যন্ত্রতন্ত্র লইয়া বিপুলচ্ছায়া বটবৃক্ষের তলে তুমি
 আসিয়া বসিবে— সেদিন ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিগণ তোমাব
 জয়শব্দ উচ্চারণ করিবার জন্ত সেদিনকার পূণ্য সমীরণে এবং
 নিম্নল সূর্যালোকের মধ্যে আবির্ভূত হইবেন। ভারতবর্ষের
 সমস্ত শূন্য প্রান্তর এবং উদার আকাশ তুমিত বৃক্ষের গায়
 বাকুল প্রসাবিত বাহুর গায় সেই দিনের জন্ত অপেক্ষা করিয়া
 আছে। আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে আমরাও সেই দিনের
 জন্ত তপস্যা কবিত্তে আবশ্য করিয়াছি। আমাদের বাজা যে
 কেহ হউক, আমাদের আকাশ, আমাদের দিগন্তবিস্তীর্ণ মাঠ
 কে কাড়িয়া লইবে? আমাদের জ্ঞানের অবকাশ, আমাদের
 ধ্যানের অবকাশ, আমাদের দারিদ্র্যের অবকাশ হইতে
 আমাদেরিগকে কে বঞ্চিত করিতে পারিবে? আমাদের দেশে

যে পরমা মুক্তির অচলপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে— তাহা স্তব্ধ, তাহা
নির্ঝাক্, তাহা দীন, তাহা দিগম্বর, তাহা শাশ্বত— তাহাকে
বলীর বাহু ও ক্ষমতাশালীর স্পর্ধা স্পর্শ করিতে পারে
না— ইহাট্ট চিত্তের মধ্যে স্থিরনিশ্চয়রূপে জানিয়া শাস্ত্রমানে
সন্তোষের সতিত প্রসন্নমুখে ইহারই বিরলভূষণ বিশালতার মধ্যে
সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। বিদেশীর কটাক্ষে
আর ক্রক্ষেপ করিব না— তাহার ধিক্কারে আর কর্ণপাত
করিব না— তাহার কাছ হইতে যে বর্ষের রংচং বসনভূষণ
সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলাম তাহা তপোবনের দ্বারে আবর্জনার
মত ফেলিয়া দিয়া প্রবেশ করিব।

পত্রের মধ্যে আমাদের আশ্রমবৃক্ষ হইতে কালিদাসের
শিরীষ পুষ্প তোমাকে পাঠাইলাম।

তোমার রবি

বন্ধু,

ঈশ্বর তোমাব ললাটে বিজয়-তিলক অঙ্কিত করিয়া তোমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন— তুমি কি আমাদের মত লোকের কাছ হঠতে বলের বা উৎসাহের অপেক্ষা রাখ ? যেখানে থাক এবং যেমন করিয়াই হউক, উল্লাসে হউক, বাধায় হউক, নৈবাস্যে হউক, তুমি নিজেদেরও বার্থ কবিত্তে পার না । যিনি ভিত্তবে থাকিয়া তোমাব অজ্ঞাতসারে তোমার সমস্ত জীবনকে সফলতার দিকে লইয়া গেছেন তাঁহাব কক্ষকে হঠাৎ মাঝখানে নিরর্থক করিবে কে ? সীড়াবেব নৌকা কখন ডুবে না । নিবাসক্রু ভাবতবধেব অনিচলিত স্বেয়া তোমাকে তোমার কাশ্মেব মধো অনায়াসে বক্ষা ককক্ । কোন ক্ষুদ্র আকমণ, কোন ইচ্ছার চাঞ্চল্য তোমাকে তোমাব মহৎ ব্রত হঠতে ব্রষ্টে না ককক । ভাবতবধেব অশ্বমেধেব ঘোড়া তোমার হাতে আছে, তুমি কিরিয়া আসিলে আমাদের যজ্ঞ সমাধা হইবে । তুমি এখানে আসিয়া তপস্বী হইয়া নিভতে তোমার শিষ্যদিগকে জ্ঞানের ছুর্গম ছুর্গের গোপন পথ সঙ্কান করিতে শিখাইয়া দিবে, এই আমি আশা করিয়া আছি । পড়া মুখস্থ করানো, পাশ কবানো তোমাব কাজ নহে— যে-অগ্নি তুমি পাইয়াছ তাহা তুমি সঙ্গে লইয়া যাইতে পাবিবে না— তাহা ভারতবর্ষের

হৃদয়াগারে স্থায়ী করিয়া যাইতে হইবে ; বিদেশী আমাদিগকে
 জ্ঞানের অগ্নি যেটুকু দেয় তাহা অপেক্ষা ঢের বেশী ধোঁয়া দিয়া
 থাকে— তাহাতে যে কেবল আমাদের অন্ধকার বাড়ে তাহা
 নহে, আমাদের অন্ধতাও বাড়িয়া যায়— আমাদের দৃষ্টি পীড়িত
 হয়। তোমার কাছে জ্ঞানের পন্থা ভিক্ষা করিতেছি— আর
 কোন পথ ভারতবর্ষের পথ নহে— তপস্যার পথ, সাধনার পথ
 আমাদের। আমরা জগৎকে অনেক জিনিষ দান করিয়াছি,
 কিন্তু সে-কথা কাহারো মনে নাই— আর একবার আমাদিগকে
 গুরুর বেদীতে আবোহণ করিতে হইবে— নহিলে মাথা
 তুলিবার আর কোনো উপায় নাই। ভারতবর্ষের প্রাস্তুরের
 বটচ্ছায়ায় সেই বেদী-অধিরোহণে তোমাকে সহায়তা কবিত্তে
 হইবে। সৈন্য সামন্ত, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, বাণিজ্য, ব্যবসায়,
 কিছুই আমাকে বিচলিত করে না। আমি মাঠেব মাঝখানে
 বসিয়া সেই প্রাচীন পবিত্র বেদীর স্বপ্ন দেখিতেছি। তাহা
 শূন্য রহিয়াছে, আমরা শিশুর মত তাহার মাটি ভাঙিয়া পুতুল
 গড়িয়া খেলা করিতেছি।

তোমার রবি

বন্ধু

আষাঢ় আসিয়াছে— কিন্তু আষাঢ়েব সেই চিবস্ত্রন নব ঘনঘটা এবার এখনো দেখা দিল না। আমরা সেইজন্য ঠা করিয়া চাহিয়া আছি। এখানে চারিদিকে অব্যাহত প্রাস্তর— কোথাও দৃষ্টিব কোন বাধা নাই—মেঘের লীলাস্তল এমন আর নাই— এইখানেই জয়দেব বিপুলচ্ছন্দে তমালবনে বর্ষারাত্রির বর্ণনা লিখিয়াছিলেন। এখান হইতে জয়দেবেব জন্মভূমি ছয় ক্রোশ—চণ্ডীদাসেব জন্মভূমিও অধিক দূর নহে। এই জায়গায় ঘন বর্ষাব সময় একবার তোমাকে গ্রেফ্‌তার করিতে পারিলে চমৎকাব হয়। এক এক সময় বিছ্যাতের মত আমাব মনে হয় যে সব কাজকে আমবা অত্যন্ত বেশি মনে করি— বদ্ধতা করি, লিখি, হাঁসফাঁস করিয়া বেড়াই, দেশ উদ্ধার করিবার ফিকির করি— এ সমস্তই বাজে কাজ। জীবনটা উহাতে কেবল খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন অসম্পূর্ণ হইয়া যায়। প্রেমই নিতা, শাস্ত্রই চিরস্ত্রন। দুঃখ এই যে, মানুষকে ক্রমিক ক্ষোভ সাময়িক অশাস্ত্র কাটাইয়া এই নিতা পরিণামেব দিকে অগ্রসর হইতে হয়। এমনি করিতে করিতেই জীবনটা কাটিয়া যায়—

তখন কোথায় তুমি কোথায় আমি! সম্পূর্ণতা কেবল মরীচিকার মত আগে আগে চলে তাহার পথের আর শেষ নাই। এমন করিয়া কে আমাদেরকে কেবলি টানিয়া চলিয়াছে? একএকবার ইচ্ছা করে বিদ্রোহ করি— সব কাজকর্ম ফেলিয়া মুখামুখি করিয়া বসি— হৃদয়টাকে পূর্ণ করিয়া তুলি। কিন্তু পথের আহ্বান যখন আসে তখন লক্ষ্মীছাড়া আর বসিয়া থাকিতে পারে না— আবার দৌড় আবার দৌড়! একটা পাকের মধ্যে পড়িয়া গেছি। সমস্ত বিশ্বজগৎটা একটা পাক— কেবলি ঘুরিতেছে— ঘোরাই যেন তাহার পরিণাম— মানবলোকও একটা পাক— কেবলি ঘুরিয়া চলিতেছে তাহার পরিণাম কোথায়? এই জগতই ভগবান বুদ্ধ ব্যাকুল হইয়া এই পাক হইতে কোনমতে বাহির হইবার জন্ত এত চেষ্টা করিয়াছিলেন। সমস্ত মানুষ বাহিব না হইলে একজনের বাহির হইবার জো নাই। জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়া এই মানুষবর্ণীতে ঘুরিয়া মরিতে হয়। তোমাদের বিজ্ঞানের মতে আকাশের এক জায়গায় পাক খাইয়া জগৎ অগণ্য গ্রহতারা যলকিয়া উঠিয়াছে— কোন কোন পণ্ডিত এইরূপ বলে না? এই পাকের মধ্যে অগণ্য চক্র— নক্ষত্রচক্র, সৌরচক্র, গ্রহচক্র, জীবচক্র— এই পাকের বাহিরেই স্থির শাস্তি। প্রাণটা সেই-খানকার জন্ত দুই হাত বাড়ায়, কিন্তু ভীষণ জগতের টান তাহাকে আপনার অনন্ত ঘূর্ণায় বার বার টানিয়া লয়। প্রেমে যেন এই পাকের মধ্যেও একটুখানি স্থিতি ও পরিপূর্ণতার

আভাস পাওয়া যায়। দুইটি হৃদয় মুখামুখি করিয়া বসিলে
 ছগংচক্রের ঘর্ঘরশব্দ কিছুক্ষণের জন্ত যেন শোনা যায় না—
 তখন লাভক্ষতি সুখদুঃখ পাপপুণ্য জয়পরাজয়ের তোলাপাড়া
 কিছুক্ষণের জন্ত ভুলিয়া থাকা যায়। কিন্তু তোমার বিজ্ঞান-
 দিগ্বিজয়যাত্রার সময় এই সকল কবির ক্রন্দন ঠিক নহে, এখন
 জয়ভবীব বাজাই বাজ, এখন হৃদয়েব কথা হৃদয়ের মধ্যেই
 থাকুক।

তুমি জন্মনি আমেরিকায় তোমার জয়পতাকা নিখাত
 করিয়া আসিয়ো। তাড়াতাড়ি করিয়ো না। আমি বোধ হয়
 দুই এক মাসের মধ্যেই তোমাকে কিছু সাহায্য করিতে পারিব
 — তাহার ব্যবস্থা করিয়াছি। এখন আমরা তোমাকে কাছে
 ডাকিব না। আগে তোমার কাজ সাবিত্যা আইস— তাহার পরে
 দীর্ঘ সঙ্কায় প্রদীপ জ্বালিয়া কেদারা টানিয়া বসা যাউবে।

আমার শাস্ত্রনিকেতনের বিদ্যালয়ে একটি জাপানী ছাত্র
 সংস্কৃত শিখিবাব জন্ত আসিয়াছে। ছেলেটি বড় ভাল। সে
 বেশ আমাদের আপনাব লোক হইয়া আসিয়াছে। তোমার
 বন্ধু মীরা প্রত্যহ তাহাকে এক পেয়লা ফুল দিয়া বশ করিয়া
 লইয়াছে। তাহার কাছ হইতে দুটো একটা করিয়া জাপানী
 কথাও শিখিয়া লইতেছে। ইহা যদি তোমার আশঙ্কান বিষয়
 বলিয়া মনে হয় তবে ইহার যথাবিহিত প্রতিকার করিয়ো।

তোমার রনি

বন্ধু

রেণুকার সংশয়াপন্ন অবস্থার টেলিগ্রাফ পাইয়া আমাকে ছুটিয়া আসিতে হইয়াছে। তাহাকে জীবিত দেখিব এক্ষণ আশামাত্র ছিল না। ডাক্তাররা তাহাকে কেবলই Strychnine ব্রাণ্ডি প্রভৃতি খাওয়াইয়া কোন মতে কৃত্রিম জীবনে সজীব রাখিবাব চেষ্টায় ছিল। আমি যেদিন আসিয়া পৌঁছিলাম সেদিন তাহার রোগীর জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিল। আমি আসিয়াই সমস্ত Stimulants বন্ধ করিয়া দিয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করিতেছি। রক্ত ওঠা বন্ধ হইয়া গেছে— কাশি কম, জ্বর কম, পেটের অসুখ কম— বিকারের প্রলাপ বন্ধ হইয়া গেছে— বৃকের ব্যথা নাই— বেশ সহজ ভাবে কথাবার্তা করিতেছে, অনেকটা সবল হইয়াছে— আশা করিতেছি এই ধাক্কাটা কাটিয়া গেল।

কিন্তু বিদ্যালয়ের জন্ত আমার উদ্বেগের সীমা নাই। এখান হইতে তাহার সংকার সদগতি করিব এমন উপায়মাত্র নাই— সমস্তই অব্যবস্থার মুখে ফেলিয়া চলিয়া আসিতে হইয়াছে— কবে যাইতে পারিব তাহার কোন ঠিকানা নাই। কি আর

বলিব তুমি মোহিতবাবু ও রমণীকে লইয়া বিদ্যালয়কে
 দাঁড় করাইয়া দাও— ইহাকে তোমাদের জিনিষ বলিয়াই মনে
 করিয়ো। আমি নিতান্ত একলা হওয়াতেই এত বিশ্ব হইতেছে
 — তোমরা আমার সঙ্গে যোগ না দিলে আমার পক্ষে অসাধা
 হইয়াছে। নূতন যে সকল অধ্যাপক নিযুক্ত করিতে হইবে
 তাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের কর্তব্য স্থির করিয়া
 দাও— ছেলের খাওয়া দাওয়া এবং চরিত্র পরিদর্শনের
 যথোচিত ব্যবস্থা করিয়া দাও— অধ্যয়ন অধ্যাপনের নিয়ম
 বাধিয়া দাও— নহিলে এই সময়ে মাঝপথে উচ্ছ্বল হইয়া
 উঠিলে আব শৃঙ্খলাস্থাপনা কঠিন হইবে— বিদ্যালয়ের বদনাম
 হইবে এবং বর্তমান অরাজকতাব অবস্থায় এমন সকল কুনীতি
 কুশিক্ষা কুদৃষ্টান্ত বিদ্যালয়েব মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে যে
 ভবিষ্যতে কেবল মাত্র অমুতাপ করিয়া তাহার সংশোধন
 হইতে পারিবে না। কুঞ্জবাবু সপরিবারে আছেন দিনরাত্রি
 ছেলের উপর দৃষ্টি রাখা তাহার দ্বারা সম্ভবপর নহে— অনেক
 নূতন ছেলে আসিয়াছে তাহাদের চরিত্র ও আচরণ কিরূপ
 ঠিক জানি না— তাহারা বিদ্যালয়ে যদি কোন কলুষ আনয়ন
 করে তবে আক্ষেপের সীমা থাকিবে না। তুমি আর
 লেশমাত্র বিলম্ব করিয়ো না। মোহিতবাবু বিদ্যালয়ের সমস্ত
 অবস্থা দেখিয়া জানিয়া আসিয়াছেন তাহাকে সহর ডাকাইয়া
 আমার এই চিঠি দেখাইয়া একটা ব্যবস্থা করিয়া লইয়ো।
 রেণুকাকে দিনরাত্রি সাবধানে সেবাশুদ্ধি করিতে হইতেছে—

চিঠি লিখিবাব সময় অত্যন্ত অল্প— এইজন্য মোহিতবাবুকে
চিঠি লিখিতে পারিলাম না। তুমি তাঁহাকে আমার আশ্চর্যক
উদ্বেগ জানাইলে তিনি কখনই উদাসীন থাকিবেন না—
তাঁহাকে অনেক খাটাইয়াছি আরো অনেক খাটাইব। এ
বিদ্যালয়কে সম্পূর্ণ তোমাদের নিজেদের করিতে হইবে। যত-
ক্ষণ লিখিতেছি ততক্ষণ আমার ঘুমানো উচিত ছিল কিন্তু
বিদ্যালয়ের বর্তমান অব্যবস্থায় আমাকে বিশ্রাম করিতে
দিতেছে না। ছুটি কবে পাইব ?

তোমাব ববি

৬

বন্ধু,

আমি পলাতক। একদিন ভূমি ছিলে কাপের মধ্যে, আমি ছিলাম উনতায়— আমি আড় কোন খুঁজতেছি, ভূমি ভিড়ের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িয়াছি। য-কাড় আমান মূলত্বি ছিল সে আমাকে সাদিয়া লইতে হইবে। আমান কাজ সারা হইয়াছে, তাই চাখ বড়িবাদ প্রক্স বাহি নিবাইবাব আয়োজন করিতেছি। এখন ভূমি আমাকে ডাক দিলে চলিবে কেন? দেশের লোকের বাডি হইতে আমান মজ্বি চুকাইয়া লইয়াছি। পূর্ব দশন পাঠলাম কি না সে- হিমাব করিবাদ হইছে নাহি এখন ছুটি বাহিয়া কেটি দিলাম করিব, এইজনা প্রাণ বাবুল হইয়াছে। এই বিষামের দাবী আমান অনায নয়। এম সটা মপ্রব করিবে দেশের লোকের সিকি পয়সা খরচ নাহি সম্মান-মুর্ছনার উত্তা অনেক কাঠ- খড় দরকার হয়, এমন-কি অপমানও নেচার দিনি খরচায় হয় না। কাল আবার বালপদের যি নির্ভেছি। সেখানকার আকাশে এম আলোয় কিছুমাত্র কপণতা নাহি— ছেলে- বেলা হইতে একান্ত মনে এ আকাশকে আলোকে ভাল- বাসিয়াছি— আমান স্বদেশের কাড় হইতে আম কিছু না

পাঠ ঐ জিনিষটি প্রাণ ভরিয়ৱ পাইয়ৱছি— ক্ষুধৱ ঐখনো মেটে
নৱঠ ।

বোঁঠা'নকে নমস্কার দিবে ।

তোমৱর রবি

বন্ধু

তোমার চিঠি পাইয়া বিশেষ সাম্মনা অনুভব করিয়াছি। আমাদের চাবিদিকেই এত দুঃখ এত অভাব এত অপমান পড়িয়া আছে যে নিজেব শোক লইয়া অভিভূত হইয়া এবং নিজেকেই বিশেষরূপ দুর্ভাগ্য কল্পনা কবিয়া পড়িয়া থাকিতে আমার লজ্জা বোধ হয়। আমি যখনই আমাদের দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া দেখি তখন আমাকে আমার নিজেব দুঃখতাপ হইতে টানিয়া বাহির কবিয়া আনে। আমাদের অসহ্য দুন্দশাব মূর্তি ঘরে ও বাহিরে আজকাল এমনি সুপবিস্ফুট হইয়া দেখা দিয়াছে যে নিজের ব্যক্তিগত ক্ষতি লইয়া পড়িয়া থাকিবার সময় আমাদের আর নাই।

এবাবকার কন্‌গ্রেসের যজ্ঞভঙ্গের কথা ত শুনিয়াছি— তাহাব পব হইতে ছুই পক্ষ পবস্পবের প্রতি দোষারোপ কবিতে দিনবাত্রি নিযুক্ত বহিয়াছে। অর্থাৎ বিচ্ছেদের কাটা ঘায়েব উপব ছুই দলে মিলিয়াই নুনের ছিটা লাগাইতে ব্যস্ত হইয়াছে। কেহ ভুলিবে না, কেহ ক্ষমা কবিরে না—আত্মীয়কে পর করিয়া তুলিবাব যতগুলি উপায় আছে তাহা অবলম্বন কবিরে। কিছু দিন হইতে গবর্নেন্টের হাড়ে বাতাস লাগিয়াছে

—এখন আর সিডিশানের সময় নাই— যেটুকু উত্তাপ এত দিন আমাদের মধ্যে জমিয়াছিল তাহা নিজেদের ঘরে আশুন দিতেই নিযুক্ত হইয়াছে। বহুদিন ধরিয়া “বন্দেমাতরম্” কাগজে স্বাধীনতার অভয়মন্ত্রপূর্ণ কোনো উদার কথা আর পড়িতে পাঠি না, এখন কেবলি অন্য পক্ষের সঙ্গে তাহার কলহ চলিতেছে। এখন দেশে দুই পক্ষ হইতে তিন পক্ষ দাঁড়াইয়াছে— চরমপন্থী, মধ্যমপন্থী এবং মুসলমান— চতুর্থ পক্ষটি গবর্মেণ্টের প্রাসাদ-বাতায়নে দাঁড়াইয়া মুচ্কি হাসিতেছে। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানেই বয়। আমরাদিগকে নষ্ট করিবাব জন্য আর কারো প্রয়োজন হইবে না— মর্লিরও নয় কিচেনাবেরও নয়— আমরা নিজেবাই পারিব। আমরা “বন্দে মাতরম্” ধ্বনি কবিত্তে কবিত্তে পবস্পরকে ভূমিসাৎ করিতে পারিব।

শরৎ বহু দিনের পর তোমাদের ওখানে দিশি বান্না খাইয়া এবং বোঠাকুবাণীর শাড়িপরা স্নিগ্ধমূর্তি দেখিয়া ভাবি খুশি হইয়া বেলাকে চিঠি লিখিয়াছে।

কাবখানা ঘবের কাজ চালাইবার উপযুক্ত Engine lathe প্রভৃতির কথা তোমাব চিঠিতে পড়িয়া বিশেষ লোভ জন্মিতেছে। আমি যেমন করিয়া পারি বোলপুবে টেকনিকাল বিভাগ খুলিব। ধর্মপাল আমাকে গোটাকতক কল দিতে স্বীকার করিয়াছে। তাহার কতকগুলি কৃষি-ব্যাপারের যন্ত্র আছে, একটা কাপড় কাচিবার আমেরিকান কল আছে।

স বলে আমি যদি টেকনিকাল বিভাগ খুলি তাহা হইলে
 আমাকে সাহায্য জোগাড় করিয়া দিবে। কিন্তু তাহার
 condition এই যে এই টেকনিকাল বিভাগের নাম রাখিতে
 হইবে Indo-American Industrial School। আমি
 তাহাকে লিখিয়াছি সাহায্যের পরিমাণ যদি যথেষ্ট এক
 অর্থ কাঙ্ক্ষিত হয় তাহা হইলে আমেরিকার ঋণ স্বীকার
 করিতে আপত্তি করিব না। আচ্ছা, তোমাকে যদি হাজার
 খানেক টাকা সংগ্রহ করিয়া পাঠাই তবে সুবেশাক দিয়া
 আমার Workshopএর মালমসলা কিনাইয়া পাঠাইয়া দিতে
 পারিবে কি? এ-সম্বন্ধে তোমার উত্তর পাঠিলে টাকা
 জোগাড়ের চেষ্টা দেখিব।

বখীর চিঠি প্রায়ই পাঠি। তাহাবা সেখানে আনন্দ ও
 উৎসাহের সঙ্গে পড়াশোনা করিতেছে। বলা বাহুল্য তুমি
 আমেরিকায় গেলে তাহাদের অত্যন্ত আনন্দ হইবে— নিশ্চয়ই
 তাহাবা তোমাকে তাহাদের কলেজে টানিয়া লইয়া যাইবে।
 তোমার সঙ্গে আমিও জুটিতে পারিলে কত খুশি হইতাম।
 বোঠাকরণকে আমার কথাটা স্মরণ করাইয়া দিও— সমুদ্রের
 এপারের কালো বন্ধুদের ভাগে জন্মের একটা অংশ রাখিয়া
 দেন যেন। ইতি ১৩শে পৌষ ১৩১৭।

তোমার বনি

508 W. High Street
Urbana. Illinois U. S. A.

ও

বন্ধু

আমি অনেক দিন হইতে তোমার চিঠির জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিলাম না বন্ধুদের কোন্ সূত্র কোথায় কেমন করিয়া কি পরিমাণে ছিন্ন হইয়াছে। এই দীর্ঘকাল এ সম্বন্ধে আমি নিরবচ্ছিন্ন বেদনা অনুভব করিয়াছি। অবশেষে আমি এই কথাই ঠিক করিয়াছিলাম যে আমাদের মাঝখানে এই একটা মায়া, এই একটা ভুল বোঝার কুয়াশা দেখা দিয়াছে ইহার সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া লড়াই করিয়া কোনো ফল নাই কিছু দিন চূপ করিয়া থাকিলে পর ইহা আপনিই স্বপ্নের মত কাটিয়া যাইবে। তাই আমার মনে ছিল দীর্ঘকাল প্রবাসবাসের পর যখন ফিরিব তখন দেখিব মায়াবরণ মিলাইয়া গিয়াছে।

পশ্চিমে আমি সমাদর লাভ করিব একথা মনে করিয়া আসি নাই— যখন অসুস্থ অবস্থায় শিলাইদহে বসন্ত যাপন করিতেছিলাম তখন গীতাঞ্জলি হইতে আমার ছোট ছোট গান ইংরেজি গণ্ডে তর্জমা করিয়াছিলাম, মুহূর্ত্তেই জগৎ মনে করি নাই সেগুলি কোনো কাজে লাগিবে— বিশেষত ইংরেজি

ভাষায় আমার অধিকার সম্বন্ধে আমার মনে লেশমাত্র
 অহঙ্কার নাই। দৈবক্রমে সেগুলি কাজে লাগিয়াছে— তাহাতে
 আমার বিশেষভাবে এই আনন্দ যে যাহাবা আমাকে
 ভালবাসে তাহারা গোবব অনুভব করিবেন। বাংলা সাহিত্যের
 প্রতি সহসা এখানকার লোকের মনে একটা বিশেষ ঔৎসুক্য
 জন্মিয়াছে— অনেক বাংলা শিখিবাব জগৎ আগ্রহ প্রকাশ
 করিতেছে হয়ত তাহাব একটা শুভফল আছে। এদেশে
 আসিয়া আমি দুঃসাহসে ভব দিয়া ভাবতবসেব আদর্শ সম্বন্ধে
 তুই একটা বক্তৃতা করিয়াছি, শিকাগো য়ুনিভার্সিটিতে আমাকে
 আমন্ত্রণ করিয়াছিল সেই উপলক্ষ্যে সম্প্রতি আমি এখানে
 আসিয়াছি। আমার বক্তৃতা এখানকার লোকের ভাল
 লাগিয়াছে, আবার আমন্ত্রণ পাঠিয়াছি। কিছু বক্তৃতা করিয়া
 ঘুরিয়া বেড়ানো আমার পক্ষে এতই ক্লাস্তিকর যে কি করিব
 ভাবিয়া পাঠিতেছি না। আগামী এপ্রেল মাসে ইংলণ্ডে
 ফিবিবাব কথা আছে। সেখানে ম্যাকমিলানরা আমার
 বচনা প্রকাশ করিবাব জগৎ উদ্যোগী হইয়াছে। আমার
 অনেকগুলি কবিতা এবং কিছু কিছু নাটক তর্জমা করিয়াছি—
 সেগুলি এখানকার বসন্ত ব্যক্তিদেব ভাল লাগিয়াছে— এবং
 সেগুলি ছাপা হইলে সমাদৃত হইবে এমন আশা আছে।
 এমনি করিয়া এখানকার গোলমালের মধ্যে দিন কাটিতেছে—
 যতই আদর অভ্যর্থনা পাঠি না কেন— মনের ভিতরটাতে
 একটা ক্লাস্তির ভাব অনুভব করিতেছি— দেশে ফিবিয়া গিয়া

সেখানকার অব্যবহিত আকাশ অপৰ্যাপ্ত আলোক এবং অনবচ্ছিন্ন অবকাশের মধ্যে নিমগ্ন হইবার জন্য হৃদয়ের মধ্যে প্রায়ই একটা উদ্বেগ অনুভব করিতেছি। কিন্তু এখানে আমার কিছু কাজ আছে— সে কাজে ভঙ্গ দিয়া গেলে সেটা অনায়াস হইবে তাই এই আবর্তের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। আশা করিতেছি দেশে ফিরিয়া গিয়া আরো উৎসাহ ও শক্তির সঙ্গে আমার কাজে লাগিতে পারিব।

তোমার
রবি

C/o Messrs. Thomas Cook & Son.

Ludgate Circus, London.

15 May, 1913.

বন্ধু

তোমার বন্ধু Mrs. Booleএর সঙ্গে দেখা হইয়াছে। তিনি তোমার সম্বন্ধে বিশেষভাবে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন। তাঁহার বয়স আশি পার হইয়া গিয়াছে কিন্তু কি আশ্চর্য্য তাঁহার বুদ্ধিশক্তির সজীবতা! তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। Miss MacLeod আমাকে তাঁহার ওখানে লইয়া গিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে তোমার কি এখানে আসিবাব সম্ভাবনা আছে? যদি এখানে একসঙ্গে মিলিতে পাবিতাম ত সুখের তইত। এদিকে আমার বোধ করি ফিরিবাব সময় কাড়ে আসিতেছে; এখানকার সামাজিকতার বৃণির টানে পাক খাইয়া আমার শরীর মন পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। বিদ্যালয়ের চিন্তাও আমাকে পাঠিয়া বসিয়াছে—আব অধিক দিন দূরে থাকি ত্বরিত ক্ষতিকর হইতে পারে।

ইহার মধ্যে একদিন এখানকার সভায় “চিত্রা”র ইংরেজি অনুবাদ পড়িয়া শুনাইয়াছিলাম। এখানকার শ্রোতাদের ভাল লাগিয়াছে। আইরিশ থিয়েটারে আমার “ডাকঘর” নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা হইতেছে।

তবু এই খ্যাতিপ্রতিপত্তির ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে মন

টিংকিতেছে না । একটুখানি নিভূতের জন্ম অত্যন্ত ব্যাকুলতা
বোধ করিতেছি । হাতের কাজগুলো কোনোমতে শেষ করিতে
পারিলেই দৌড় দিব ।

গত বারে দেবেনের সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল ।
তাহাকে দেখিয়া আমি বড় আনন্দিত হইয়াছিলাম ।

শুনিয়াছি তোমার কাজ অগ্রসর হইতেছে এবং বাহিরের
দিক হইতে তোমার বাধাবিন্ধ অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে ।
ফিরিয়া গিয়া তাহার অনেকটা পরিচয় পাইব এই প্রত্যাশা
করিয়া রহিলাম ।

তোমার রবি

১৯২১ সালের ১৯২০

১৯২১

স্বাধীনতা আন্দোলন ২০১০
আন্দোলন প্রতিষ্ঠা না দায়িত্ব কেমন
আন্দোলন কার্যক্রম। দায়িত্ব
স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা। দায়িত্ব
আন্দোলন প্রতিষ্ঠা দায়িত্ব
কিভাবে আন্দোলন? বিপ্লব
আন্দোলন ২৩, বিপ্লব
আন্দোলন ২৩। স্বাধীনতা
বিপ্লব ২৩।

আন্দোলন
আন্দোলন

ও

শান্তিনিকেতন

[১ বৈশাখ ১৩২১]

বন্ধু,

তুমি ত তোমার জয়যাত্রায় বেরিয়েছ—“শিবাস্তু পশ্চানঃ সন্তু ।” আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, তুমি জয়মালা বহন ক’রে নিয়ে এসে তোমার দেশকে অলঙ্কৃত করবে, তুমি বিধাতার আশীর্বাদ নিয়ে গেছ। আজ পয়লা বৈশাখ, আজকের নব বর্ষারস্তুর উৎসবে আমি এই প্রার্থনাই করছি— এতদিন ধ’রে যে সোনার ফসল তুমি ফলিয়ে তুললে মহাকালের তরণী বোঝাই ক’বে দেশে দেশান্তরে সেই ফসল প্রাণ বিস্তার ক’রে দিক।

যদি সম্ভব হয় এবার একবার আমার বন্ধু রোটেন-স্টাইনের সঙ্গে আলাপ ক’রে এসো। তিনি ত খুসি হবেন-ই, তুমিও হবে। আমি তাঁকে, তোমার কথা আগেই লিখে দিয়েছি। তুমিও তোমার পৌছা সংবাদ তাঁকে দিয়ে।

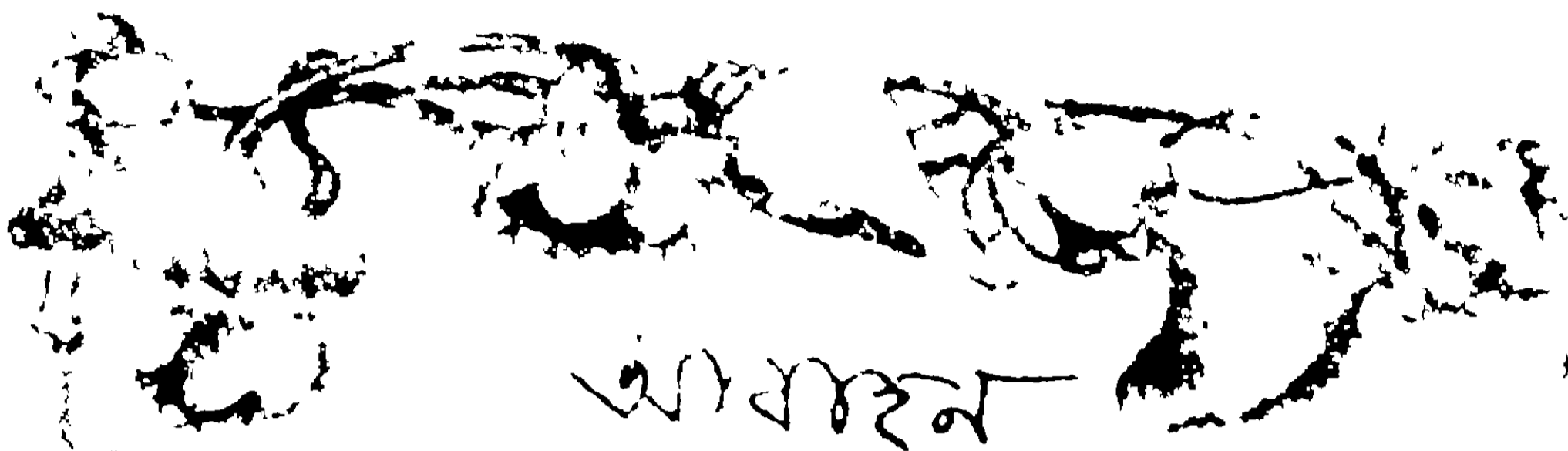
বৌঠাকুরাণীকে আমার নববর্ষের সাদব সম্ভাষণ জানিয়ে।

তোমার রবি

ও

বন্ধু,

তোমার চিঠি এখানে এসে পেলুম। জাপানে পেলো সুবিধা হ'ত, কেননা সেখানে হাতে কতকটা সময় ছিল। কিন্তু এখানে এসে পৌঁছেই এমন প্রচণ্ড ঘুরপাকের মধ্যে প'ড়ে গেছি যে, কিছুই ভাববার অবকাশ নেই— কেবলই আমাকে টানাটানি ছেঁড়াছেড়ি ক'রে ঠেলে নিয়ে চলেচে। এখানকার ঝোড়ো বাতাসে এক মুহূর্ত স্থির হ'য়ে দাঁড়াবার জো নেই— বাড়িতে চিঠিপত্র লেখা পর্য্যন্ত বন্ধ ক'রে দিতে হয়েছে। অস্তুত মার্চ মাস পর্য্যন্ত আমাকে এই ঘূর্ণির টানে সহর থেকে সহরে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াবে। যাই হোক, আমি কোনো জায়গায় একটুখানি স্থির হ'য়ে বসবার সময় পেলোই তোমার গান লেখবার সময় করব। তোমার বিজ্ঞান-মন্দিরে প্রথম সভা উদ্বোধনের দিনে আমি যদি থাকতে পারতুম তা হ'লে আমার খুব আনন্দ হ'ত। বিধাতা যদি দেশে ফিরিয়ে আনেন তা হ'লে তোমার এই বিজ্ঞান-যজ্ঞশালায় একদিন তোমার সঙ্গে মিলনের উৎসব হবে এই কথা মনে রইল। এতদিন যা তোমার সঙ্কল্পের মধ্যে ছিল আজকে তার সৃষ্টির দিন এসেচে। কিন্তু এ ত তোমার একলার সঙ্কল্প নয়, এ আমাদের সমস্ত দেশের সঙ্কল্প, তোমার জীবনের মধ্যে দিয়ে



आवाहन

आहुतीकरणे पुनः यथा न

इदं धारयन्तु यथा न ।

सुखं यथा न जायते यथा न ।

एतन्निमित्तं यथा न इदं प्रकृतौ न

पूर्णं कर्तुं, अथ (कामदिनेषु)

यादिदिनेषु यथा न ।

सुखं यथा न जायते यथा न ।

इत्थं "अथ नराणां यथा न, सुखं यथा न,

अथ यथा न ।

अथ न, अथ न, अथ न ।"

এর বিকাশ হ'তে চলল। জীবনের ভিতর দিয়েই জীবনের উদ্বোধন হয়— তোমার প্রাণের সামগ্রীকে তুমি আমাদের দেশের প্রাণের সামগ্রী ক'রে দিয়ে যাবে— তার পর থেকে সেই চিরস্থান প্রাণের প্রবাহে আপনিই সে এগিয়ে চলতে থাকবে। কতবার আমরা নানা মিথ্যার সঙ্গে জড়িয়ে কত মিথ্যা জিনিষের সৃষ্টি করেছি— তার উপরে অজস্র টাকা ব্যয় ক'রেও তাদের বাঁচিয়ে তুলতে পারিনি। কেবল মাত্র অভিমান দিয়ে ত কোনো সত্য বস্তু আমরা সৃজন করতে পারিনি। কিন্তু এ যে তোমার চিরদিনের সত্য সাধনা— এর মধ্যে তুমি যে আপনাকে দিয়েচ, আপনাকে পেয়েচ— তুমি যে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির মত তোমার মন্ত্রকে তোমার অস্তরে প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়েচ, এইজন্মে বাইরে তাকে প্রকাশ করবার পূর্ণ অধিকার ঈশ্বর তোমাকে দিয়েছেন। সেই অধিকারের জোরে আজ তুমি একলা দাঁড়িয়ে তোমার মানস-পদ্মের বিজ্ঞান-সরস্বতীকে দেশের হৃদয়-পদ্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত কর্চ। তোমার মন্ত্রের গুণে, তোমার তপস্যার বলে— দেবী সেই আসনে অচলা হবেন, এবং প্রসন্ন দক্ষিণ হস্তে তাঁর শুভ্রদের নব নব বর দান করতে থাকবেন।

দেশে ফেরবার জন্মে মন ব্যাকুল হ'য়ে রয়েছে। এখানকার কাজ শেষ হ'তে কতদিন লাগবে জানিনে। কিন্তু এইরকম উর্দ্ধ্বাসে লাটিমের মত ঘুরে' বেড়াতে আর পারিনে।

তোমার রবি

বন্ধু,

এতদিন শরীরটা অত্যন্ত টলমলে অবস্থায় ছিল— এখন ভাঙন ধরা শুরু হয়েছে। কানের উপরে এক পর্দা প'ড়ে গেছে— ভাল ক'রে শুন্তে পাচ্চিনে। তার উপরে শরীর এমন ক্লান্ত যে, প্রতিদিনের সামান্য কাজটুকু করাবার জ্ঞে তাকে ঠেলাঠেলি করতে হয়। ডাক্তার বল্চে, একেবারে চূপচাপ ক'রে থাকতে। তাই এতদিন পরে চিঠি পড়বার ও চিঠি লেখবার জ্ঞে একজন সেক্রেটারী রাখতে হয়েছে— সর্বদা নিজের কাছে কাছে এরকম একজন লোককে লাগিয়ে রাখতে আমার অত্যন্ত খারাপ লাগে, কিন্তু আর উপায় নেই। এদিকে কনগ্রেসের সময় একটা কিছু বল্বার জ্ঞে আমার উপরে অন্তরে বাহিরে তাগিদ এসেছে, কিন্তু কিছুকাল বিজ্ঞামের পর যদি ভাল থাকি ত চেষ্টা করব— এখনকার মত সুগভীর নিঃস্বপ্নাতার মধ্যে ডুব মারব। কোনো নূতন যায়গায় গেলে মনের বিক্ষিপ্ততা ঘটে, তাই শাস্তিনিকেতনে যাওয়া ঠিক কর্চি— সেখানে বিদ্যালয়ের ছুটি— কেউ লোক-জন নেই। বেলাকে ছেড়ে বেশী দূরে যাতায়াত চল্বে না। কানটা আশা করি বিজ্ঞামের পরে আবার সতেজ হ'বে— না যদি হয় তা হ'লে রক্তমঞ্চ ছেড়ে নেপথ্যে স'রে পড়ব—

মাঝি তোর বৈঠা নে রে

আমি আর বাইতে পারলেম না।

নিবেদিতার বইয়ের সেই ভূমিকা লেখবার মত মনের সচেত্বতা নেই। তোমাদের লেকচারের অন্তে কবে তৈরী হ'ব তা বলতে পারিনে— বোধহয় এখন থেকে কর্তব্যকে সঙ্কীর্ণ ক'রে এনে জীবনের একটা সীমা নির্দ্ধারণ ক'রে নিতে হবে— এই সহজ কথাটা মনে রাখতে চেষ্টা কর্ব— যা আমি পারি তার চেয়ে আমি বেশী পারিনে।

তোমার রবি

বন্ধু,

বৌমার খুব কঠিন রকম জ্যামোনিয়া হয়েছিল। অনেক দিন লড়াই করে কাল থেকে ভাল বোধ হচ্ছে। সম্পূর্ণ সুস্থ হতে বোধ হয় অনেক দিন লাগবে। হেমলতা এবং সুকেশী এখনো ভুগছেন। তার মধ্যে হেমলতা প্রায় সেরে উঠেছেন— কিন্তু সুকেশীর জন্মে ভাবনার কারণ আছে।

কিন্তু ছেলের মধ্যে একটিরও ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়নি। আমার বিশ্বাস, তার কারণ, আমি ওদের বরাবর পঞ্চতিস্ত পঁচন খাইয়ে আস্চি। ছেলের অনেকেরই ছুটির মধ্যে বাড়ীতে নিজেরা ভুগেছে এবং সংক্রামকের আড্ডা থেকে এবং কেউ কেউ মৃত্যুশয্যা থেকে এসেছে। ভয় ছিল, তারা এখানে এসে রোগ ছড়াবে— কিন্তু একটুও সে লক্ষণ ঘটেনি, এবং সাধারণ জ্বরও এ বছর অনেক কম। আমার এখানে প্রায় দুশো লোক, অথচ হাঁসপাতাল প্রায়ই শূন্য প'ড়ে আছে— এমন কখনও হয় না—তাই মনে ভাবচি এটা নিশ্চয়ই পঁচনের গুণে হয়েছে।

অজিতের অকাল-মৃত্যুতে সাহিত্যের ক্ষতি হবে। তার গুণ ছিল— সে সম্পূর্ণ নির্ভীক ভাবে প্রবল পক্ষের বিরুদ্ধে এবং প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে নিজের মত প্রকাশ করতে পারত।

ঠিক বর্তমানে সে-রকম আর কোন বাংলা লেখক আমার ত
মনে পড়চে না ।

আমি নিজেকে কোন স্পষ্ট ব্যামোয় পড়িনি— কেবল মাঝে
মাঝে খুব একটা ক্লান্তি আমাকে চেপে ধরে— সেই পুনঃ পুনঃ
ক্লান্তিটাই আমার ছুটির দরবার । আমার দ্বারা যতটা হতে
পারে নানা রকমে তা করেছি, এখন অন্যদের ক্ষণে জায়গা
ছেড়ে দেবার সময় এসেচে । নূতন লোক এসে নূতন ভাষায়
নূতন কালের স্রষ্টা কথা ক'বে এইটাই হচ্ছে আবশ্যিক—
নিজের পালাটাকে তার সময় অতিক্রম করিয়ে জোর ক'রে
টেনে রাখাটাই ভুল । ইতি ১৭ পৌষ ১৩২৫

তোমার রবি

ও

বন্ধু

তোমার “অব্যক্ত”র অনেক লেখাই আমার পূর্ব-
পরিচিত—এবং এগুলি পড়িয়া অনেক বারই ভাবিয়াছি যে
যদিও বিজ্ঞানবাণীকেই তুমি তোমার সুরোরাণী করিয়াছ
তবু সাহিত্যসরস্বতী সে পদের দাবী করিতে পারিত—কেবল
তোমার অনবধানেই সে অনাদৃত হইয়া আছে। ইতি ৮ই
অগ্রহায়ণ ১৩২৮

তোমার রবি

বন্ধু

“বিশ্বভারতী”কে এইবার সাধারণের হাতে সমর্পণ করে দিচ্ছি। তোমাকে এর ভাইস-প্রেসিডেন্টের আসনে বসাতে চাই। সম্মতি লিখে পাঠিয়ে। বেশি কিছু দায়িত্ব নেই, কেবল তোমার সঙ্গে নামের যোগ না থাকলে চলবে না— সময় যদি পাও এই সূত্রে কাজের যোগও ঘটবে।

এখানে কিছুদিন বিপরীত গরম গিয়েছিল। এখনো মাঝে মাঝে একএকদিন আকাশে বাতাসে অগ্নিবাণ ছুটতে থাকে। ক্ষণে ক্ষণে আমার মন বিচলিত হয়েছিল; ভেবে-ছিলুম দার্জিলিং-তে তোমাদের পাড়ায় ঘুরে আসব, অমনি তোমাকে বিশ্বভারতীর Constitution দেখিয়ে সভ্য করে আসব। কিন্তু এই মাঠের মধ্যেই আমার সমস্ত সময় এবং সম্বল খরচ করতে হচ্ছে— আমার না আছে অবসর না আছে পাথের। সমুদ্র পার থেকে দুইএকজন আমার কাজে যোগ দিতে এসেছেন, তাঁদের ফেলে রেখে চলে যেতে পারচিনে।

Constitutionখানা ছাপা হয়েছে, রেজিস্ট্রি হয়ে গেলেই তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। ইতি ২৯ বৈশাখ ১৩২৫ [১৩২২ ?
12 May 1922 ?]

তোমার রবি

শাস্তিনিকেতন

বন্ধু

অবশেষে দেশে এসে পৌঁছলুম। কিন্তু চারিদিকে ক্ষুদ্রতা ও বীভৎসতার ঘূর্ণিপাকের মধ্যে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠল। হঠাৎ একটা perspective থেকে আর একটার ভিতরে এসে নিজে মুগ্ধ যেন খাটো হয়ে পড়ি। বহুদিন পরে দেশে ফিরে আসার আনন্দ যখন ম্লান হয়ে এসেছিল এমন সময়ে আমার নামে উৎসর্গ করা তোমার যে বই আমার অনুপস্থিতিকালে এখানে এসেছিল সেইটি হাতে আসাতে তখনি বুঝতে পারলুম এইখানেই আমাদের সত্য, এই আলো, এই প্রাণ— এই ভারতের নিত্য পরিচয়। এই বইখানির মধ্যে তোমার বন্ধুত্বের বাণী পেয়ে ভারি আনন্দ হল— মনে যে অবসাদের ছায়া এসেছিল সেটা যেন কেটে গেল। মাঝে মাঝে সত্যের স্পর্শে যখন মায়ার কুয়াশা দূর হয়ে যায় তখন বুঝতে পারি যে আমাদের মনের তন্তুতে তন্তুতে অনেক আদিম অভ্যাস জড়িয়ে আছে— কথায় কথায় জুজু আমাদের পেয়ে বসে— সে যে বস্তুত কিছু না এটা বুঝেও বোঝা শক্ত হয়ে ওঠে।

একেবারে ৭ই পৌষের মুখে এসে পৌঁচেছিলুম। কলকাতায় যে কয়ঘণ্টা ছিলাম অবকাশমাত্র ছিল না। তাড়াতাড়ি চলে

আসতে হোল— তাই তোমার সঙ্গে সেদিন দেখা করতে পারলুম না। কবে আবার সহবে ফিরব নিশ্চয় জানিনে— কিন্তু গেলেই দেখা হবে।

তোমার আশ্চর্য্য কীর্তির বিবরণ মাঝে মাঝে পেয়েছি— সে কীর্তি আজ সমস্ত বাধা লঙ্ঘন করে পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হয়েছে। এতে মনে কত আনন্দ ও গৌরব অনুভব করি ব'লে শেষ করতে পারিনে। ইতি ২৮ ডিসেম্বর ১৯২৬

তোমার রবি

বৌঠাকুরাণীকে আমার সাদর নমস্কাব।

বন্ধু

এখানে এসে কিছু ভালো আছি। কিন্তু চলতে ফিরতে কষ্ট ও ক্লান্তি বোধ হয়। ডাক্তাররা অস্তুরে বাইরে উল্টে পাণ্টে আমাকে তন্ন তন্ন করে দেখেছে। বলচে কোনও কল একটুও বিগড়ায় নি— নাড়ীতে রক্তশ্রোতের ব্যবহার খুবই ভালো। নানা তুচ্ছিত্তা ও কাজের তাড়ায় আমাকে জখম করেছে। এখানে সকালে বিকালে খুব অল্প অল্প করে একটু বেড়ানো অভ্যেস করছি— বেশি পারিনে। লিখতে পড়তে একটুও শ্রান্তি বোধ করিনে। নানা লোক এসে নানা বাজে কাজে আমার উপর উৎপাত করে সেইটেতে বড় পীড়ন করে।

রথীদের কাছে তোমার ভিয়েনার সমস্ত খবর শুনে খুব আনন্দ বোধ করেছি। যখন দেখা হবে সব কথা শুনব। আজ আমার একজন চীনদেশী বন্ধু আসছেন তাঁর জগ্গে ব্যস্ত আছি। যখন তাঁদের দেশে গিয়েছিলুম ইনি আমাদের অজ্ঞত আতিথ্য করেছেন। ইতি ৮ অক্টোবর ১৯২৮

তোমার রবি

বৌঠাকরুণকে সাদর অভিবাদন।

শ্রীযুক্ত কামদেব চন্দ্র চন্দ্র

শ্রীযুক্ত কামদেব

১৫

যেদিন বৃষী ছিল চন্দ্রসীম বন্দীসীম বন্দু,
 প্রান্তর আনন্দে ছিল, সঙ্গীত ছিল, দুঃখ ছিল, শুক
 দেখা দিল মাঝে বিচ্ছিন্ন। শুক পূর্ণ পূর্ণাতুর
 কন লাগে ছিল শুক মাঝে পদমদ শুক
 বিচিত্র গহন তলে। পরে গম মাঝে অতিশয়,
 দিল তারে পূর্ণ ফল, বিস্ময়গিত দিল হৃদয়বীণা।
 প্রান্তর আনন্দে আশা সূচ ছিল তারে অনুভব,
 মাঝে গুণ বিচ্ছিন্ন আনন্দে, ইচ্ছিতে, মাঝে।
 তার দিন বন্দী বন্দীসীম বিস্ময়গিত
 চলিছিল নানা মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন/কালাহর
 মীমাংসী বন্দীসীম; আনন্দে আনন্দে শুক
 প্রতিদিন উচ্ছিন্নে চন্দ্রসীম শুক শুক

ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଷୟ ସମୀକ୍ଷା; ନିର୍ଦ୍ଦେଶମାନଙ୍କ
ମଧ୍ୟରୁ ଉପରୋକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ।
ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟ
ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା, ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭେ ଦେଖାଯାଇ ବିଷୟ, —

କାହାଣୀ ଯୋଗୁଁ ଆସିବ; — ଯେ ଉପରୋକ୍ତ, ତାହା ପ୍ରକାଶ
କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ; ଏହାକୁ ଅନୁରୋଧରେ
ଅବଶ୍ୟକ ପ୍ରକାଶ କରିବ; ଯଦି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଯେ ଶିକ୍ଷକ
ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇ ଅଧ୍ୟୟନ
ଅନୁରୋଧ ଅନୁରୋଧ କରି; ପ୍ରକାଶିତ ଯେ ଉପରୋକ୍ତ,
ପ୍ରକାଶିତ ଉପରୋକ୍ତ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇ ଉପରୋକ୍ତ
କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେବ, ତାହାକୁ ଉପରୋକ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ
ବିଷୟ ଅନୁରୋଧରେ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକାଶ ଦିଆଯାଇ ।
ପ୍ରକାଶିତ ଉପରୋକ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟରେ ଅନୁରୋଧ ହେବ
ଉପରୋକ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ ।
ଉପରୋକ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ
ଉପରୋକ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ

- ଉପରୋକ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ;
ଉପରୋକ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ ।
- ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ, ଉପରୋକ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ —
ଉପରୋକ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ
ଉପରୋକ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ

কাম্পিত কবিতা গায়ে। দেবতা আমর পরাভব
যেদিন প্রসন্ন হন, সেদিন উদার কথার
স্বিকৃত অমরতায় ওরোহণ করিয়া দেয় রঙী
বীণ বিজয়ীর তরে, পাশের পাতলা অপ্রভা
মার্জিত ছুঁয়ায় উড়ে।

মান ওরোহে একদা যেদিন

আমর প্রাচুর্য তব, অপ্রকার অনুকারে লীল,
গীর্ষা কাচকিত পাথ চলেছিলে ব্যস্ত চরণে,
মুদ্র সঙ্গতাব মাথ প্রতিফলে একদা রান
হেঁকে পীঠিত আবু। সে দুঃখই তোমার মাথায়,
সে অক্ষয় ছেলোহে পরাদীপ, অরহা দিপোহে প্রায়,
সোপেহে অক্ষয় তব ওরোহর গভীর অকুর।
তোমার অসিত মাতৃম ওমি ওমি দিক দিলে
অমুদ্রক একদা একদা; আমর দীপ্তিতে অক্ষি
বন্ধু, তুমি দীপ্তমান; উচ্চসি উচ্চিহে ওমি
বিপুল স্বীকৃতি মনু তোমার ওরোহে সংঘর্ষাক।
কৌতুক মডার এনে যেখা তব আমর বিবাহে
মেথায় অক্ষয় দীপ্ত ছলে অক্ষি দীপ্তানি উৎসবে।
ওরোহে একদা দীপ্ত ওমি মাথ মিলনইনু যবে

ଘୋର ଦେହେ ଓର ମାରେ, ଏ ଦୀପ ଚକ୍ର ଶାଠ ଛାନ୍ଦା;
 ତୋର ଉପସ୍ଥାପନେ ଦିନ ପାଠ ବିହୀନ ବିଦ୍ୟାଳୟ
 ଶାନ୍ତି ବିକଳେ କୁଳ, ଯେଉଁଠି ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର
 କବି-ଶାଠ ବସନ୍ତେ ମେ ଚକ୍ର ସମାଧାନେ ଧାଲ;
 ଶାନ୍ତିର ଚକ୍ର ବି ମେ ତେ ଶାନ୍ତିର ଅନ୍ଧାର ଚକ୍ର,
 ଦୁର୍ଦ୍ଦିବି ହୋଇଛି ଦୀପ ଚକ୍ର ଓ ଅନ୍ଧାରୀମାନେ ।
 ଶାନ୍ତି ମହାଶୟ ଶାନ୍ତି ଧୋଇଲେ ମେ, ସନ୍ତ ସନ୍ତୁକ୍ତି,
 ସନ୍ତ ଓ ଚକ୍ର ଚକ୍ର, ସନ୍ତ ଓ ଅନ୍ଧାର ଚକ୍ର ।



ଶାନ୍ତି ବିକଳେ
 ୨୪ ଅଗଷ୍ଟ
 ୨୦୨୧

ও

বন্ধু

তোমার এই বিষম উদ্বেগের দিনে কিছুই করবার উপায় নেই এই আমার ছঃখ। চলাফেরা আমার পক্ষে কঠিন হয়েছে—চুপ করে বসেই আমাকে কাজ চালাতে হয়। যতটুকু আমার নিজের যথার্থ কাজ তার বেশি কোনো ভার নেওয়া আমার উচিত নয়—কিন্তু বাইরে থেকে বোঝা এসে পড়ে তাকে ঠেলে ফেলা যায় না। শীতকালে আগন্তুক অতিথির সমাগম বাড়তে থাকবে সেইটেতে আমাকে বড় ক্লান্ত করে।

রথীর চিঠিতে শুনেছিলুম সুইজারল্যান্ডে তোমার স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। আশা করি সেটা এখন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়ে থাকবে।

আগামী গ্রীষ্মে যুরোপে গিয়ে আর কিছু না করে একবার শরীরটাকে সারিয়ে নিয়ে আসবার চেষ্টা করব।

তোমার ৭০ বছরের অভিনন্দনসভায় নিশ্চয়ই আমি যোগ দিতে যাব। তখন শীতের সময় শরীরে এখনকার চেয়ে বল পাব বলে বিশ্বাস করি।

বর্তমান ছুর্ঘ্যোগ উত্তীর্ণ হয়ে তোমার শরীর মন সুস্থ সবল থাক এই আমি একান্ত মনে কামনা করি। ইতি বিজয়াদশমী ১৩৩৫ [৭ কার্তিক]

তোমার রবি

বন্ধু

তোমার ছুটি যদি এখানে কাটিয়ে যাও তা হলে বোধ হয় তোমার উপকার হয়। আমি ত ছর প্রভৃতি নিয়ে এসে এখন বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছি— ওজনে প্রায় ৩ সের বেড়েছি। তুমি বোঁঠাকরুণকে সঙ্গে করে নিয়ে এস— তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না। জিনিষপত্র কিছু আনবার চেষ্টা কোরো না। বিছানা যথেষ্ট আছে— কেবল গায়ে দেবার কম্বল এনো। তোমার জন্মে চা চুরুট তামাক প্রভৃতি সমস্ত নেশার জোগাড় করে রেখেছি। পড়বার বই এবং লেখবার অবকাশ এখানে যথেষ্ট পাবে— বেড়ার মাঠ এবং সঙ্গীরও অভাব হবে না। আমি আজকাল সকালে তিন ঘণ্টা বেড়াই, এ-কথা চিঠি পড়ে তোমার বিশ্বাস হবে না— এখানে এলেই প্রমাণ হবে।

তুমি যদি সকালের ট্রেনে ছাড় তা হলে সন্ধ্যাবেলায় ঠাণ্ডা লাগ্‌বার আশঙ্কাটা থাকে না। সে গাড়িটা সাতটার সময় ষ্টেশন ছাড়ে। এখানে এসে প্রায় বারোটোর সময় পৌঁছয়— বর্তমানে দশ মিনিট ধামে— আগে থাকতে ব্রেকফাস্ট টেলি-গ্রাফ করে দিয়ে ওখান থেকে খাদ্যদ্রব্য গাড়িতে তুলে নিতে পার।

কবে ও কখন ছাড়বে সে-খবরটা আমার চিঠি পেয়েই
আমাকে টেলিগ্রাফ করে দিয়ে— তা হলে তোমাদের যান
বাহন ঘর প্রভৃতি সমস্ত ঠিক করে রেখে দেব। ইতি বুধবার।

তোমার রবি

অবলা বসু মহোদয়াকে লিখিত

৪ জুন ১৯০১

ও

কলিকাতা

৪ জুন ১৯০১

মাননীয়স্ব

আপনি ধন্য । আমরাও দূরে থাকিয়া তাঁহার বন্ধুত্ব ধন্য হইয়াছি । আমার গর্ষ আমি গোপন করিতে পারিতেছি না— আমি সকলকে জয়সংবাদ জানাইয়া বেড়াইতেছি । ত্রিপুরার মহারাজকে কাল টেলিগ্রাফ করিয়া দিয়াছি ।

বন্ধুকে তাঁহার কর্মসমাধার পূর্বে দেশে আসিতে দিবেন না । এদেশে তাঁহার জীবন নিরর্থক হইবে । আমরা তাঁহাকে যুরোপে রাখিবার আয়োজন করিতে পারিব— তিনি যেন তাঁহার এই সামান্য কাজটুকু করিবার অবসর আমাদিগকে দেন ।

আপনার প্রবাসে থাকিয়াও আমাদের অপেক্ষাও ভারতের অস্তুরে রহিয়াছেন— সেইখানে, স্বদেশের হৃদয়-মণ্ডলে, চিরদিন আপনাদের প্রতিষ্ঠা অক্ষয় হউক !

আপনাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মাননীয়ান্নু

ঠিক নববর্ষের প্রথম দিনের প্রভাতে আপনার চিঠি আনন্দসংবাদ বহন করিয়া সমুদ্র পার হইয়া এই প্রান্তরের মধ্যে আমার হাতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কলিকাতা হইতে সেদিন অনেক কলেজের ছাত্র এবং মোহিতবাবু প্রভৃতি অধ্যাপকদল এখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রাতঃকালের উপাসনা শেষ করিয়া আমরা আমাদের বিদ্যালয়গৃহে বসিয়া ছিলাম এমন সময় আপনার পত্রখানি আসিয়া আমাদের উৎসব সম্পূর্ণ করিয়া দিল। আমাদের এই বাংলা দেশের নববর্ষের আনন্দ অভিবাদন আপনারা গ্রহণ করুন। অধ্যাপকমহাশয় জয়যুক্ত হইবেন তাহাতে সন্দেহ মাত্র করি না— নিঃশঙ্ক ভারতবর্ষ তাঁহাকে শেষ পর্য্যন্ত সাহায্য করিবে। ক্রমে ক্রমে আমার কেবলি ইচ্ছা হয় আপনাদের দেখিয়া আসি। নানা কারণে আমি তাহাতে অক্ষম। যদি আপনারা ভারতবর্ষে ফিরিবার সময় জাপান দিয়া ঘুরিয়া আসেন তবে সেই সময়ে জাপানে গিয়া আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত একান্ত চেষ্টা করিব। নিবেদিতার কল্যাণে একটি জাপানীর সহিত আমার বন্ধুতা হইয়াছে—

অধ্যাপকমহাশয়কে তাঁহারা জাপানে বন্দী করিবার জন্য
অত্যন্ত উৎসুক আছেন ।

আমার এখানকার খবর আপনি নিশ্চয় জানেন । আমি
এখন গুটিকয়েক বালক লইয়া এখানে নিভূতে পড়াইতেছি ।
আশা করিতেছি এই অঙ্কুরটি ক্রমে বড় গাছ হইয়া ফলবান্
হইয়া উঠিবে । ইতি ৩রা বৈশাখ ১৩০৯

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মাননীয়াসু

বিদ্যালয় আজ খুলিয়াছে। আমার কাজ আরম্ভ হইল। এ কয়দিন ছুটির সময় কয়েকটি ছেলে ছিল— তাহাদিগকে অল্পস্বল্প পড়াইতেছিলাম— আজ এখানকার শূন্যতা অনেকটা পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। এখন হইতে এই কাজের মধ্যেই আমার विश্রাম— এই কাজের মধ্যেই আমার শরীর মনের চিকিৎসা। কাজ হইতে দূরে গিয়া কি আমার মন শান্ত হইবে? আমার অবর্তমানে বিদ্যালয়ের যে যে অংশ বিকল হইয়া গিয়াছিল—সেই সমস্ত অংশ আমাকে সংস্কার করিতে হইবে। অধ্যাপক ও ছাত্রদের অন্তরের মধ্যে ভ্রম হইতে আগুনকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে— সমস্ত উজ্জ্বল ও সজীব করিতে হইবে। এই সকল কাজের কথা স্মরণ করিলে আমার দুর্বলতা চলিয়া যায়। আমার কাজ অসম্পন্ন থাকিবে না— আমি রণে ভঙ্গ দিব না।

ইংরাজি শিক্ষার সুবিধার জন্ত আমি সুবোধকে আবার দিল্লি হইতে টানিয়া আনিয়াছি। সুবোধ ইংরাজি ভাল পড়াইত। দিল্লিতে সে হেডমাষ্টার হইয়া আমাকে বড় বিপদে ফেলিয়াছিল। আমি তাহাকে জবরদস্তি করিয়া এখানে

ফিরাইয়াছি। অরবিন্দ সম্বন্ধে এখন হইতে আপনি আর কিছুই ভাবিবেন না।

আপনি কেন আমাকে লোভ দেখাইতেছেন! দার্জিলিঙে আপনার ওখানে যাইতে পারিলে আমি আর কিছু চাহিতাম না। কিন্তু বালককালে ইস্কুল পালাইয়াছি এ বয়সে আর চলে না। আমার অনেক লেখাপড়ার কাজ মূলতবি আছে— আপনার আশ্রয়ে যদি যাইতে পারিতাম তবে অধ্যাপক একদিকে আর এই সম্পাদক আর একদিকে নিঃশব্দে আপন আপন কাজে লাগিয়া থাকিতাম— ক্ষুধার সময় আপনার কাছে গিয়া পড়িতাম— কিন্তু নিরামিষ, তাহা বলিতেছি— আর কষ্ট মাছ নয়— দ্বিপদ চতুষ্পদের ত কথাই নাহি। কলিকাতার চেয়ে শরীরটা অল্প একটু সারিয়াছে। যদি ছুটি লওয়া সম্ভব ও আবশ্যিক বোধ কবি তবে অগ্রহায়ণের পূর্বে নড়িব না। আমার বোটে কি আপনাদের টানিতে পারিব না? আমাকে নিঃসহায় পদ্মায় বিসর্জন দিবেন? আমাকে যদি এমন করিয়া অবহেলা করেন তবে একলা এই শরীরটাকে লইয়া কত করিব?

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মাননীয়ানু

অরবিন্দের জন্ম কিছুমাত্র ভাববেন না। এবারে আসবামাত্র তাকে পিসিমার জিন্মা করে দেব— তিনি ওকে মাছ ভাত মাংস, সজ্জনের ডাঁটা, কুম্ভোর ফুল, লাউডগা-সিদ্ধ প্রভৃতি খাইয়ে তাজা করে তুলবেন।

আপনাকে আর একটি কাজ করতে হবে— আমাকে সম্মান এবং শ্রদ্ধা প্রভৃতি করা একেবারে ছেড়ে দেবেন। তার প্রধান কারণটা আপনাকে বলি। সম্প্রতি আমার বয়স যে যথেষ্ট হয়েছে সে ঢাকবার কোনো উপায় নেই— আমার দেহযন্ত্র এ সম্বন্ধে অধ্যাপক মশায়ের চেয়ে ঢের বেশি সরল। আমার নিজের মাথার পাকা চুল আমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে এমন অবস্থায় আপনারাও যদি আমাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন তাহলে আমার কি উপায় হবে। যদি স্নেহ করেন ত বাঁচি— তাহলে অল্প বয়সের স্মৃতিটাও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। আমার এক বৌঠাকরুণ ছিলেন আমি ছেলেবেলায় তাঁর স্নেহের ভিখারী ছিলাম— তাঁকে হারানর পর আমার ক্রতপদবিক্ষেপে বয়স বেড়ে উঠেছে এবং আমি সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করে হয়রান্ হয়েছি। কিন্তু আপনার কাছে এ রকম নৃশংসতা প্রত্যাশা করি নি। আপনার বয়স আমার চেয়ে কম

কিন্তু ঈশ্বর আপনাদের স্নেহ করবার স্বাভাবিক শক্তি দিয়েছেন—সেজন্যে আপনাদের বয়সের অপেক্ষা করতে হয় না—সকলের দাবী মিটিয়ে সকলের ভাগ চুকিয়ে আমার মত জরাজীর্ণের জ্ঞাও কিঞ্চিৎ বরাদ্দ করে দিলে স্নেহের নিতাস্ত অপব্যয় হবে না। আমাকে যদি “আপনি” বলা ছেড়ে দিয়ে “তুমি” বলবার চেষ্টা করে কৃতকার্য হতে পারেন ত উত্তম—যদি অসাধ্য বোধ করেন তবে পত্র শ্রদ্ধাস্পদেষু প্রভৃতি বিভীষিকা প্রচার করবেন না। তার চেয়ে আমাকে আপনি “কবিরেষু” বলে লিখবেন। আপনাদের কাছ থেকে এ রকম উৎসাহজনক সম্ভাষণ পেলে হয়ত আমার কলমের বেগ আরো বাড়তে পারে—সেটাকে যদি ছুঁর্ঘটনা জ্ঞান না করেন তবে দ্বিধা করবেন না।

দ্বিতীয় নিবেদন, বোলপুরে আসবার জ্ঞে প্রস্তুত হোন। বিলম্ব করবেন না। ইতি ৩রা শ্রাবণ ১৩১৩।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৌঠাকুরাণী

আজ্ঞ আপনার সম্বন্ধ পত্র পাঠিলাম। ইচ্ছা ছিল লিখি যে আমার শরীর অত্যন্ত খারাপ— কিন্তু দুই কারণে লিখিলাম না— এক, লিখিলেও আপনার দয়া উদ্বেক করিত না, দুই, সম্প্রতি আমার শরীর খারাপ নয়। শেষ কারণটা তেমন গুরুতর বলিয়া গণ্য করি না কিন্তু প্রথমটা মারাত্মক— অতএব খুব উচ্চ কণ্ঠে সত্যে বলিতেছি বেশ আছি, ভাল আছি, রোগের কোনো চিহ্নও নাই।

নিবেদিতা যে আপনার ওখানে পীড়িত অবস্থায় তাহা আমি জানিতাম না— আমি একখানা বই চাহিয়া তাঁহাকে কলিকাতার ঠিকানায় কয়েক দিন হইল পত্র লিখিয়াছি। আপনি দয়া করিয়া এমন ব্যবস্থা করিবেন যে, সে পত্রের যেন তিনি কোনো নোটিস্ না লন। তাঁহাকে আমার সাদর নমস্কার জানাইবেন এবং বলিবেন যে উৎসুক চিত্তে তাঁহার আরোগ্যপ্রত্যাশায় রহিলাম।

আমি বোলপুর বিদ্যালয় খোলার অস্তুত দুই সপ্তাহ পরে শিলাইদহ অভিমুখে রওনা হইব অতএব আপনাদের সঙ্গে তৎপূর্বে নিশ্চয় দেখা হইবে। আপনি যদি বোলপুরে পদার্পণ করেন তবে আরো সম্ভব দেখা হইতে পারে বিশেষ আপনি

যখন অনেকবার— , থাক্, এ নিষ্ফল আলোচনায় প্রয়োজন নাই ।

বেলা ও তাহার স্বামী আসিয়াছিল দিন তিনেক হইল চলিয়া গেছে— মীরাও তাহাদের সঙ্গে মজঃফবপুর গেছে— তাই আমার এখানকার আশ্রম সম্প্রতি আমার পক্ষে অত্যন্ত শূন্য হইয়া গেছে ।

অরবিন্দর সহপাঠীরা সকলেই কাঠিক মাসের জন্ম বাড়ি গেছে— কেবল যোগেন আছে । সেও ছুই এক দিনের মধ্যে চলিয়া যাইবে । কেবল ছুটির জন ছয় সাতের ছাত্র থাকিবে । অজিতও আজ বায়ুপরিবর্তনের জন্ম দিল্লি অভিমুখে রওনা হইল । অরবিন্দ ফিরিয়া আসিলে, যদি ইচ্ছা করেন, ত এখানে পাঠাইতে পারেন । তাহার অঙ্ক ও সংস্কৃতের অধ্যাপক এখানে আছেন । ইতি । ৩১শে আশ্বিন ১৩ [১১ বা ১৩]

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মাননীয়াসু

আপনার চিঠি পেয়ে খুব খুশি হলাম। আপনারা চলে যাওয়ার পরে অল্প দিনের মধ্যে খুব একটা বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে এসেছি। এটা বিপ্লবটাকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে দেখতে গেলে এটা যত বড় উৎকট আকার ধারণ করে, জীবনের সমগ্রের সঙ্গে মিলে মিশে এটা তত প্রচণ্ড নয়। যে-ব্যাপারটা কল্পনায় নিতাসুই দারুণ এবং অসঙ্গত বোধ হয় সেটাও ঘটনায় এমন ভাবে আপনার স্থান গ্রহণ করে যেন তার মধ্যে অপ্রত্যাশিত কিছুই নেই। সেই জন্মে সমস্ত আঘাত কাটিয়ে, জীবনযাত্রা যেমন চলছিল তেমনিই চলেছে ;— হয়ত একটা কিছু পরিবর্তন ঘটেছে— কিন্তু সে পরিবর্তন উপর থেকে দেখা যায় না— সে পরিবর্তন নিজের চোখেও হয়ত সম্পূর্ণভাবে লক্ষ্যগোচর হতে পারে না।

ভেবেছিলুম ছুটি নেব কিন্তু আমার কাজের ভার আরো বেড়ে গেছে। আমি সম্প্রতি পল্লীসমাজ নিয়ে পড়েছি। আমাদের জমিদারীর মধ্যে পল্লীগঠনকার্যের দৃষ্টান্ত দেখাব বলে স্থির করেছি। কাজ আরম্ভ করে দিয়েছি। কয়েক জন পূর্ববঙ্গের ছেলে আমার কাছে ধরা দিয়েছে। তারা

পল্লীর মধ্যে থেকে সেখানকার লোকদের সঙ্গে বাস করে
 তাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য বিচার প্রভৃতি সকল কাজের ব্যবস্থা
 তাদের নিজেদের দিয়ে করাবার চেষ্টা কবচে। তাদের দিয়ে
 রাস্তাঘাট বাঁধানো, পুকুর খোঁড়ানো, ড্রেন কাটানো, জঙ্গল
 সাফ করানো, প্রভৃতি সমস্ত কাজের উদ্যোগ হচ্ছে। আমাদের
 পল্লীর ভিতরে সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করে এমন সুগভীর নিরুদ্ভম,
 যে, সে দেখলে স্বরাজ্য স্বাভাব্য প্রভৃতি কথাকে পরিহাস বলে
 মনে হয়— ও সকল কথা মুখে উচ্চারণ করতে লজ্জা বোধ হয়।
 কিন্তু যাঁরা সবচেয়ে উচ্চৈঃস্বরে একেবাবেই সপ্তমে গলা চড়িয়ে
 এই সকল শব্দ ঘোষণা করেন তাঁরাই এই বিষয়টাকে সকলের
 চেয়ে নিশ্চেষ্ট। সুরেন্দ্রবাবুবা পল্লীসমাজ গঠনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত
 হয়েছেন— তাঁরা কলকাতায় ৯ নম্বর ওয়ার্ডে কাজ আরম্ভ করে
 দিয়েছেন— পল্লীগ্রামেও লাগবেন বলে আশা দিয়েছেন।
 কিন্তু চরমপন্থীরা কেবল চব্বমেব কথাই ভাবেন, উপস্থিত
 কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁরা একেবাবেই নিশ্চেষ্ট। এ পর্য্যন্ত এঁদের
 দ্বারা একটি অতি ক্ষুদ্র কাজও হয় নি। অথচ এঁরাই মডার্নেট
 দলকে কস্মহীন বাক্যবিশারদ বলে গাল দিয়ে এসেছেন।
 এঁরা কেবলই কথা নিয়ে কলহ করছেন কাজেই আমার মত
 জরাজীর্ণকেও কাজের ক্ষেত্রে নাবতে হয়েছে। আমি সভা-
 স্থলের আহ্বানে আর সাড়া দিচ্ছি নে— কিন্তু সেট ডায়েটে
 দেশের যেটা সকলের চেয়ে প্রয়োজন সেটা সাধনের জগ্যে
 আমার যেটুকু সাধ্য তা প্রয়োগ করতেই হবে। আপনারা

যখন ফিরে আসবেন— আশা করছি তত দিনে আমাদের শিলাইদহের গ্রামগুলি অনেকটা গঠিত হয়ে উঠতে পারবে।

আপনি লগুনে যেভাবে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করতে চান সেইটেই আপাতত অবলম্বনীয়। এমনি করে পর্যায়ক্রমে এক এক জনের বাড়িতে উপাসনাকার্য হতে হতে এর পরে স্বতন্ত্র গৃহনির্মাণ করা সম্ভবপর হবে। ওখানে যে উপাসনা-প্রণালী গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে অস্তুত গুটি দুই তিন উপনিষদের মন্ত্র রাখবেন— ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মের সম্বন্ধটা সে দেশে এই রকম করে বিশেষ ভাবেই স্বীকার করা চাই। এতে ভারতবাসী প্রবাসীরও উপকার হবে, আর সে দেশের লোকের কাছেও ব্যাপারটা আক্রেয় ও মনোহর হবে। আমাদের ব্রাহ্মধর্ম আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব।

আমরা সবাই কলকাতায় ফিরে এসেছি। এদিকে নিদারুণ গ্রীষ্মে বিছালয়ও বন্ধ করতে হ'ল— আবার কোথায় পালান তাই ভাবছি— কলকাতায় বাস করা অসম্ভব।

আপনাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রিয়বরাসু

মৃত্যুর দ্বার থেকে সেদিন ফিরে এসেছি— তার সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেছে, মনে কোনো আশঙ্কা নেই। শেষযাত্রারও দেরি নেই তা জানি। দুঃখ তাদেরই যারা পিছনে পড়ে থাকে। বাইরের কোনো সাঙ্ঘনাবাক্যেই তাদের বিচ্ছেদের অভাব লেশমাত্র পূরণ করতে পারে না। যে অসামান্য নিষ্ঠা ও সতর্কতার সঙ্গে আপনি তাঁর সেবা করেছেন তারই মহৎ আপনার অবশিষ্ট জীবনকে মূল্যবান করবে, আপনার জীবনের অসামান্য অভিজ্ঞতা আপনার শোককে মহোচ্চতা দেবে এ ছাড়া আর কিছু বলবার নেই। ইতি ২৪।১১। [১৯]৩৭

আপনাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিশিষ্ট

- ১ অগদীশচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কবিতা
- ২ রবীন্দ্রনাথের নিবন্ধ
- ৩ রবীন্দ্রনাথের পত্র
- ৪ রবীন্দ্র-অগদীশ-প্রশ্নোত্তর
- ৫ অগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে অস্ফাল্ট পত্র

সত্যের মন্দিরে তুমি যে দীপ জ্বালিলে অনির্বাণ
তোমার দেবতা সাথে তোমারে করিল দীপ্যমান ।

‘কথা’র উৎসর্গ

সত্যরত্ন তুমি দিলে,— পরিবর্তে তার
কথা ও কল্পনাগাত্র দিচ্ছ উপহার ।

শিলাইসহ
অগ্রহায়ণ ১৩০৬

জগদীশচন্দ্র বসু

ভারতের কোন্ বৃক্ষ ঋষির তরুণ মৃতি তুমি
হে আশা আশা জগদীশ ? কি অদৃশ্য তপোভূমি
বিরচিলে এ পাষণ নগরীর শুষ্ক ধূলিতলে ?
কোথা পেলো সেই শাস্তি এ উন্নত জনকোলাহলে
যার তলে মগ্ন হয়ে মূর্ত্তে বিশ্বের কেন্দ্রমাঝে
দাড়াইলে একা তুমি— এক যেথা একাকী বিরাজে
সূর্য্যচন্দ্র-পুষ্পপত্র-পশুপক্ষি-ধূলায় প্রসূরে,—
এক তন্দ্রাহীন প্রাণ নিত্য যেথা নিছ অক'পরে
দুলাইছে চরাচর নিঃশব্দ সঙ্গীতে ! মোরা যবে
মত্ত ছিলাম অতীতের অতিদূর নিফল গৌরবে,
পরবশে, পরবাক্যে, পরভঙ্গিমার বাহুরূপে
কল্লোল করিতেছিলাম ফৌতকণ্ঠে ক্ষুধ অক্ষরূপে—
তুমি ছিলে কোন্ দূরে ? আপনাব শূন্য দ্যানাসন
কোথায় পাতিয়াছিলে ? সংযত গম্ভীর করি' মন
ছিলে রত তপস্রায় অরূপরশ্মির অস্মরণে
লোক-লোকেশ্বরের অমুরালে,— যেথা পূর্ন ঋষিগণে
বভ্রদের সিংহদ্বার উদ্গাটিয়া একের সাক্ষাতে
দাঁড়াতেন বাক্যহীন স্তম্ভিত বিস্মিত ছোডহাতে ।
হে তপস্বী, ডাক তুমি সাময়্যে জলদগর্জনে
“উত্তীর্ণত ! নিবোধত !” ডাক শাস্ত্র-অভিমানী জনে
পাণ্ডিত্যের পণ্ডতর্ক হতে । স্রবহং বিশ্বতলে
ডাক মূঢ় দৃষ্টিকেরে ! ডাক দাঁড় তব শিখাদলে—

একত্রে দাঁড়াক্ তারা তব হোম-হুতাগ্নি ঘিরিয়া !
আরবার এ ভারত আপনাতে আস্থক ফিরিয়া
নিষ্ঠায়, শ্রদ্ধায়, ধ্যানে,— বস্থক্ সে অপ্রমত্ত চিতে
লোভহীন দ্বন্দ্বহীন শুদ্ধ শাস্ত গুরুর বেদীতে !

[১০৮]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

श्रीगणेशाय नमः तस्यै तूष्णिं कृत्वा
प्रणमामासा अक्षयम् ।

वदन्त्या शतं ~~श्लोकानि~~ ^{श्लोकानि} वाणि ।
आश्लिष्य निवृत्त अपमानं धमनी
तूष्णिं तस्यै अस्मिन् कामाद्यु तूष्णिप
वक्ष्यामि विम्वरम् ।

शिवशक्तिं च्छालात्पुं तूष्णि
न नर आलोकात्मिका
आमाद्यु अकल आकाश लीलाद्यु
दिल उद्युत्त शक्ति ।

अवशिष्टात्ति त्रु क्षयव्य
दिते त्वे अस्मिन् अकलं क्षय
धूमं दीप्यत पर अस्मिन् आमाद्यु
आमाद्यु नर वीर्ये क्षय

সম্বর্ধনা-সঙ্গীত

জয় তব হোক জয় !
স্বদেশের গলে দাও তুমি তুলে
ষশোমালা অক্ষয় !
বহুদিন হতে ভারতের বাণী
আছিল নীরবে অপমান মানি'
তুমি তারে আঞ্জি জাগায়ে তুলিয়া
রটালে বিশ্বময় ।

জ্ঞানমন্দিরে জ্বালায়েছ তুমি
যে নব আলোকশিখা,
তোমার সকল ভ্রাতার ললাটে
দিল উজ্জ্বল টীকা ।
অবারিতগতি তব জয়রথ
ফিরে যেন আঞ্জি সকল স্রগৎ ।
দুঃখ দীনতা যা' আছে মোদের
তোমাতে বাধি না রয় ।

[মাঘ
১৩০৯]

অনুষ্ঠানপত্রের পাঠ । পাতুলিপি-চিত্র স্রষ্টব্য

‘বেয়া’র উৎসর্গ

বন্ধু, এ যে আমার লজ্জাবতী লতা ।
কি পেয়েছে আকাশ হতে,
কি এসেছে বায়ুর স্রোতে,
পাতার ভাঁজে লুকিয়ে আছে
সে যে প্রাণের কথা ।
ষড়ভরে খুঁজে খুঁজে
তোমায় নিতে হবে বুকে,
ভেঙে দিতে হবে যে তার
নীরব ব্যাকুলতা ।
আমার লজ্জাবতী লতা ।

বন্ধু, সন্ধ্যা এল, স্বপনভরা
পবন এরে চুম্বে ।
ডালগুলি সব পাতা নিয়ে
অড়িয়ে এল ঘুম্বে ।
ফুলগুলি সব নীল নয়ানে
চুপি চুপি আকাশপানে
তারার দিকে চেয়ে চেয়ে
কোন্‌ খেয়ানে রতা !
আমার লজ্জাবতী লতা ।

বন্ধু, আনো তোমার তড়িৎ পরশ,
 হরষ দিয়ে দাও,—
 করুণ চক্ষু মেলে ইহার
 মর্মপানে চাও ।
 সারাদিনের গঙ্গগীতি,
 সারাদিনের আলোর স্বতি
 নিয়ে এষে হৃদয়ভারে
 ধরায় অবনতা ।
 আমার লজ্জাবতী মতা ।

বন্ধু, তুমি জান ক্ষুদ্র বাহা
 ক্ষুদ্র তাহা নয় ;—
 সত্য সেথা কিছু আছে
 বিশ্ব সেথা রয় ।
 এই যে মুদে আছে লাজে
 পড়বে তুমি এরি মাঝে
 জীবন মৃত্যু যৌত্রছায়া
 ঝটিকার বারতা ।
 আমার লজ্জাবতী মতা ।

কলিকাতা
 ১৮ আষাঢ় ১৩১৩

আধুনিক ভারতবর্ষে ঠাঁহারা মাঝে মাঝে এই আশার আলোক জালিয়া তুলিতেছেন ঠাঁহারা যদিবা আমাদের সূর্য্যচক্র নাও হন তথাপি আমাদের স্বদেশের অন্ধ রজনীতে ঠাঁহারা এক মহিমাশিত ভবিষ্যতের দিকে আমাদের পথ দেখাইয়া জাগিতেছেন। সম্ভবতঃ সেই ভবিষ্যতের আলোকে ঠাঁহাদের ক্ষুদ্র রশ্মিটুকু একদিন স্নান হইয়া যাইতে পারে কিন্তু তথাপি ঠাঁহারা ধন্য।

ভারতবর্ষ আজ পৃথিবীর সমাজ্যাত। তাহাকে আবার সমাজে উঠিতে হইবে। কোন একসূত্রে পৃথিবীর সহিত তাহার আদানপ্রদান আবার সমানভাবে চলিবে, এ আশা আমরা কিছুতেই ছাড়িতে পারি না। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আমরা কবে ফিবিয়া পাইব এবং কখনও ফিবিয়া পাইব কিনা সে কথা আলোচনা করা বৃথা। কিন্তু নিজের ক্ষমতায় জগতের প্রতিভারাজ্যে আমরা স্বাধীন আসন লাভ করিব এ আশা কখনই পরিত্যাগ করিবার নহে।

রাজ্যবিস্তারমদোকৃত ইংলণ্ড আজকাল উষ্ণমণ্ডলদেশী জাতিমাত্রকে আপনাদের গোষ্ঠের গুরু মত দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সমস্ত এশিয়া এবং আফ্রিকা ঠাঁহাদের ভারবহন এবং ঠাঁহাদের দুষ্ক খোঁগাইবার জন্ত আছে, কিড্ প্রভৃতি আধুনিক লেখকগণ ইহা স্বতঃসিদ্ধসত্যরূপে পরিয়া লইয়াছেন।

অন্য আমাদের হীনতার অবধি নাই একথা মত্ব কিন্তু উষ্ণমণ্ডলভূক্ত ভারতবর্ষ চিরকাল পৃথিবীর মজুরী করিয়া আসে নাই। ইজিপ্ট, বাবিলন্, কাল্দিয়া, ভারতবর্ষ, গ্রীস এবং রোম ইহারাষ্ট জগত সভ্যতার

শিখা স্বহস্তে জ্বালাইয়াছিলেন, ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ট্রপিক্সের
 অস্তর্গত, উষ্ণ সূর্যের করাদীন। সেই পুরাতন কালচক্র পৃথিবীর
 পূর্কপ্রান্তে পুনর্কার কেমন করিয়া ফিরিয়া আসিবে তাহা ষ্ট্যাটিষ্টিক্স
 এবং তর্কদ্বারা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য, কারণ বড় বড় জাতির উন্নতি ও
 অধোগতি বিধির বিচিত্র বিধানে ঘটিয়া থাকে, তর্কিকের তর্কশৃঙ্খল
 তাহার সমস্ত মাপিয়া উঠিতে পারে না; তাহার কম্পাসের অর্ধাংশ
 মাত্রের ভুল বিশাল কালপ্রান্তরে ক্রমশই বাড়িতে বাড়িতে সত্য হইতে
 বহু দূরে গিয়া বিক্ষিপ্ত হয়।

প্রসঙ্গক্রমে এই অবাস্তব কথা মনের আক্ষেপে আপনি উঠিয়া পড়ে।
 কারণ, যখন দেখিতে পাই ক্ষুধিত যুরোপ ঘরে বসিয়া সমস্ত উষ্ণভূতাকে
 অংশ করিয়া লইবার জন্ত খড়ি দিয়া চিহ্নিত করিতেছেন তখন নিজেদিগকে
 সম্পূর্ণ মৃতপদার্থ বলিয়া শঙ্কা হয়, তখন নিজেদের প্রতি নৈরাশ্র এবং
 অবজ্ঞা অস্তঃকরণকে অভিভূত করিতে উচ্চত হয়।

ঠিক এইরূপ সময়ে জগদীশ বহুর মত দৃষ্টান্ত আমাদেরকে পুনর্কার
 আশার পথ দেখাইয়া দেয়। জগদীশ বহু জগতের রহস্যাকার-মধ্যে
 বিজ্ঞানরশ্মিকে কতটুকু অগ্রসর করিয়াছেন তাহা আমাদের মধ্যে
 অধিকাংশ লোকই ঠিকমত জানি না এবং জানিবার শক্তি রাখি না,
 কিন্তু সেই সূত্রে আশা এবং গৌরবের উৎসাহে আমাদের ক্ষমতা
 অনেকখানি বাড়াইয়া দিয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

[১৩০৫]

আচার্য্য জগদীশের জয়বার্তা

নিজের প্রতি শ্রদ্ধা মনের মাংসপেশী। তাহা মনকে উৎক্রে পাড়া করিয়া রাখে এবং কর্মের প্রতি চালনা করে। যে জাতি নিজের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইতে বসে, সে চলৎশক্তিরহিত হইয়া পড়ে।

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার অভাব ভারতবাসীর পক্ষে গুরুতর অভাব নহে ; কারণ, ভারতবর্ষে রাষ্ট্রতন্ত্র তেমন ব্যাপক ও প্রাণবৎ ছিল না। মুসলমানের আমলে আমরা রাজ্য-ব্যাপারে স্বাধীন ছিলাম না, কিন্তু নিজের ধর্মকর্ম, বিদ্যাবুদ্ধি ও সর্বপ্রকার ক্ষমতায় প্রতি অশ্রদ্ধা ক্রিয়বার কোন কারণ ঘটে নাই।

ইংরাজের আমলে আমাদের সেই আত্মশ্রদ্ধার উপরে ঘা লাগিয়াছে। আমরা সুখে আছি, স্বচ্ছন্দে আছি, নিরাপদে আছি, কিন্তু আমরা সকল বিষয়েই অযোগ্য, এই ধারণা বাহির হইতে ও ভিতর হইতে আমাদের আক্রমণ করিতেছে। এমন আত্মঘাতীধারণা আমাদের পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না।

নিজের প্রতি এই শ্রদ্ধা রক্ষার জন্য আমাদের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে একটা লড়াই চলিতেছে। ইহা আত্মরক্ষার লড়াই। আমাদের সমস্তই ভাল, ইহাই আমরা প্রাণপণে ঘোষণা করিবার চেষ্টা করিতেছি। এই চেষ্টার মধ্যে যেটুকু সত্য আশ্রয় করিয়াছে, তাহা আমাদের মঙ্গলকর, যেটুকু অন্ধভাবে অহঙ্কারকে প্রশ্রয় দিতেছে, তাহাতে আমাদের ভাল হইবে না। জীর্ণবস্তুরকে ছিদ্রহীন বলিয়া বিশ্বাস করিবার জন্য যতক্ষণ চক্ষু বুদ্ধিয়া থাকিব, ততক্ষণ শেলাই করিতে বসিলে কাঞ্চে লাগে।

আমরা ভাল, এ কথা রটনা করিবার লোক যথেষ্ট জুটিয়াছে। এখন এমন লোক চাই, যিনি প্রমাণ করিবেন, আমরা বড়। আচার্য্য জগদীশ

বহুৰ দ্বাৰা ঈশ্বৰ আমাদেৱ সেই অভাব পূৰণ কৰিয়াছেন। আজ
আমাদেৱ ষধাৰ্থ গৌৰৱ কৰিবাব দিন আসিয়াছে,— লক্ষিত ভাৱতকে
যিনি সেই সূদিন দিয়াছেন, তাঁহাকে সমস্ত অস্তঃকৰণেৰ সহিত প্ৰণাম
কৰি।

আমাদেৱ আচাৰ্যেৰ জয়বাৰ্ত্তা এখনো ভাৱতবৰ্ষে আসিয়া পৌছে
নাই, য়ুৰোপেও তাঁহাৰ জয়ধ্বনি সম্পূৰ্ণ প্ৰচাৰ হইতে এখনো কিঞ্চিৎ
বিসম্ব আছে। যে সকল বৃহৎ আবিষ্কাৰে বিজ্ঞানকে নূতন কৰিয়া আপন
ভিত্তি স্থাপন কৰিতে বাধ্য কৰে, তাহা একদিনেই গ্ৰাহ হয় না। প্ৰথমে
চাৰিত্ৰিক হইতে যে বিৰোধ জাগিয়া উঠে, তাহাকে নিবস্ত কৰিতে সময়
লাগে; সত্যকেও সুদীৰ্ঘকাল লড়াই কৰিয়া আপনাৰ সত্যতা প্ৰমাণ
কৰিতে হয়।

আমাদেৱ দেশে দৰ্শন যে পথে গিয়াছিল, য়ুৰোপে বিজ্ঞান সেই পথে
চলিতেছে। তাহা ঐক্যেৰ পথ। বিজ্ঞান এ পৰ্য্যন্ত এই ঐক্যেৰ পথে
গুৰুতৰ যে কয়েকটি বাধা পাইয়াছে, তাহাৰ মধ্য জড় ও জীবেৰ প্ৰভেদ
একটি। অনেক অমুসন্ধান ও পৰীক্ষায় হক্‌সুলি প্ৰভৃতি পণ্ডিতগণ এই
প্ৰভেদ লঙ্ঘন কৰিতে পাবেন নাই। জীৱতত্ত্ব এই প্ৰভেদেৰ দোহাই
দিয়া পদাৰ্থতত্ত্ব হইতে বহুদূৰে আপন স্বাতন্ত্ৰ্য ৰক্ষা কৰিতেছে।

আচাৰ্য্য জগদীশ জড় ও জীবেৰ ঐক্যসেতু বিদ্যাতেৰ আলোকে
আবিষ্কাৰ কৰিয়াছেন। আচাৰ্য্যকে কোন কোন জীৱতত্ত্ববিদ্ বলিয়া-
ছিলেন, আপনি ত ধাতৱ-পদাৰ্থেৰ কণা লইয়া এতদিন পৰীক্ষা কৰিয়া
আসিতেছেন, কিন্তু যদি আস্ত একখণ্ড ধাতুপদাৰ্থকে চিম্টি কাটিয়া
তাহাৰ মধ্য হইতে এমন কোন লক্ষণ বাহিৰ কৰিতে পাবেন, জীৱ-
শৰীৰে চিম্টিৰ সহিত যাহাৰ কোন সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তবে আমবা
বুঝি।

জগদীশবাবু ইহার উত্তর দিবার জন্য এক নূতন কল বাহির করিয়াছেন। জড়বস্তুকে চিম্টি কাটিলে যে স্পন্দন উৎপন্ন হয়, এই কলের সাহায্যে তাহার পরিমাণ স্বত লিখিত হইয়া থাকে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমাদের শরীরে চিম্টির ফলে যে স্পন্দনবেধা পাওয়া যায়, তাহার সহিত এই লেখার কোন প্রভেদ নাই।

জীবনের স্পন্দন ষেরূপ নাড়ীদ্বারা বোঝা যায়, সেইরূপ জড়েরও জীবন শক্তির নাড়ীস্পন্দন এই কলে লিখিত হয়। জড়ের উপর বিষ-প্রয়োগ করিলে তাহার স্পন্দন কিরূপে বিলুপ্ত হইয়া আসে, এই কলের দ্বারা তাহা চিত্রিত হইয়াছে।

বিগত ১০ই মে তারিখে আচার্য জগদীশ রায়াল ইন্সটিটিউশনে বক্তৃতা করিতে আহূত হইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল— যান্ত্রিক ও ও বৈদ্যুতিক তাড়নায় জড়পদার্থের সাড়া (The response of inorganic matter to mechanical and electrical stimulus)। এই সভায় ঘটনাক্রমে লর্ড রেলি উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই, কিন্তু প্রিন্স ক্রপটকিন্ এবং বৈজ্ঞানিক সমাজের প্রতিষ্ঠাবান্ লোকেরা অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

এই সভায় উপস্থিত কোন বিদ্বান্ ইংরাজ মহিলা, সভার যে বিবরণ আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন, নিম্নে তাহা হইতে স্থানে স্থানে অঙ্কবাদ করিয়া দিলাম।

সন্ধ্যা নয়টা বাজিলে দ্বার উন্মুক্ত হইল এবং বহু-জায়াকে লইয়া সভাপতি সভায় প্রবেশ করিলেন। সমস্ত শ্রোতৃমণ্ডলী অধ্যাপকপত্নীকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল। তিনি অবগুণ্ঠনাবৃত্তা এবং শাড়ী ও ভারতবর্ষীয় অলঙ্কারে সুশোভনা। তাঁহাদের পশ্চাতে যশস্বী লোকের দল, এবং সর্ব-পশ্চাতে আচার্য বহু নিজে। তিনি শান্ত নেত্রে একবার সমস্ত সভার

প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং অতি স্বচ্ছন্দ সমাহিত ভাবে বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন ।

তাঁহার পশ্চাতে রেখাকন-চিত্রিত বড় বড় পট টাঙান রহিয়াছে । তাহাতে বিষপ্রয়োগে, শ্রান্তির অবস্থায়, ধমুটেকার প্রভৃতি আক্ষেপে, উত্তাপের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় স্নায়ু ও পেশীর এবং তাহার সহিত তুলনীয় ধাতুপদার্থের স্পন্দনরেখা অঙ্কিত রহিয়াছে । তাঁহার সম্মুখের টেবিলে যন্ত্রোপকরণ সজ্জিত ।

তুমি জ্ঞান, আচার্য্য বসু বাগী নহেন । বাক্যরচনা তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্য নহে ; এবং তাঁহার বলিবার ধরণও আবেগে ও সাধ্বসে পূর্ণ । কিন্তু সে রাত্রে তাঁহার বাক্যের বাধা কোথায় অস্তধান করিল । এত সহজে তাঁহাকে বলিতে আমি শুনি নাই । মাঝে মাঝে তাঁহার পদবিন্যাস গাঙ্গীযো ও সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল,— এবং মাঝে মাঝে তিনি সহাস্তে সুনিপুণ পরিহাস-সহকাবে অত্যন্ত উজ্জ্বল সরলভাবে বৈজ্ঞানিকবাহের মধ্যে অগ্নের পর অগ্নি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । তিনি রসায়ন, পদার্থতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাপ্রশাখার ভেদ অত্যন্ত সহজ উপহাসেই যেন মিটাইয়া দিলেন ।

তাঁহার পরে, বিজ্ঞানশাস্ত্রে জীব ও অজীবের মধ্যে যে সকল ভেদ-নিরূপক-সংজ্ঞা ছিল, তাহা তিনি মাকডসার জালের মত ঝাড়িয়া ফেলিলেন । যাহার মৃত্যু সম্ভব, তাহাকেই ত জীবিত বলে,— অধ্যাপক বসু একধণ্ড টিনের মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে দাঁড় করাইয়া আমাদেরকে তাঁহার মরণাক্ষেপ দেখাইতে প্রস্তুত আছেন, এবং বিষপ্রয়োগে যখন তাঁহার অস্তিম দশা উপস্থিত, তখন ঔষধপ্রয়োগে পুনশ্চ তাহাকে সুস্থ করিয়া তুলিতে পারেন ।

অবশেষে অধ্যাপক যখন তাঁহার স্বনির্মিত কৃত্রিম চক্ষু সভার সম্মুখে

উপস্থিত করিলেন এবং দেখাইলেন, আমাদের চক্ষু অপেক্ষা তাহার শক্তি অধিক, তখন সকলের বিশ্বাসের অস্তুরাহিল না।

ভারতবর্ষ যুগে যুগে যে মহৎ ঐক্য অকুণ্ঠিত চিত্তে ঘোষণা করিয়া আসিয়াছে, আজ যখন সেই ঐক্যসংবাদ আধুনিক কালের ভাষায় উচ্চারিত হইল, তখন আমাদের কিরূপ পুলকসঞ্চার হইল, তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। মনে হইল, যেন বক্তা নিজের নিজস্ব-আবরণ পরিত্যাগ করিলেন, যেন তিনি অন্ধকারের মতো অস্বস্তিত হইলেন,— কেবল তাঁহার দেশ এবং তাঁহার জাতি আমাদের সম্মুখে উদ্ভিত হইল,— এবং বক্তার নিম্নলিখিত উপসংহারভাগ যেন সেই তাহারই উক্তি!

I have shown you this evening the autographic records of the history of stress and strain in both the living and non-living. How similar are the two sets of writings, so similar indeed that you cannot tell them one from the other! They show you the waxing and waning pulsations of life—the climax due to stimulants, the gradual decline of fatigue, the rapid setting in of death-rigor from the toxic effect of poison.

It was when I came on this mute witness of life and saw an all-pervading unity that binds together all things—the mote that thrills on ripples of light, the teeming life on earth and the radiant suns that shine on it—it was then that for the first time I understood the message proclaimed by my ancestors on the banks of the Ganges thirty centuries ago—

“They who behold the One, in all the changing manifoldness of the universe, unto them belongs eternal truth, unto none else, unto none else.”

বৈজ্ঞানিকদের মনে উৎসাহ ও সমাজের অগ্রগীদের মধ্যে শ্রদ্ধা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সভাস্থ দুই একজন সর্বশ্রেষ্ঠ মনোবী ধীরে ধীরে আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার উচ্চারিত বচনের স্নান ভক্তি ও বিশ্বয় স্বীকার করিলেন।

আমরা অশুভব করিলাম যে, এতদিন পরে ভারতবর্ষ— শিষ্ণু-ভাবেও নহে, সমকক্ষভাবেও নহে, গুরুভাবে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকসভায় উথিত হইয়া আপনার জ্ঞানশ্রেষ্ঠতা সপ্রমাণ করিল,— পদার্থতত্ত্ব-সঙ্গী ও ব্রহ্মজ্ঞানীর মধ্যে যে প্রভেদ, তাহা পরিষ্কৃত করিয়া দিল।

লেখিকার পত্র হইতে সভার বিবরণ যাহা উদ্ধৃত করিলাম, তাহা পাঠ করিয়া আমরা অহঙ্কার বোধ করি নাই। আমরা উপনিষদের দেবতাকে নমস্কার করিলাম ; ভারতবর্ষের যে পুরাতন ঋষিগণ বলিয়াছেন “যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজ্জতি” এই যাহা কিছু সমস্ত জগৎ প্রাণেই কম্পিত হইতেছে, সেই ঋষিমণ্ডলীকে অন্তরে উপলক্ষি করিয়া বলিলাম, হে জগদ্গুরুগণ, তোমাদের বাণী এখনও নিঃশেষিত হয় নাই, তোমাদের ভাস্মাচ্ছন্ন হোমহুতাশন এখনো অনির্কীর্ণ রহিয়াছে, এখনো তোমরা ভারতবর্ষের অস্তঃকরণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া বাস করিতেছ ! তোমরা আমাদিগকে ধ্বংস হইতে দিবে না, আমাদিগকে কৃতার্থতার পথে লইয়া যাইবে। তোমাদের মহত্ব আমরা যেন যথার্থভাবে বুঝিতে পারি। সে মহত্ব অতিক্ষুদ্র আচারবিচারের তুচ্ছ সীমার মধ্যে বদ্ধ নহে,— আমরা অণু যাহাকে “হিঁড়্যানি” বলি, তোমরা তাহা লইয়া তপোবনে বসিয়া কলহ করিতে না, সে সমস্তই পতিত ভারতবর্ষের আবজনা মাত্র ; — তোমরা যে অনন্তবিস্তৃত লোকে আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলে, সেই লোকে যদি আমরা চিত্তকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারি, তবে আমাদের জ্ঞানের দৃষ্টি গৃহপ্রাঙ্গণের মধ্যে প্রতিহত না হইয়া বিশ্বব্রহ্মের

অস্তরনিকেতনের মধ্যে প্রবেশ করিবে। তোমাদিগকে স্মরণ করিয়া যতক্ষণ আমাদের বিনয় না জন্মিয়া গর্কের উদয় হয়, কর্মের চেষ্টা জাগ্রত না হইয়া সন্তোষের জড় পুঞ্জীভূত হইতে থাকে, এবং ভবিষ্যতের প্রতি আমাদের উত্তম ধাবিত না হইয়া অতীতের মধ্যে সমস্ত চিত্ত আচ্ছন্ন হইয়া লোপ পায়, ততক্ষণ আমাদের মুক্তি নাই।

আচার্য্য জগদীশ আমাদিগকে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। তিনি বিজ্ঞান-রাজ্যে যে পথের সন্ধান পাইয়াছেন, সে পথ প্রাচীন ঋষিদিগের পথ— তাহা একের পথ। কি জ্ঞানে বিজ্ঞানে, কি ধম্মে কষ্মে, সেই পথ ব্যতীত “নাশ্চঃ পশ্চা বিজ্ঞতে অয়নায়।”

কিন্তু আচার্য্য জগদীশ যে কষ্মে হাত দিয়াছেন, তাহা শেষ করিতে তাঁহার বিলম্ব আছে। বাধাও বিস্তর। প্রথমত, আচার্য্যের নতন সিদ্ধান্ত ও পরীক্ষার দ্বারা অনেকগুলি পেটেন্ট অক্ষয়্য হইয়া যাউবে এবং একদল বণিকসম্প্রদায় তাঁহার প্রতিকূল হইবে। দ্বিতীয়ত, জীবনতত্ত্ববিদগণ জীবনকে একটা স্বতন্ত্র শ্রেষ্ঠ ব্যাপার বলিয়া জানেন, তাহাদের বিজ্ঞান যে কেবলমাত্র পদার্থতত্ত্ব, এ কথা তাঁহারা কোনমতেই স্বীকার করিতে চাহেন না। তৃতীয়ত, কোন কোন মূঢ় লোকে মনে করেন যে, বিজ্ঞান-দ্বারা জীবনতত্ত্ব বাহির হইলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিবার প্রয়োজন থাকে না, তাঁহারা পুলকিত হইয়াছেন। তাহাদের ভাবগতিক দেখিয়া শৃষ্টান্ বৈজ্ঞানিকেরা তটস্থ, এক্ষণে অধ্যাপক কোন কোন বৈজ্ঞানিকের সহায়ত্ব হইতে বঞ্চিত হইবেন। সুতরাং একাকী তাঁহাকে অনেক বিপদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে।

তবে, বাহারা নিরপেক্ষ বিচারের অনিকারী, তাহারা উল্লসিত হইয়াছেন। তাহারা বলেন, এমন ঘটনা হইয়াছে যে, যে সিদ্ধান্তকে রয়াল সোসাইটি প্রথমে অবৈজ্ঞানিক বলিয়া পরিহার করিয়াছিল, এখন

বিশ বৎসর পরে পুনরায় তাঁহারা আদরের সহিত তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। আচার্য্য জগদীশ যে মহৎ তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক-সমাজে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহার পরিণাম বহুদূরগামী। এক্ষণে আচার্য্যকে এই তত্ত্ব লইয়া সাহস ও নির্বন্ধের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, ইহাকে সাধারণের নিকট প্রতিষ্ঠিত করিয়া তবে তিনি বিশ্রাম করিতে পাইবেন। এ কাজ যিনি আরম্ভ করিয়াছেন, শেষ করা তাঁহারই সাধ্যাত্ত। ইহার ভার আর কেহ গ্রহণ করিতে পারিবে না। আচার্য্য জগদীশ বর্তমান অবস্থায় যদি ইহাকে অসম্পূর্ণ রাখিয়া যান, তবে ইহা নষ্ট হইবে।

কিন্তু তাঁহার ছুটি ফুরাইয়া আসিল। শীঘ্রই তাঁহাকে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপনাকার্য্যে যোগ দিতে আসিতে হইবে এবং তিনি তাঁহার অল্প কাজ বন্ধ করিতে বাধ্য হইবেন।

কেবল অবসরের অভাবকে তেমন ভয় করি না। এখানে সর্বপ্রকার অসুস্থতার অভাব। আচার্য্য জগদীশ কি করিতেছেন, আমরা তাহা ঠিক বুঝিতেও পারি না। এবং দুর্গতিপ্রাপ্ত স্রাতির স্বাভাবিক ক্ষুদ্রতা-বশত আমরা বড়কে বড় বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে পারি না, শ্রদ্ধা করিতে চাহি-ও না। আমাদের শিক্ষা, সামর্থ্য, অধিকার যেমনই থাক, আমাদের স্পর্কার অস্ত নাই। ঈশ্বর যে সকল মহাত্মাকে এ দেশে কাজ করিতে পাঠান, তাহারা যেন বাংলা গবর্নমেন্টের নোয়াখালি-জেলায় কার্য্যভার প্রাপ্ত হয়। সাহায্য নাই, শ্রদ্ধা নাই, প্রীতি নাই,— চিন্তের সঙ্গ নাই, স্বাস্থ্য নাই, জনশূন্য মরুভূমিও ইহা অপেক্ষা কাজের পক্ষে অসুস্থ স্থান ;— এই ত স্বদেশের লোক— এদেশীয় ইংরাজের কথা কিছু বলিতে চাহি না। এ ছাড়া যন্ত্র-গ্রন্থ, সর্বদা বিজ্ঞানের আলোচনা ও পরীক্ষা ভারতবর্ষে স্থলভ নহে।

আমরা অধ্যাপক বন্ধকে অসুস্থ করিতেছি, তিনি যেন তাঁহার কৰ্ম

সমাধা করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন ! আমাদের অপেক্ষা গুরুতর অন্ননয়
তাঁহার অস্তঃকরণের মধ্যে নিয়ত ধনিত হইতেছে, তাহা আমরা জানি ।
সে অন্ননয় সমস্ত কতি ও আত্মীয়বিচ্ছেদদুঃখ হইতেও বড় । তিনি
সম্প্রাত নিঃস্বার্থ জ্ঞানপ্রচারের জন্য তাঁহার দ্বারে আগত প্রচুর ঐশ্ব্য-
প্রলোভনকে অবজ্ঞাসহকারে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, সে সংবাদ আমরা
অবগত হইয়াছি, কিন্তু সে সংবাদ প্রকাশ করিবার অধিকার, আমাদের
আছে না আছে, বিধা করিয়া আমরা মৌন রহিলাম । অতএব এই
প্রলোভনহীন পণ্ডিত জ্ঞানস্পৃহাকেই সর্বোচ্চে রাখিয়া জানে, সাধনার,
কর্ম্মে, এই হতচারিত্র হতভাগ্য দেশের গুরু ও আদর্শস্থানীয় হইবেন,
ইহাই আমরা একান্তমনে কামনা করি ।

[১৩০৮]

জড় কি সজীব ?

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু গতবারে বিলাতে গিয়া বিজ্ঞানের যে নূতন তথ্য প্রচার করিয়া আসিয়াছিলেন, এতদিনে অল্পে অল্পে তাহার সংবাদ আমাদের নিকট পরিচিত হইয়া আসিতেছে। সেই আবিষ্কার ঈশ্বর-তত্ত্বকে অগ্রসর করিয়া দিয়া তারহীন টেলিগ্রাফস্বরের কার্যোপযোগিতা বাড়াইয়া দিয়াছে এবং বিজ্ঞানবিদগণের নিকট প্রচুর সম্মান লাভ করিয়াছে, এ খবর আমাদের কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

পুনর্বার আচার্য্যবর যুরোপের পণ্ডিতসভায় নবতর তত্ত্ব উপহার লইয়া প্রবেশ করিয়াছেন। ইহা শুনিয়াছি ব্যাপারটি অদ্ভুত। শুনিয়াছি জড় ও জীবের মধ্যে দুর্লভ্য বৈষম্য তিনি ভেদ করিয়া বিজ্ঞানিগণকে সচকিত করিয়া তুলিয়াছেন। আঘাত, উত্তেজনা প্রভৃতি দ্বারা ধাতুপদার্থ ও সজীবপদার্থে একই রূপ ফল উৎপন্ন হয়, ইহা পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষ দেখাইয়া তিনি জড়জীবের সাধর্ম্ম্য প্রমাণ করিয়াছেন।

সকল কথা আমরা এখনো স্পষ্ট করিয়া বিস্তারিতরূপে জানিতে পারি নাই। সভায় যাহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মনে কিরূপ ধারণা হইয়াছে, তাহা হইতেই বিষয়টার মোট কথা আমরা কতকটা অনুমান করিতেছি।

অবৈজ্ঞানিক শ্রোতারা কি বুঝিয়াছেন, তাহা ইংরাজি 'গ্লোব'পত্রের নিম্নলিখিত পরিহাসবাক্যে জানা যায়। গ্লোব বলেন, ধাতুপদার্থের উপর নানাবিধ অত্যাচার করিবার সময় অধ্যাপকের দুই চক্ষু অশ্রুজলে পূর্ণ হইয়াছিল। এ ক্ষণ্ত তাঁহাকে ধন্ত বলি। কিন্তু আগুন উস্কাইবার লৌহদণ্ড যখন চুলার লৌহবেষ্টনের উপর পড়িয়া যাইবে, তখন তাহার আঘাত লাগিয়াছে বলিয়া তাড়াতাড়ি তাহাকে তুলিয়া লইয়া আদর

করিতে বসিবে, বৃটিশ গৃহস্থর সে অবস্থা আসিতে বিলম্ব আছে ।

বৃটিশ গৃহস্থর চিত্ত জড় কি সজীব, কি পরিমাণ তাহার বেদনাবোধ, কতটা আঘাতে তাহার মাড়া পাওয়া যায়, সে দুর্ভাগ্য পরীক্ষায় অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন না, তিনি লোহা-পিতলকে আঘাত করিয়া মাড়া পাইয়াছেন । গ্লোবের উক্তিতে ইহা বুঝা যায় যে, অধ্যাপকের মতে জড়ের জীবনধর্ম আছে, অবৈজ্ঞানিক শ্রোতাদের মনে এইরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে ।

জীবমাত্রই যে সচেতন, এ কথা মনে আনিবার প্রয়োজন নাই । অস্তুত এখনো তাহার প্রমাণ হয় নাই । উদ্ভিদেব চেতনা আছে কিনা, কেহ বলিতে পারে না, কিন্তু তাহার জীবন আছে, এ কথা সকলেই জানে ।

লৌহদণ্ড পড়িয়া গেলে তাহার বেদনা বোধ হয়, এ কথা কেহ বলে না, কিন্তু সে যে আঘাত পায়, এ কথাও কেহ বলিত না । অর্থাৎ সজীব পদার্থ আছাড় পাইলে তাহাতে আঘাতের যেকোন লক্ষণ প্রকাশ পায়, দাতুপদার্থেও সেইরূপ লক্ষণ দেখা দেয়, ইহা জানা ছিল না । আচার্য্য জগদীশ পরীক্ষা দ্বারা তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন ।

মানবরূপ শ্রোতার কথা উপরে লিখিলাম । এক্ষণে বিজ্ঞানবিদ বিশেষজ্ঞ কি বলেন, তাহা আলোচনা করিলে বিষয়টার আভাস পাওয়া যাইবে । তড়িৎ-তরঙ্গ-সম্বন্ধে বিখ্যাত ইংরাজী পদ ইলেক্ট্রিশিয়ানে অধ্যাপক বসুর বক্তৃতায় যে মর্ম প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহারই মাত্র সংগ্রহ করিয়া দিতেছি ।

সজীব মাংসপেশীকে যদি চিম্টি কাটা যায় বা তাহাতে মোচড় বা চাপ দেওয়া যায়, তবে তাহা লম্বায় ছোট হইয়া চওড়ার নিকে ফুলিয়া উঠে । চাপ উঠাইয়া লইলে মাংসপেশী আবার প্রকৃষ্টি হয় । বিশেষ

যন্ত্রের দ্বারা মাংসপেশীর এই বিকৃতি ও প্রকৃতির উত্থান-পতন-রেখা আঁকিয়া লওয়া যায়। যদি মাংসপেশীতে থাকিয়া থাকিয়া চাপ পড়ে, তবে তাহার তরঙ্গরেখা (curve) করাতের মত দৃশ্য হইয়া অঙ্কিত হয়। যদি এই চাপ অত্যন্ত ঘন ঘন হইতে থাকে, তবে অবশেষে এমন একটি অবস্থা আসে, যখন মাংসপেশী নিরন্তর সঙ্কুচিত হইয়া ধলুঠকাবের আকৃতি উৎপন্ন করে।

অতিরিক্ত ঠাণ্ডা বা গরমে মাংসপেশী আড়ষ্ট হইয়া যায়, তখন আঘাতে তাহার সাড়া পাওয়া যায় না এবং প্রকৃতিস্থ হইতেও বিলম্ব ঘটে। আবার বিশেষ মাত্রার উত্তাপে মাংসপেশীর সাড় সর্বাপেক্ষা বাড়িয়া উঠে। এই উত্তাপের মাত্রা ভিন্ন মাংসপেশীর পক্ষে ভিন্ন রূপ।

দ্রব্যগুণে মাংসপেশীর সাড় বাড়ে কমে। উত্তেজক পদার্থে সাড় প্রবল হইয়া উঠে এবং প্রকৃতিস্থতাও শীঘ্র ফিরিয়া আনে। অবসাদক পদার্থে বিপরীত ফল হয় এবং বিশেষ এই সাড়-শক্তি একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। ইহাও দেখা গিয়াছে, কোন কোন দ্রব্য মাত্রাবিশেষে উত্তেজনা ও অন্ত-মাত্রায় অবসাদ আনয়ন করে।

সজীব মাংসপেশীকে ছাড়িয়া যদি সজীব স্নায়ুকে লইয়া পরীক্ষা করা যায়, তবে তাহাতেও এইরূপ পরে পরে সাড় ও প্রকৃতি-লাভ দেখা যায়। কিন্তু স্নায়ুতে এই সাড়ার প্রকাশ অন্যপ্রকার। ঘা লাগিলে স্নায়ুর আহত বা উত্তেজিত অংশ হইতে সুস্থ অংশ পর্যন্ত একটি বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। পুনঃপুন আঘাত, শীতাতপের মাত্রাধিক্য, এবং উত্তেজক বা অবসাদক দ্রব্যদ্বারা স্নায়ুতে যে ক্রিয়া ও ক্রিয়াশক্তি উপস্থিত হয়, যন্ত্রবিশেষের দ্বারা তাহার রেখাচিত্র লওয়া হইয়াছে। মাংসপেশীর চিত্রের সহিত তাহার সাদৃশ্য দেখা যায়। অধ্যাপক এইরূপ বিবিধ চিত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। দেহবিদগণ বলেন, দেহপদার্থের মধ্যে এই সাড়ই

জীবনের স্থম্পষ্ট লক্ষণ, মৃত পদার্থে ইহার সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হয় ।

এখন জড়পদার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক । অধ্যাপক বহু দেখাইয়াছেন, একটি তারের এক প্রান্তে যদি মোচড় বা ঘা দেওয়া যায়, তবে সেই আহত বা উত্তেজিত প্রান্ত হইতে প্রকৃতিস্থ প্রান্ত পর্যন্ত একটি বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন হয় । তড়িৎমাপক-সূচির বিচলন দ্বারা এই সাদের পরিমাণ ধরা পড়ে । যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া অধ্যাপক বহু দেখাইয়াছেন, জড়পদার্থের এই আঘাতজনিত সাদ ও প্রকৃতিলাভের তরঙ্গরেখার সহিত স্নায়ুমাংসপেশীর তরঙ্গরেখার অত্যন্ত সাদৃশ্য আছে ।

ধাতুপদার্থে ঘন ঘন তাড়না করিলে যে তরঙ্গরেখা পান্থা যায়, তাহা দস্তুর—সেই তাড়না আরো দ্রুত করিলে তরঙ্গরেখা নিরন্তর ক্ষীণ হইয়া ধনুষ্টিকারের অবস্থা প্রকাশ করে । শীতাতপের মাত্রা অধিক হইলে ধাতুপদার্থে আড়ষ্টতা জন্মে এবং বিশেষ উত্তাপে তাহার সাদশক্তি সর্বাপেক্ষা বিকাশ পায়,— ধাতুতারের মন্যে বিশেষ দ্রব্য প্রয়োগ করিলে তাহার সাদের প্রবলতা মদমত্ততার মত আশ্চর্য বাড়িয়া উঠে, আবার দ্রব্যবিশেষে অবসাদের লক্ষণ আনয়ন করে, আবার কোন কোন দ্রব্যে বিশেষ মত কাজ করে । কোন কোন দ্রব্য ধাতুপদার্থের পক্ষে বিশেষ মাত্রায় উত্তেজক এবং মাত্রাসূত্রে অবসাদক ; আবার ইহাও দেখা গিয়াছে, সময়মত ঔষধ দিতে পারিলে বিষপ্রয়োগের প্রতিকার করা যায় ।

এইরূপ নানা আঘাত-অপঘাতে ধাতুদ্রব্যে যে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, তাহার তরঙ্গচিত্র জৈবতরঙ্গের এতই সদৃশ যে, দেহবিদগণ উভয় চিত্রকে পৃথক করিয়া নির্দেশ করিতে পারেন না ।

এই গেল আঘাতজনিত সাদ । আলোকজনিত সাদ সম্বন্ধেও অধ্যাপক মহাশয় পরীক্ষা করিয়া সমকল পাইয়াছেন । তিনি একটি

কৃত্রিম চক্ষু নির্মাণ করিয়াছেন ; যে সকল রশ্মি সম্বন্ধে আমাদের চক্ষু অসাড়, তাঁহার কৃত্রিম চক্ষুতে সে সকল রশ্মিও সাড়া জাগাইয়া থাকে । আলো লাগিলে সম্ভব চক্ষু যেমন করিয়া মস্তিষ্কে বেগ প্রেরণ করে, এই কৃত্রিম চক্ষুর ক্রিয়া ঠিক সেইরূপ । সুতরাং এই আবিষ্কারের ফলে দর্শনক্রিয়া ব্যাপারটি দেহবিজ্ঞার কোঠা হইতে পদার্থ-বিজ্ঞার কোঠায় আসিয়া পড়িতে পারে । এই কৃত্রিম চক্ষুর আবিষ্কারে বর্তমান তারহীন টেলিগ্রাফী ও ঐশ্বরিক বাস্তাবহন-প্রণালী উলটপালট করিয়া দিবে ।

[১৩০৮]

এ কথা আমাদের কাছে মনে রাখিতে হইবে, এতকাল অনেক বিদেশী
অধ্যাপক আমাদের কলেজের পরীক্ষাশালায় যত্ন সহ লইয়া অনেক
নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই স্বাধীন-বুদ্ধি দেখাইয়া যশস্বী হইতে
পারেন নাই। বাঙালীর মধ্যেই জগদীশ ও প্রফুল্লচন্দ্র সুযোগলাভ
করিয়া সেই সুযোগের ফল দেখাইয়াছেন।

...এস্থলে আমাদের একমাত্র কর্তব্য, নিজেরা সচেষ্ট হওয়া, আমাদের
দেশে ডাক্তার জগদীশ বসু প্রভৃতির মতো যে সকল প্রতিভাসম্পন্ন
মনস্বী প্রতিকূলতার মধ্যে থাকিয়াও মাথা তুলিয়াছেন, তাঁহাদিগকে
মুক্তি দিয়া তাঁহাদের হস্তে দেশের ছেলদের মানুষ করিয়া তুলিবার
স্বাধীন অবকাশ দেওয়া ;— অবজ্ঞা-অশ্রদ্ধা-অনাদরের হাত হইতে বিদ্ধাকে
উদ্ধার করিয়া দেবী সরস্বতীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা, জ্ঞানশিক্ষাকে স্বদেশের
জিনিষ করিয়া দাঁড় করানো, আমাদের শক্তির সহিত, সাধনার সহিত,
প্রকৃতির সহিত তাহাকে অমৃতরসরূপে সংযুক্ত করিয়া তাহাকে স্বভাবের
নিয়মে পালন করিয়া তোলা।

[১৩১১]

আমাদের যাহা নাই, তাহার জন্য আমরা রাজস্বায়ে ধন্য দিয়া পড়ি এবং
টানার খাতা লইয়া গলদর্শন হইয়া বেড়াই— কিন্তু যাহা আছে, তাহাকে
কেমন করিয়া কাজে লাগাইতে হইবে, সে দিকে কি আমরা দৃষ্টিপাত
করিব না ?...

আমাদের দেশে অধ্যাপক জগদীশ, অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র দেশবিদেশে
যশোলাভ করিয়াছেন, বিজ্ঞানসভা কি তাঁহাদিগকে কাজে লাগাইবার
জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করিতেছেন ? ..

যদি জগদীশ ও প্রফুল্লচন্দ্রের শিক্ষাধীনে দেশের কয়েকটি অধ্যবসায়ী
ছাত্রকে মানুষ করিয়া তুলিবার ভার বিজ্ঞানসভা গ্রহণ করেন, তবে সভা
এবং দেশ উভয়েই ধন্য হইবেন ।

স্বদেশে বিজ্ঞানপ্রচার করিবার দ্বিতীয় সূচুপায়, স্বদেশের ভাষায়
বিজ্ঞান প্রচার করা । যতদিন পর্য্যন্ত না বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের বই বাহির
হইতে থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত বাংলাদেশের মাটির মদ্যো বিজ্ঞানের
শিকড় প্রবেশ করিতে পাবিবে না ।

[১৩১২]

পত্র-পরিচয়

তখন অল্প বয়স ছিল। সামনের জীবন ভোর বেলাকার মেঘের মত ; অস্পষ্ট কিন্তু নানা রঙে রঙীন। তখন মন রচনার আনন্দে পূর্ণ ; আয়-প্রকাশের স্রোত নানা বাক্যে বাক্যে আপনাতে আপনি বিস্তৃত হয়ে চলেছিল ; তীরের বাধ কোথাও ভাঙচে কোথাও গড়চে ; দ্বারা কোথায় গিয়ে মিশবে সেই সমাপ্তির চেহারা দূর থেকেও চোখে পড়েনি। নিজেই ভাগ্যের সৌম্যরেশমা তখনো অনেকটা অনিচ্ছিত আকারে ছিল বলেই নিত্য নতুন উদ্দীপনায় মন নিজের শক্তির নব নব পরীক্ষায় সর্বদা উৎসাহিত থাকত। তখনো নিজের পথ পাকা করে বাধা হয়নি, সেইজন্যে চলা আর পথ বাধা এই দুই উদ্ভোগের মব্যসামিতায় জীবন ছিল সদাই চঞ্চল।

এমন সময়ে জগদীশের সঙ্গে আমার প্রথম মিলন। তিনিও তখন চড়ার উপর ওঠেন নি। পৃষ্ঠ উদয়াচলের ছায়ায় দিকটা থেকেই ঢালু চড়াই পথে যাত্রা করে চলেছেন, কৌড়ি-সূচী আপন মহেশ্ব কিরণ দিয়ে তাঁর সফলতাকে দীপ্যমান করে তোলে নি। তখনো অনেক বাধা, অনেক সংশয়। কিন্তু নিজের শক্তিদুরণের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের যে আনন্দ সে যেন যৌবনের প্রথম প্রেমের আনন্দের মতই আগুনে ভরা, বিঘ্নের পীড়নে দুঃখের তাপে সেই আনন্দকে আরো নিবিড় করে তোলে। প্রবল সুখদুঃখের দেবাসুরে মিলে অমৃতের স্নান যখন জগদীশের তরুণ শক্তিকে মন্বন করছিল সেই সময় আমি তাঁর খুব কাছে এসেছি।

বন্ধুত্বের পক্ষে এমন শুভ সময় আর হয় না। তাঁর পরে যখন মধ্যাহ্নকাল আসে তখন বিপুল সংসার মাঝখানে দাবী করে বসে। তখন কা'র কাছে কি আশা করা যেতে পারে তাঁর মূল্যতালিকা পাকা অক্ষরে

ছাপা হয়ে বেরোয়, সেই অনুসারে নিলেম বসে, ভীড় জমে। তখন মানুষের ভাগ্য অনুসারে মাল্যচন্দন, পূজা-অর্চনা সবই জুটতে পারে; কিন্তু এখন পথঘাতীর বিক্রপ্রায় হাতের উপর বন্ধুর যে করস্পর্শ নির্জন প্রভাতে দৈবক্রমে এসে পড়ে, তার মত মূল্যবান আর কিছুই পাওয়া যায় না।

তখন জগদীশ যে চিঠিগুলি আমাকে লিখেছিলেন তার মধ্যে আমাদের প্রথম বন্ধুত্বের স্বত চিহ্নিত পরিচয় অঙ্কিত হয়ে আছে। সাধারণের কাছে ব্যক্তিগতভাবে তার যথোচিত মূল্য না থাকতে পারে, কিন্তু মানবমনের যে ইতিহাসে কোনো কৃত্রিমতা নেই, যা সহজ প্রবর্তনায় দিনে দিনে আপনাকে উন্মোচন করেছে, মানুষের মনের কাছে তার আদর আছেই। তা ছাড়া, যার চিঠি তিনি ব্যক্তিগত জীবনের ক্লমপক্ষ পেয়ে গেছেন, গোপনতার অক্ষ রাশি তাঁকে প্রচ্ছন্ন করে নেই, তিনি আজ পৃথিবীর সামনে প্রকাশিত। সেই কারণে তাঁর চিঠির মধ্যে যা তুচ্ছ তাও তাঁর সমগ্র জীবন-ইতিবৃত্তের অন্তরূপে গৌরব লাভ করবার যোগ্য।

এর মধ্যে আমারও উৎসাহের কথা আছে। প্রথম বন্ধুত্বের স্মৃতি যদিচ মনে থাকে, কিন্তু তার ছবি সর্বাংশে স্মৃষ্টি হয়ে থাকে না। এই চিঠিগুলির মধ্যে সেই মন ছড়ানো আছে যাতে করে সেই ছবি আবার আজ মনে জেগে উঠে। সেই তাঁর ধর্মতলার বাসা থেকে আরম্ভ করে আমাদের নির্জন পদ্মাতীর পর্যন্ত বিস্তৃত বন্ধুলীলার ছবি। ছেলেবেলা থেকে আমি নিঃসঙ্গ, সমাজের বাইরে পারিবারিক অবরোধের কোণে কোণে আমার দিন কেটেছে। আমার জীবনে প্রথম বন্ধুত্ব জগদীশের সঙ্গে। আমার চিরাভ্যস্ত কোণ থেকে তিনি আমাকে টেনে বের করেছিলেন যেমন করে শরতের শিশিরস্নিগ্ধ সূর্যোদয়ের মহিমা

চিরদিন আমাকে শোবার ঘর থেকে ছুটিয়ে বাইরে এনেছে। তাঁর মধ্যে সহজেই একটি ঐশ্বর্য দেখেছিলুম। অধিকাংশ মানুষেরই ষতটুকু গোচর তার বেশি আর ব্যঙ্গনা নেই, অর্থাৎ মাটির প্রদীপ দেখা যায়, আলো দেখা যায় না। আমার বন্ধুর মধ্যে আলো দেখেছিলুম। আমি গর্ক করি এই যে, প্রমাণের পূর্বেই আমার অহুমান সত্য হয়েছিল। প্রত্যক্ষ হিসাব গণনা ক'রে যে শ্রদ্ধা, তাঁর সহজে আমার শ্রদ্ধা সে জ্ঞাতের ছিল না। আমার অহুভূতি ছিল তার চেয়ে প্রত্যক্ষতর ; বর্তমানের সাক্ষাটুকুর মধ্যেই আবদ্ধ ক'রে ভবিষ্যৎকে সে ধর্ক ক'রে দেখে নি। এই চিঠিগুলির মধ্যে তারই ইতিহাস পাওয়া যাবে, আর যদি কোনো দিন এরই উত্তরে প্রত্যুত্তরে আমার চিঠিগুলিও পাওয়া যায়, তাহ'লে এই ইতিহাস সম্পূর্ণ হতে পারবে।

২২ চৈত্র ১৩৩২

জগদীশচন্দ্র

তরুণ বয়সে জগদীশচন্দ্র যখন কীর্তির দুর্গম পথে সংসারে অপরিচিতরূপে প্রথম যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন, যখন পদে পদে নানা বাধা তাঁর গতিকে ব্যাহত করছিল, সেই সময়ে আমি তাঁর ভাবী সাকল্যের প্রতি নিঃসংশয় শ্রদ্ধাদৃষ্টি রেখে বারে বারে গণ্ডে পণ্ডে তাঁকে যেমন করে অভিনন্দন জানিয়েছি, জয়লাভের পূর্বেই তাঁর জয়ধ্বনি ঘোষণা করেছি, আজ চিরবিচ্ছেদের দিনে তেমন প্রবল কণ্ঠে তাঁকে সম্মান নিবেদন করতে পারি নে শক্তি আমার নেই। আর কিছু দিন আগেই অজানা লোকে আমার ডাক পড়েছিল। ফিরে এসেছি। কিন্তু সেখানকার কুহেলিকা এখনও আমার শরীর মনকে ধিরে রয়েছে। মনে হচ্ছে, আমাকে তিনি তাঁর অন্তিমপথের আসন্ন অন্তবর্তন নির্দেশ করে গেছেন। সেই পথযাত্রী আমান পক্ষে আমার বয়সে শোকের অবকাশ দীর্ঘ হতে পারে না। শোক দেশের হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানের সাধনায় যিনি তাঁর কৃতিত্ব অসমাপ্ত রেখে যান নি, বিদায় নেওয়ায় দ্বারা তিনি দেশকে বঞ্চিত করতে পারেন না। যা অজর যা অমর তা রইল। শাবৌরিক বিচ্ছেদের আঘাতে সেই সম্পদের উপলব্ধি আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, যেখানে তিনি সত্য সেখানে তাঁকে বেশি করে পাওয়াব স্বযোগ ঘটবে। বন্ধুরূপে আমার যা কাজ সে আমার যখন শক্তি ছিল তখন করতে ক্রটি করি নি। কবিরূপে আমার যা কলব্য সেও আমার পূর্ণ সামর্থ্যের সময় প্রায় নিঃশেষ কবে দিয়েছি— তাঁর স্মৃতি আমার রচনায় কীৰ্তিত হয়েই রয়েছে।

বিজ্ঞান ও বসসাহিত্যের প্রকোষ্ঠ সংসৃতির ভিন্ন ভিন্ন মহলে, কিন্তু তাদের মধ্যে যাওয়া-আসার দেনা-পাওনার পথ আছে। জগদীশ ছিলেন সেই পথের পথিক। সেই জগে বিজ্ঞানী ও কবির মিলনের উপকরণ

দুই মহল থেকেই জুটত। আমার অমূল্যের মধ্যে বিজ্ঞানের অংশ বেশি ছিল না, কিন্তু ছিল তা আমার প্রবৃত্তির মধ্যে। সাহিত্য সংক্ষেপে তার ছিল অল্পরূপ অবস্থা। সেই ক্ষেত্রে আমাদের বন্ধুত্বের কক্ষে হাওয়া চলত দুই দিকের দুই খোলা জানলা দিয়ে। তার কাছে আর একটা ছিল আমার মিলনের অবকাশ যেখানে ছিল তার অতি নিবিড় দেশপৌত্তি।

প্রাণ পদার্থ থাকে জড়ের গুণে কুর্ভরিতে গা ঢাকা দিয়ে। এই বার্তাকে জগদীশ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পাকা করে গেলে দেবেন, এই প্রত্যাশা তখন আমার মনের মধ্যে উন্মাদনা জাগিয়ে দিয়েছিল— কেননা ছেলেবেলা থেকেই আমি এই ঋষিবাক্যের সঙ্গে পরিচিত— “যদিদং কিঞ্চ জগৎ প্রাণ এজ্জতি নিঃসৃতং”, “এই যা কিছু জগৎ, যা কিছু চলছে, তা প্রাণ থেকে নিঃসৃত হয়ে প্রাণেই কম্পমান।” সেই কম্পনের কথা আজও বিজ্ঞানে বলছে। কিন্তু সেই স্পন্দন যে প্রাণস্পন্দনের সঙ্গে এক, এ কথা বিজ্ঞানের প্রমাণভাণ্ডারের মধ্যে জমা হয় নি। সেদিন মনে হয়েছিল আর বুঝি দেবি নেই।

তার পরে জগদীশ সরিয়ে আনলেন তার পরীক্ষাগার জড়রাজ্য থেকে উদ্ভিদরাজ্যে, যেখানে প্রাণের লীলায় সংশয় নেই। অধ্যাপকের যশ-উদ্ভাবনী শক্তি ছিল অসামান্য। উদ্ভিদের অন্তরমহলে ঢুকে গুপ্তচরের কাছে সেই সব যশ আশ্চর্য নৈপুণ্য দেখাতে লাগল। তাদের কাছ থেকে নতুন নতুন খবরের প্রত্যাশায় অধ্যাপক সবদা উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকতেন। এ পথে তার সহযোগিতার উপযুক্ত বিজ্ঞা আমার না থাকলেও তবুও আমার অশিক্ষিত কল্পনার অভ্যাসে তিনি বোধ হয় মকৌতুক আনন্দ বোধ করতেন। কাছাকাছি সমজ্ঞদের আনাগোনা ছিল না, তাই আনাড়ি দরদীর অভ্যক্তিগুণের ঐশ্বর্য্যে সেদিন তার প্রয়োজন ছিল। স্কন্ধের প্রত্যাশাপূর্ণ শ্রদ্ধার মূল্য ঘাই থাক, গন্যস্থানের উজ্জ্বল পথে

এগিয়ে দেবার কিছু না কিছু পালের হাওয়া সে জুগিয়ে থাকে। সকল বাধার উপরে তিনি যে জয়লাভ করবেনই, এই বিশ্বাস আমার মধ্যে ছিল অক্ষুণ্ণ। নিজের শক্তির পরে তাঁর নিজের বে শ্রদ্ধা ছিল, আমার শ্রদ্ধার আবেগ তাতে অম্লরগন জাগাত সন্দেহ নেই।

এই গেল আদিকাণ্ড। তার পরে আচার্য তাঁর পবীক্ষালক তত্ত্ব ও সহধর্মিণীকে নিয়ে সমুদ্রপারের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হলেন। স্বদেশের প্রতিভা বিদেশের প্রতিভাশালীদের কাছ থেকে গৌরব লাভ করবে, এই আগ্রহে দিন রাত্রি আমার হৃদয় ছিল উৎফুল্ল। এই সময় যখন জানতে পারলুম যাত্রার পাথেয় সম্পূর্ণ হয় নি, তখন আমাকে উদ্বিগ্ন করে তুললে। সাধনার আয়োজনে অর্থাভাবের শোচনীয়তা যে কত কঠোর, সে কথা দুঃসহভাবেই তখন আমার জানা ছিল। জগদীশের জয়যাত্রায় এই অভাব লেশমাত্রও পাছে বিঘ্ন ঘটায়, এই উদ্বেগ আমাকে আক্রমণ করলে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমার নিজের সামর্থ্যে তখন লেগেছে পরো ভাঁটা। লক্ষ্য লক্ষ্য ঋণের গুণ টেনে আভিমি নত হয়ে চালাতে হচ্ছিল আমার আপন কর্মতরী। অগত্যা সেই দুঃসময়ে আমার এক জন বন্ধুর শরণ নিতে হোলো। সেই মহদাশয় ব্যক্তির ঔদাধ্য স্বরণীয় বলে জানি। সেই জন্মেই এই প্রসঙ্গে তাঁর নাম সম্মানের সঙ্গে উল্লেখ করা আমি কর্তব্য মনে করি। তিনি ত্রিপুরার পরলোকগত মহারাজা রাধাকিশোর দেবমাণিক্য। আমার প্রতি তাঁর প্রভূত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা চিরদিন আমার কাছে বিস্ময়ের বিষয় হয়ে আছে। ঠিক সেই সময়টাতে তাঁর পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ চলছিল। আমি তাকে জানালুম শুভ অমুষ্ঠানের উপলক্ষ্যে আমি দানের প্রার্থী, সে দানের প্রয়োগ হবে পুণ্যকর্মে। বিষয়টা কী শুনে তিনি ঐহৎ হেসে বললেন, “জগদীশচন্দ্র এবং তাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছুই জানি নে, আমি যা দেব, সে আপনাকেই দেব, আপনি তা নিয়ে কী

করবেন আমার জ্ঞানবার দরকার নেই।" আমার হাতে দিলেন পনেরো হাজার টাকার চেক। সেই টাকা আমি আচাষের পাথের অঙ্গুষ্ঠ করে দিয়েছি। সেদিন আমার অসামর্থ্যের সময় যে বন্ধুত্ব করতে পেরেছিলুম, সে আর এক বন্ধুর প্রসাদে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগ পাশ্চাত্য মহাদেশকে আশ্রয় করেই দীপ্তিমান হয়ে উঠেছে, সেখানকার দীপালিতে ভারতবাসী এই প্রথম ভারতের দীপশিখা উৎসর্গ করতে পেরেছেন, এবং সেখানে তা স্বীকৃত হয়েছে। এই গৌরবের পথ স্বগম করবার সামান্য একটু দাবিও মহাবাহু নিজে না বেখে আমাকেই দিয়েছিলেন, সেই কথা স্মরণ করে সেই উদারচেতা বন্ধুর উদ্দেশ্যে আমার স্বগভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

তার পর থেকে জগদীশচন্দ্রের যশ ও সিন্ধির পথ প্রশস্ত হয়ে দরে প্রশারিত হোতে লাগল, একথা সকলেই জানা আছে। ইন্দির কোনো উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী তাঁর কৌতুহলে আকৃষ্ট হলেন, মহাজ্ঞেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাঁর পরীক্ষা-কামনের প্রতিষ্ঠা হোলো, এবং অবশেষে ত্রৈলোক্যলী বসু-বিজ্ঞানমন্দির স্থাপনা সম্বন্ধে হোতে পারল। তাঁর চরিত্রে সংকল্পের যে একটি সুদৃঢ় শক্তি ছিল, তাঁর দ্বারা তিনি অসাদ্য সাধন করেছিলেন। কোনো একক ব্যক্তি আপন কাজে বাজকোষ বা দেশীয় ধনীদেব কাছ থেকে এত অল্প অর্থ-সাহায্য বোধ করি ভারতবর্ষে আর কখনো পায় নি। তাঁর কর্মারম্ভের ক্ষণস্থায়ী টানাটানি পার হবামাত্রই লক্ষ্মী এগিয়ে এসে তাঁকে বরদান করেছেন এবং শেষপর্যন্তই আপন লোক-বিখ্যাত চাপল্য প্রকাশ করেন নি। লক্ষ্মীর পদ্যকে লোকে সোনার পদ্য বলে থাকে। কিন্তু কাঠিন্য বিচার করলে তাকে লোহার পদ্য বলাই সংগত। সেই লোহার আসনকে জগদীশ আপনার দিকে যে এত অনায়াসে টেনে আনতে পেরেছিলেন, সে তাঁর বৈয়াক্তিক চৌম্বকশক্তি,

অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে পার্সোনাল ম্যাগনেটিজ্‌ম্, তারই গুণে ।

এই সময়ে তাঁর কাজে ও রচনায় উৎসাহদাত্তরূপে মূল্যবান সহায় তিনি পেয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতাকে । জগদীশচন্দ্রের জীবনের ইতিহাসে এই মহনীয় নারীর নাম সম্মানের সঙ্গে রক্ষার যোগ্য । তখন থেকে তাঁর কর্মজীবন সমস্ত বাহ্য বাধা অতিক্রম করে পরিব্যাপ্ত হোলো বিশ্বভূমিকায় । এখানকার সার্থকতার ইতিহাস আমার আয়ত্তের অতীত । এদিকে আমার পক্ষে সময় এল যখন থেকে আমার নির্গম কর্মক্ষেত্রের ক্ষুদ্র সীমায় রোদে বাদলে মাটিভাঙা আলবাবার কাজে আমি একলা ঠেকে গেলুম । তার সাধনকৃচ্ছ্রতায় আত্মীয়বন্ধুদের থেকে আমার চেষ্টাকে ও সময়কে নিল দূরে টেনে ।

[১৩৪৪]

JAGADISH CHANDRA BOSE

Years ago, when Jagadis Chandra, in his militant exuberance of youthfulness, was contemptuously defying all obstacles to the progress of his endeavour, I came into intimate contact with him, and became infected with his vigorous hopefulness. There was every chance of his frightening me away into a respectful distance, making me aware of the airy nothingness of my own imaginings. But to my relief, I found in him a dreamer, and it seemed to me, what surely was a half-truth, that it was more his magical instinct than the probing of his reason which startled out secrets of nature before sudden flashes of his imagination. In this I felt our mutual affinity but at the same time our difference, for to my mind he appeared to be the poet of the world of facts that waited to be proved by the scientist for their final triumph, whereas my own world of visions had their value, not in their absolute probability, but in their significance of delightfulness. All the same, I believe that a part of my nature is logical which not only enjoys making playthings of facts, but seeks pleasure in an analytical view of objective reality. I remember often having been assured by my friend that I only lacked the opportunity of training to be a scientist but not the temperament. Thus in the prime of my youth I was strangely attracted by the personality of this remarkable man and found his mind sensitively alert in the poetical atmosphere of enjoyment which belonged to me.

At this time he was busy detecting in the behaviour

of the non-living some hidden impulses of life. This aroused a keen enthusiasm in me who had ever been familiar with the utterance of the Upanishad which proclaims that whatever there is in this moving world vibrates with life. Afterwards he shifted his enquiries from the field of physics to the biological realm of plants. With the marvellously sensitive instruments which he invented he magnified the inaudible whisperings of vegetable life, which seemed to him somewhat similar in language to the message of our own nerves. My mind was overcome with joy at the idea of the unity of the heart-beats of the universe, and I felt sure that the pulsating light which palpitates in the stars has its electric kinship in the life that throbs in my own veins. I knew that this was not science, but my mind trembled with the hope that the opening message had already been declared and final evidences were in preparation.

At last when Jagadis Chandra sailed across the sea to place the results of his researches before the questioning scrutiny of the West, my heart expanded with an undoubting expectation of our country's claim to a world-recognition being accepted and at the prospect of a wide establishment of a wonderful truth which is native to our oriental attitude of mind. With what little lay in my power I helped him in his adventure but, fortunately, since then no more help was needed either in companionship or in other ways from a man like me who was too heavily burdened with his own responsibilities. His fame spread rapidly and material

contributions from all sides showered upon his schemes, which centralized at last in the Bose Institute. I fervently hope that the Spirit of Science will find its lasting shrine in this place and the aspiration of the great master will remain a living force in its heart, making it a perpetual memorial worthy of him.

This tribute of mine to the memory of Jagadis will appear inadequately feeble, especially in contrast to the repeated magnification of his name in my writings both in prose and verse at the time when his fame was not luminously apparent above the horizon and when, I am sure, my fellowship and unfaltering faith in his genius did hearten and help him. But my struggling health, which has lately been wrenched back from the grip of death, is incompetent for most of my important tasks and also the singing hope that began its first soaring in immensity has completed its journey in its terminus.

JAGADISH CHANDRA BOSE

Memorial Address

When by some fortunate chance I came into an intimate contact with Sir Jagadish, he was in the prime of his youth and I was very nearly of his age. At that moment his mind seemed entranced with a vision of the living creatures' fundamental kinship with the world of the unconscious. He was busy in employing his marvellous inventiveness in coaxing mute Nature to yield her hidden language. The response which he received through skilful questionings revealed to him glimpses of the mystery of an existence that concealed its meaning underneath a contradiction of its appearance. I had the rare privilege of sharing the daily delight of his constant surprises. I believe, poets inherit the primeval age in their temperament when things in their infant simplicity revealed a common feature. Somehow these lovers of *Maya* feel the joy of their being spread all over the creation, which makes them indulge in seeking the analogy of the living in things that appear lifeless. Such an attitude of mind may not in all cases be based upon any definite belief, animistic or pantheistic ; it may be merely a make-believe, as we notice in children's play, which owes its origin to the lurking tendency in our sub-conscious mind to ascribe life-energy to all activities in the natural world. I was made familiar from my boyhood with the Upanishad which, in its primitive intuition, proclaims that whatever there is in this world vibrates with life, the life that is one in the infinite.

This might have been the reason of the eager enthusiasm with which I expected that the idea of the boundless community of life in the world was on the verge of a final sanction from the logic of scientific verification. Being allowed to follow the Master's footsteps in the privacy of his pursuit, even though as a mere picker of his casual hints, I had my daily feast of wonders. At this early stage of his adventure when obstacles were powerfully numerous and jealousy largely predominated over appreciation, friendly companionship and sympathy must have had some needful value for him even from one who to maintain intellectual communion with him lacked special competency. Yet I can proudly claim to have helped him in some of his immediate needs and occasional hours of despondency in those days of an inadequate recognition and feeble support that he received from the public.

In the background of that distant memory of mine, I find not the slightest gleam of a vision of the enormous success that could before long combine scientific renown with a vast material means adequate enough to build this Institute, one of the very few richly endowed mediums in India for bestowing the benediction of science upon his countrymen. In fact, it makes me laugh at myself to-day to read, in some of my old letters, my effort to encourage him with the likelihood of filling the gaps in his funds when my own resources were precariously limited to persuading friends who were foolish enough to have faith in me.

Still it is comically sweet to think of the proud magnificence in my assurance fitfully accompanied by contribution absurdly poor compared to the ceaseless flow of tribute that, later on, he could attract by his own magnetic personality and also by the general confidence he widely aroused in his genius. But I repeat again, it was sweet to have dreamed impracticable dreams and to have done however little it was possible, as it proves a courage of joy in the faith in greatness which itself is a bounteous gift to one's own mind.

However ill-equipped as I was by the deficiency in my training and by the poet's idiosyncrasy to be a fit companion to a man of science at a luminous period of his self-revelation, I was still accepted as his close friend and, possibly because of the contrariety in our natural vocations, I was able to offer some stimulation to his urge of fulfilment. Not having the necessary amount of vanity in my constitution, it had been the subject of constant wonder in my mind.

Since then time passed quickly, maturing the fruits of our expectation. During this period of his fast-growing triumph, I was modest enough to feel less and less the urgency of my comradeship in his journey towards the goal, which was no longer arduous or beset with uncertainty. And yet I can rightfully claim the credit for strengthening in some measure his trust in his own destiny, by adding to it my own unwavering faith, at that painfully hesitant moment of fortune during the dubious dawn of his career, when even

persons of meagre resources might have some important use.

Victory is the inalienable claim of all genuine power having the might of attraction that naturally exploits all kindred elements on its path and moulds them into an image of glory. And such an image is this Institute, which represents the Master's lifelong endeavour taking a permanent shape in the form of a centre for the inspiration of similar endeavours.

However, the early association of mine with the Master's first great challenge of genius to his fate, whose path at that time did not run smooth, belongs for me to a remote period of a history in which I feel myself hazily indistinct. And this made me seriously waver to accept the invitation for taking an honoured seat at a ceremonial meeting in this institution. The presumptuousness of youth made me absurdly proud to imagine that my companionship was growing into an organic part in the history that was being evolved before my eyes, and, in that belief I did try to hearten the hero, which was a part of my vanity. But foolish youth does not last for ever, and I have had time to come to realise my limitation. Anyhow it is quite obvious, that I am a mere poet carrying on my *sadhana* in the temple of language, the most capricious deity who is apt to ignore her responsibility to logic, often losing herself in the nebulous region of fantasy. Our oriental custom is to bring proper gifts to sacred shrines, but my gift of words for this occasion cannot but be out of place among the records of memorable

proceedings of a learned society.

Fortunately there are some few men among us who can claim fellowship with the aristocracy in the realm of science, and can be expected to make splendid this ceremony with the wealth of their thoughts. I can only bless this institution from that obscure distance where the multitude of the uncared-for generations of this country have helplessly drifted to the pitiless toil of primitive land-tilling. I offer my salutation to the illustrious founder of this Institute, humbly sitting by those who are deprived of a sufficiency of that knowledge which only can save them from the desolating menace of scientific devilry and from the continual drainage of the resources of life, and I appeal to this Institute to bring our call to science herself to rescue the world from the clutches of the marauders who betray her noble mission into an unmitigated savagery.

১ মহারাষ্ট্র রাধাকিশোর মণিকা-সাহায্যের 'ল'লিত

...জগদীশবাবুর সেই টাকা আমার নিকট পাঠাইলে আমি আনন্দ-সহকারে যথাস্থানে যথাসময়ে পাঠাইয়া দিব। ইতিমধ্যে দিন দুয়েকের জন্য কলিকাতায় গিয়াছিলাম— সেখানে জগদীশবাবুর সহিত অনেক আলাপ-আলোচনা হইল। তিনি সম্প্রতি বিলাতের পণ্ডিতদের নিকট হইতে মহোৎসাহপূর্ণ যে সমস্ত পদ পাঠিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া পুলকিত হইয়াছি। তাহারা লিখিয়াছেন— 'আপনার নূতন আবিষ্কারগুলি পরমাশ্চর্যজনক।'... ২১ বৈশাখ ১৩০৭

২ ঠাকুর মহিমচন্দ্র সদয়মাকে 'ল'লিত

...আমি ভাবিলাম তোমরা রাজপারিষদ। লোকের মাদু উদ্দেশ্যে তোমাদের বিশ্বাস নাই— সকলকেই তোমরা সন্দেহচক্ষে দেখ— মহারাষ্ট্রের স্বাভাবিক ঐদায়াকে তোমরা আচ্ছন্ন করিয়া আছ। বস্তুতঃ মহারাষ্ট্রের মত লোকের সহিত সংশ্রব রাখিলেই সাধারণ লোকে সন্দেহের চক্ষেই দেখে। সাধারণের কাছে আমার প্রতিপত্তি আছে— আমি স্বার্থপর ভাবে ভিক্ষুভাবে মহারাষ্ট্রের দ্বারে গমনাগমন করি এ অপবাদ গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করি। মহারাষ্ট্র আমাকে মাণ্ডবন্ধু-ভাবে দেখিয়া তদনুরূপ ব্যবহার করিতে নিজে স্বভাবতঃই ইচ্ছুক কিন্তু অনিতে পাই তোমরা তাহাতে বাধা দিয়া ঠাহাকে স্বদরে রাখিতে চেষ্টা

কর—সুতরাং মহারাজের সহিত আমার প্রিয় সম্বন্ধ লোকচক্ষে হীন
 করিয়া তুলিতেছে। সেই সকল কারণে মহারাজের প্রতি আমার
 আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অহুসার সত্ত্বেও আমি ক্রমশঃ দূরে নির্লিপ্ত থাকিবার
 চেষ্টায় ছিলাম। কেবল অগদীশবাবুর কার্যে আমি মান অপমান অভিমান
 কিছুই মনে স্থান দিতে পারি না—লোকে আমাকে যাহাই বলুক এবং
 যতই বাধা পাই না কেন তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত ভারমুক্ত করিতে পারিলে
 আমি কৃতার্থ হইব—ইহা কেবল বন্ধুত্বের কার্য্য নহে, স্বদেশের কার্য্য।
 সুতরাং ভিক্ষুভাবেই আমি এবার অসকোচে মহারাজের ঘারে দাঁড়াইব।
 আমি ধনী পুত্র কিন্তু ধনী নহি—অস্তুরে ঈশ্বর যে সকল শুভ সম্বন্ধ
 প্রেরণ করেন তাহা সাধনের ক্ষমতা আমার হাতে দেন নাই—সুতরাং
 শুভকর্মের অস্তরায়স্বরূপ সমস্ত অভিমানকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দেওয়াই
 আমার কর্তব্য। অগদীশবাবুর জন্ম তাহাই দিব। তাহার পরে যদি
 পারি তবে সংসারের সমস্ত স্তুতিনিন্দা হইতে নিজেকে দূরে লইয়া গিয়া
 শাস্তিচিন্তে স্বচেষ্টায় নিজের কর্তব্য পালন করিব।... [১৩০৮]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩ প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত

...আজ অগদীশ বসুর এক চিঠি পেয়ে ভারি আনন্দে আছি। এবারে
 তিনি সেখানে খুব বড় রকমের জয়লাভ করে আসবেন তার সূত্রপাত
 হয়েছে। এবারে তিনি যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন তাতে
 বিজ্ঞানের অনেকগুলি প্রাচীন মত উন্টে গিয়ে একটা বৈজ্ঞানিক বিপ্লব
 উপস্থিত হবে—একবারে মূলতত্ত্বে যা দেবে—কেবল Physics নয়,

কেমিষ্ট্ৰী, ফিজিয়লজি এমন কি Psychology পৰ্য্যন্তে আঘাত কৰবে । যুদ্ধ ত আৰম্ভ হৈছে । ইলেক্‌ট্ৰিচিটি সম্বন্ধে Prof. Lodge য়ুরোপেৰ মধ্য একজন মহাবীৰ— জগদীশ বসুৰ মত বিশেষ ৰূপে তাঁৰই মত ধৰণ কৰেছে । সে জন্মে প্ৰথমে, প্ৰোফেসাৰ যুদ্ধসাজে সদলবলে এসেছিলে— কিন্তু জগদীশ বসুৰ প্ৰবন্ধ শুনে Prof. Lodge উঠে প্ৰশংসাবাদ কৰে বসুজায়াৰ নিকট গিয়ে বুলে— Let me heartily congratulate you on your husband's splendid work. তাৰ পৰে তাঁৰা ঠেকে ধৰে পড়েছেন যে, তুমি ইংলেণ্ড থেকে কাজ কৰ, ভারতবৰ্ষে তোমাৰ বিস্তৰ ব্যাঘাত । ঠেকে সেখানকাৰ একটা বড় য়ুনিভাৰ্চিটিৰ অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত কৰবাৰ জন্মে তাঁৰা অস্বৰোধ কৰে— তিনি জন্মভূমিৰ প্ৰতি মমত্ববশতঃ ইতস্ততঃ কৰে । আমি তাঁকে মিনতি কৰে লিখেছি যে, জন্মভূমিৰ মোহ যেন তাঁৰ চিত্তকে তাঁৰ কাজেৰ সফলতা থেকে বিক্ষিপ্ত কৰে না দেয় । সেখানে অবসৰ এবং বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীৰ সহায়তা ও সহায়ভূতিৰ মধ্য না থাকলে তাঁৰ হাতেৰ সূৰুং কাজ সমাধা কৰতে পাৰবেন না । তাঁৰ কৃতকাৰ্য্যতাতেই তাঁৰ মাতৃভূমিৰ গৌৰব । আমি ঈশ্বৰেৰ কাছে প্ৰাণমনে প্ৰাৰ্থনা কৰি তাঁৰ জয় হোক !

শ্ৰীৰবীন্দ্রনাথ ঠাকুৰ

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

অনেকদিন পরে মহারাজের পত্র পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি।

মহারাজের সহিত আমি এমন কোন সম্বন্ধ রাখিতে ইচ্ছা করি না যাহাতে লোকে স্বার্থসিদ্ধির অপবাদ দিতে পারে। আমার সাধ্য যৎসামান্য হইলেও, এবং উদ্দেশ্য লোকহিতকর হইলেও, যে কাজ নিজের হাতে লইয়াছি সে সম্বন্ধে মহারাজের নিকট হইতে আর্থিক সহায়তা লইব না ইহা আমি স্থির করিয়াছি। কষ্ট এবং ত্যাগ স্বীকার ব্যতীত কোন মহৎ কর্মের মূল্য থাকে না— আমার যতদূর সাধ্য আছে বঙ্গদর্শন পরিচালনায় তাহার সীমা অতিক্রম করিলেই গৌরব লাভ করিব। এবারে জগদীশবাবুর পত্র পড়িয়া এই বিষয়ে আমি মনে মনে বল লাভ করিয়াছি— জগদীশবাবুর প্রতিভায় পাণ্ডিত্য এবং সহৃদয়তার আশ্চর্য্য মিলন হইয়াছে বলিয়া এ সকল ব্যাপারে তাঁহার মত আমার কাছে সর্বোগ্রগণ্য। তিনি লিখিয়াছেন:—

‘তুমি পুনরায় সম্পাদকের ভার লইয়া তোমার সময় নষ্ট করিবে মনে করিয়া প্রথম প্রথম দুঃখিত হইয়াছিলাম। তারপর দুই সংখ্যা বঙ্গদর্শন পাইয়া অতিশয় সুখী হইয়াছি। আর, সমস্ত লেখাতে একটি নূতন ভাব দেখিয়া অতিশয় আশান্বিত হইয়াছি। এতদিন পরে যদি আমাদের চক্ষের আবরণ ঘুচিয়া যায় এবং আমরা আমাদের প্রকৃত মহত্ত্ব বৃদ্ধিতে পারি, তাহা অপেক্ষা আর কিছুই অভিপ্রেত হইতে পারে না। তোমার আকাঙ্ক্ষা যেন ভারতবর্ষময় ব্যাপ্ত হয়। আর, তুমি যে সব দুর্লভ প্রতিভা করিয়াছ তাহা যেন রক্ষা করিতে সমর্থ হও! আমার সর্বোপেক্ষা কোভ এই যে, আমাদের প্রকৃত গৌরব ভুলিয়া মিথ্যা আড়ম্বর লইয়া ভুলিয়া আছি। এখন এ সব দেশ ভাল

করিয়া দেখিয়াছি, এখন অনেক বুঝিতে পারি। অন্য কোন দেশে সভ্যতা এতদূর নিম্নস্তর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে? অন্য কোন জাতি অন্যায়কে আঁধ্য করিতে পারিয়াছে? অন্য কোথায় নিম্নস্তর পর্য্যন্ত পুণ্য একরূপ প্রসারিত হইয়াছে? তবে আজকাল জ্ঞান লইয়া সভ্যসভ্যের বিচার হয়। তোমরা মূর্খ তোমরা কেবল নকল করিতে পার ইত্যাদি কথা বিদেশী কেন, স্বদেশীয় অনেকের নিকট শুনিয়াছি। এই এক কথা শুনিয়া সমস্ত দেশের লোক মন্থমুগ্ধ হইয়া আছে। তুমি স্নেহগুণে আমার অনেক অস্বাভা প্রশংসা করিয়াছ। যদি কিছু প্রশংসার থাকে তবে এই যে আমি এই মন্থপাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে পারিয়াছি। আমি সত্য বলিতেছি যে, অশ্রু বাহা করিয়াছে তাহা যতই উচ্চ হউক না কেন তাহা আমাদের জাতির পক্ষে অসম্ভব নহে। তোমরা আশীর্বাদ কর আমি যেন সেই Eternal lie, বাহা দ্বারা আমাদের সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত উৎসাহ, নিশ্চল হইয়াছে— সেই ঘোর মিথ্যাপাশকে চিরকালের জন্য ছিন্ন করিতে পারি।*

জগদীশবাবুর এই পত্র আমার পক্ষে পারিতোষিক। আমি বাহা বলিতে চেষ্টা করিয়াছি তিনি তাহা বুঝিয়াছেন। হিন্দুর যথার্থ গৌরব কি, এবং হিন্দুর উন্নতিসাধনের প্রকৃত পথ কোন্ দিকে বহুদর্শনে তাহাই সম্যক আলোচিত হইলে আমি চরিতার্থ হইব। হিন্দু কি তাহাই আমি ক্রমশঃ দেখাইতেছি এবং সেই সঙ্গে একথাও জানাইতেছি যে, যুরোপীয় সভ্যতায় বাহাকে গ্লাননাল মহত্ব বলে তাহাই মহত্বের একমাত্র আদর্শ নহে। আমাদের বিপুল সামাজিক আদর্শ তাহা অপেক্ষা অনেক বৃহৎ ও উচ্চ ছিল। এই আদর্শকে যদি জড়বশত আমরা নষ্ট হইতে দিই তবে যুরোপীয় মতে নেশন্স হইব না অথচ স্বাধুপ্রকৃতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অকর্মণ্য দুর্বল হইব।

জগদীশবাবুর জন্ম কিছু করিবার সময় অগ্রসর হইতেছে। তাহার

বিজ্ঞানালোচনার সঙ্কটকাল উপস্থিত হইয়াছে। তিনি যে উচ্চের দিকে
 উঠিতেছিলেন পরাধীনতা ও বাহিরের বাধায় তাঁহাকে হঠাৎ নিরস্ত
 করিলে আগাদের পক্ষে ক্ষোভ ও লজ্জার সীমা থাকিবে না। মহারাজ
 আপনাকে স্পষ্টে কথা বলি— আমি যদি দুর্ভাগ্যক্রমে পরের অবিবেচনা-
 দোষে ঋণজালে আপানমস্তক জড়িত হইয়া না থাকিতাম তবে জগদীশ-
 বাবুর জন্ত আমি কাহারও দ্বারে দণ্ডায়মান হইতাম না, আমি একাকী
 তাঁঙ্গর সমস্ত ভার গ্রহণ করিতাম। দুর্বস্থায় পড়িয়া আমার সৰ্বপ্রধান
 আক্ষেপ এই যে দেশের হিতকার্যের জন্ত পরকে উত্তেজনা করা ছাড়া
 আমার দ্বারা আর কিছুই হইতে পারে না। মহারাজের উদার হৃদয়,
 লোকহিতৈষ্য মহারাজের পক্ষে স্বাভাবিক, সেই গুণে আমি মহারাজের
 নিকট একান্ত আকৃষ্ট হইয়া আছি। জগদীশবাবুর জন্ত আমি প্রত্যক্ষভাবে
 মহারাজের নিকট দরবার করিতে ইচ্ছুক— এজন্য আমি আগরতলায়
 যাইতে প্রস্তুত।... আমি মহারাজের নিৰ্জন খাস্ দরবারের মধ্যে প্রবেশ
 করিবার প্রত্যাশী— আমি মহারাজের প্রতি নিতাস্তই উপদ্ৰব করিব,
 মঙ্গীবর্গদ্বারা আমি প্রতিহত হইব না। মহারাজের পরিচরবর্গ নানা
 *কথাই বলিবে, নানা অভিসন্ধি আশঙ্কা করিয়া আমাকে সঙ্কুচিত করিবে,
 কিন্তু আমি তাহা নিরোধায় করিব। মহারাজের নিকট পূৰ্ব হইতেই
 আমার এই নিবেদন রহিল। মহারাজের প্রতি আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা
 আছে বলিঘাই আমি অকুণ্ঠিতভাবে সকল কথা বলিলাম। যদি ধুষ্টতা
 হইয়া থাকে তবে মাৰ্জ্জনা করিবেন। এবং আমাকে ব্যক্তিগত হিসাবে
 মাৰ্জ্জনা করিয়া আমার একান্ত আনুষ্ঠানিক মঙ্গল উদ্দেশ্যের প্রতি প্রসন্ন
 দৃষ্টি রক্ষা করিবেন।... ইতি ২৪শে আষাঢ় ১৩০৮

চিরানুরক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

...জগদীশকে মহারাজ যে পাঁচ হাজার টাকা সাহায্য প্রেরণ করিয়াছেন তাহার জন্য আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় অভিষিক্ত হইয়াছে। মহারাজের উদার মহত্ব বারম্বার অশ্রুভব করিয়াছি, তাহা চিরকাল মনে রহিবে, মুখে প্রকাশ করিব কি করিয়া?... মহারাজের উদারতা কালক্রমে সর্ব-প্রকার বাধামুক্ত হইয়া আমাদের স্বদেশকে সফলতার পথে প্রতিষ্ঠিত করিবে।... ইতি ২৪শে শ্রাবণ ১৩০২

অমরকট ভক

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৬

ছোডাসাঁকো

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন,—

মহারাজের নিকট অধ্যাপক বস্তুর একটি প্রার্থনা জানাইবার নিমিত্ত এই পত্র লিপিতেছি।

অধ্যাপক মহাশয় উদ্ভিদের বর্ধন পরিমাপের জন্য একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি এই বর্ধনতন্ত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত আছেন।

ত্রিপুরায় যে মূল্য বাশ জন্মে— শিশু অবস্থায় তাহার বৃদ্ধি অতিশয় দ্রুত। এই গাছের চারা তাঁহার পরীক্ষার জন্য অত্যাশঙ্কক হইয়াছে। সজ্ঞ অঙ্কুরিত মূল্য বাশের চারা মহারাজ যদি সইর তাঁহার ঠিকানায় পাঠাইয়া দিতে আদেশ করিয়া দেন তবে তাঁহার বিশেষ উপকার হইবে।

পথের মধ্যে অন্ধুৰাগ্ৰ দলিত হইয়া গাছগুলি মৰিয়া না যায় সে অল্প
প্যাকবাক্সে শিকড় সমেত গাছগুলি মাটিতে বসাইয়া তাহাৰ উপৰে
খাঁচাৰ আবৰণ দেওয়া আবশ্যিক হইবে। আপাতত প্ৰায় ২০২৫টি
গাছ তাহাৰ প্ৰয়োজন হইবে। পৰীক্ষাৰ উপদ্ৰবে এগাছগুলি মাৰা গেলে
অল্প তাজা গাছেৰ পুনশ্চ প্ৰয়োজন হইবে— তখন মহাৰাজ পুনৰ্কাৰ
আদেশ কৰিয়া দিবেন। কলিকাতাৰ নিকটে এই গাছেৰ সন্ধান কৰিয়া
না পাওয়াতে তাহাৰ পৰীক্ষা অসমাপ্ত হইয়া আছে। ... ইতি ২৪
আষাঢ় ১৩১২

চিৰান্তৰক
শ্ৰীৰবীন্দ্রনাথ ঠাকুৰ

বিধাতা দেশ থেকে আমাদের তাড়া করেছিলেন এই জন্তে যে, মহাবিশ্বের পথকেই আমরা দেশ বলে গ্রহণ করব। এই জন্তে যে, আমরা আরামে থাকব না আমরা আলোকে বাস করব—আমাদের জন্তে সম্পদ নয়, মুক্তি। যাই হোক আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশের বৈরাগীরা বিশ্বের পথে পথে ছড়িয়ে পড়বে—কোণের মধ্যে আমাদের জায়গা হবে না। ঐ দেখনা, এত কোণ এত বন্ধনের মধ্যেও জগদীশ বোসকে কেউ ধরে রাখতে পারলে না। তাঁর বিজ্ঞানের মস্ত কুণ্ডো বিজ্ঞানের মস্ত নয়—তিনি জড় ও চেতন, বস্তুবিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান সমস্তকে একত্র মিলিয়ে বন্ধনমুক্ত জ্ঞানের মহাসম্মেলন পৃথক পৃথক করে তুলেছেন। এই যে তিনি দ্বার খুলে বেরিয়েছেন এ দ্বার সহজে আর বন্ধ হবে না, তাঁর দলেব লোক আরো আসছে, পথে আর জায়গা হবে না। ইতিমধ্যে এক পয়সা দু পয়সার সাময়িক ও অসাময়িক পত্রগুলো কুণ্ডো-রাজ্যের দলাদলি নিয়ে কোদল করুক চীংকার করুক, সে কারো কানে পৌছবে না—কেননা বাংলাদেশের অস্বপ্নতম সাধন-লোকে সিদ্ধিদাতার আশ্রয় এসে পৌঁছেছে। ১০০০ ১০ টি কার্টিক ১৩২৩

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

...কোনো একটা জাতের সঙ্গে বৈষয়িক সংঘর্ষ থাকলেই তার বিকারে এইরকম অসত্য বুদ্ধি উগ্র হয়ে ওঠে। আমার উদ্দেশ্য ছিল অবৈষয়িক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য জাতির সঙ্গে মিলনের পথ উদ্ঘাটন করা। আমি যুরোপকে অস্তরের সহিত শ্রদ্ধা করি। আমি জানি ঐখানেই মানুষের মন সর্বতোভাবে ছেগেছে— এইজন্মে ঐখান থেকেই মানুষের সমস্ত কলুষ দূর হবে। যারা আধজাগা, আধমরা তারা নিজের অসাড়তার বোঝায় ধরণীকে ভারাক্রান্ত করে, এবং সম্ভব পদার্থকে ব্যাধিগ্রস্ত করে। অথচ আমাদের স্থপতির তলায় একটা চিত্র আছে, আমরা বর্কর নই। জাগৃত জগতের সঙ্গে অস্তরের যোগ হলেই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হবে। তখন আমরা কেবল গ্রহণ করব না, দান করব। জগদীশ আজ বিশ্বকে যা দিচ্ছেন তার মধ্যে ভারতের চিত্র আছে, কিন্তু তার উদ্বোধন যুরোপের। তিনি যদি কৃপমণ্ডুক হয়ে কেবল সাংখ্যদর্শন মুখস্থ করে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির চর্চা করতেন তাহলে কি হত সবাই জানি। সাংখ্য-দর্শন যখন সম্ভব ছিল তখন ওর মধ্যে থেকে আমাদের চিত্র প্রাণ-শক্তি লাভ করতে পারত। কিন্তু এখন ওর প্রাণক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়ে ও একটা শাস্ত্রমাত্র হয়ে রয়েছে। অতএব সাংখ্যদর্শনকে সম্ভবভাবে জানতে ও গ্রহণ করতে হলে যুরোপীয় বিদ্যার সঙ্গে তার সহযোগিতা ঘটতেই হবে।... ২৮ ভাদ্র ১৩৩৫

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : ভাণ্ডার-সম্পাদক

আমাদের দেশের শিক্ষার আদর্শ এখনকার অপেক্ষা দুর্লভতর ও পরীক্ষা কঠিনতর করা ভাল কি মন্দ ?

উত্তর : শ্রীযুক্ত অমদীশচন্দ্র বসু

শিক্ষার আদর্শ দুর্লভতর ও পরীক্ষা কঠিনতর করা সম্বন্ধে “ভাণ্ডারে” যে প্রশ্ন তোলা হইয়াছে, আমি কেবল বিজ্ঞানের পক্ষ হইতে সংক্ষেপে তাহার উত্তর দিব।

এ কথা সকলেই জানেন যে, আমাদের দেশে শিক্ষিতদের মধ্যেও বিজ্ঞান-চর্চা তেমন করিয়া ছড়াইয়া পড়ে নাই। দেশী ভাষায় সাহিত্যের যেমন উন্নতি হইয়াছে, বিজ্ঞানের তেমন হয় নাই, ইহা তাহার একটি প্রমাণ।

এমন স্থলে এ দেশের যুনিভার্সিটিকে এ দেশের অবস্থা ও অভাব বিশেষভাবে বিচার করিয়া কাজ করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই ;— অন্য দেশের অনুকরণ করিতে গেলে, সে দেশের লোক যে ফল পাইতেছে তাহাও পাইব না, আমরা যে ফল আশা করিতে পারিতাম তাহা হইতেও বঞ্চিত হইব। যে ব্যক্তি চলিতে শিখিলেই আপাতত খুসি হওয়া যায়, তাহাকে একদমে লাফ দিতে শিখাইতে হইবে এমন পণ করিয়া বসিলে, লাফ দেওয়া ত হইবে না, মাঝে হইতে চলাই দুর্ঘট হইবে।

দেশে যাহারা একটা নূতন ব্যবসা চালাইতে চায়, তাহারা কি উপায় গ্রহণ করে ? ভারতবাসীদের মধ্যে চায়ের ব্যবসা ঝাঁকাইয়া তুলিবার

জন্ম কি করা হইয়াছে? দেশের ষথাসম্ভব লোক যাহাতে চায়ের স্বাদ পায়, চা-পান করিতে অভ্যস্ত হয়, তাহার জন্ম দেশ জুড়িয়া সম্ভায় চা-বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। অত্যন্ত সেরা জাতের দামী চা চড়াদরে বাজারে বাহির করা, দেশে চা-প্রচলনের পক্ষে ভাল উপায় বলিয়া গণ্য হয় নাই।

দেশে নূতন বিজ্ঞা চালাইবারও এই একই উপায়। প্রথমপরিচয়ের স্বাদ বিস্তার করিবার জন্ম শিক্ষার প্রণালীকে সরল করা চাই,— যখন অনেক লোকের মধ্যে শিক্ষার গোড়াপত্তন হইয়া যাইবে, দেশের লোক যখন এই বিজ্ঞার রস পাইতে থাকিবে, তখন যোগ্যতার বাছাই করিবার জন্ম এখনকার চেয়ে কড়াকড়ি চলিতে পারিবে।

বিদেশী যুনিভার্সিটির চেয়ে আমাদের আদর্শ পাটো হইয়া পড়িবে, এই মিথ্যালঙ্কার কোনো মূল্য নাই। সেখানকার আদর্শও চিরদিন একইভাবে ছিল না— জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে।

যাই হোক না কেন, রাজ্যবাড়ীতে সকলে ক্ষীর খাইতেছে বলিয়া, দরিদ্র বেচারাকে সেই আদর্শে লঙ্কার বশে দুধ খাওয়া ছাড়িতে কেহ পরামর্শ দিবে না— আপাতত যাহা আমাদের পুষ্টির পক্ষে প্রয়োজন সেই দিকে মন দিতে হইবে, গৌরবের কথা পরে ভাবা যাইবে।

তা ছাড়া, আর একটি কথা বলিবার আছে। বিজ্ঞানের কূটতন্ত্র ও কঠিনসমস্যা লইয়া নাড়াচাড়া করিলেই যে উদ্ভাবনী শক্তি বাড়ে তাহা নহে। প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয়, ভাল করিয়া দেখিতে শেখাই, বিজ্ঞান-সাধকের মুখ্য সম্বল। বিজ্ঞানপাণ্ডিত্যে যাহারা যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহারা যে বিদ্যালয়ে অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা দিয়া বড় হইয়াছেন তাহা নহে।

আমাদের দেশে আমরা যদি ষথার্থ বিজ্ঞানবীরদের অভ্যুদয় দেখিতে চাই, তবে শিক্ষার আদর্শ দুর্লভ ও পরীক্ষা কঠিন করিলেই সে ফল পাইব না। তাহার অন্য দেশে বিজ্ঞানের সাধারণ ধারণা ব্যাপ্ত হওয়া চাই, এবং ছাত্ররা বাহাতে পুঁথিগতবিদ্যার শুষ্ককাঠিন্যের মধ্যে বন্ধ না থাকিয়া, প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করিবার অন্য বিজ্ঞানদৃষ্টিচালনার চর্চা করিতে পারে, তাহার উপায় করিতে হইবে।

একপ শিক্ষা ভাগ্যদোষে দুর্লভ হইতে পারে, কিন্তু দুর্লভ নহে।

[১৩১২]

ପରିଚିତ୍ତେ •

54 Parliament Street

London, S. W.

16 July 1901

My dear Robi,

I was glad to learn that some of our countrymen have been thinking of making arrangements to make Dr. Bose independent of the Government appointment which he holds, so that he may pursue his researches all his life to the credit and honour of our country. The idea is an excellent one, because the chance we have now will probably never return within a generation, if we lose it now. Dr. Bose has read startling papers and disclosed startling discoveries at the Royal Institution & the Royal Society, he has awakened the interest of the civilised and scientific world, and he is on the eve of revealing farther truths which will give our countrymen a position and a name. But to pursue his work to a successful termination against all opposition is a work of years, and during these years we must support him and keep him in his work. The Indian Govt. can't do this and won't do this. They have refused his prayer for extention, and you know as well as I, they will not be sorry to see him withdrawn from his brilliant labours into the drudgery and obscurity of Calcutta. If ever there was an occasion for us to fight for our fame and honour,—this is the occasion !

I am sure you will be able to guess, as well as I,

what his expenses here are likely to be. He has to keep an assistant on about £ 200 a year, his instruments and appliances will cost about as much, and living with his wife in this country & travelling from place to place, —to Germany or America sometimes,— will cost at least £ 600 a year.

Thus a thousand pounds a year,—(or 15,000 Rupees) is what is absolutely necessary for him ;— I believe Sir M. Bhownagree gets about three times as much for his political work ! Will our country fail to give our only scientist this support when so much is at stake, when a chance now lost may never come back to us ?

From past bitter experience, I would not depend on annual collections and contributions. As a friend, I would not advise Dr. Bose to give up his appointment,—miserable as it is,— depending on annual remittances. We must make him independent once for all, so that there may be no doubt as to his future, so that he may devote his whole time and energies to his work without any uncertainty in his prospects. I do not know how much money an Insurance Office would require in order to grant Dr. Bose an annuity of Rs 15,000 a year for the rest of his life. I imagine they would want two lakhs or so ;— and unless we can find this sum and pay it into an Insurance Office to assure an annuity to Dr Bose during the rest of his life I see no other way of making him independent of that drudgery, humiliation and eternal worry which are certain to ruin his chances and our country's

prospects for ever.

The suggestions I have made in this letter are all my own. I feel strongly in the matter, and have thought it out, and made my own calculations. And I feel also that if we do not help ourselves in this matter, if we have not patriotism enough to make our one scientist independent for life and devoted to the cause of science and of our country, we shall lose our chance for ever and deserve to lose it. I know, Robi, you feel as strongly as I do ; you have immense influence in the country ; and I appeal therefore to you to try privately to raise this money & invest it in the manner proposed for the honour & the glory of our country.

Yours Ever Sincerely
Ramesh Dutt

Bose Para Lane
Baghbazar.
Calcutta. Friday
June 16, 1899.

My dear Mr. Tagore,

You have heard long ago, I fancy, that I must go to England this summer & that therefore I shall not be able to accept that fascinating invitation to your river-house, towards which I had been steadily pressing for so long ! I was within a day or two of

writing to you that, if you wd. allow me, I wd. come to Mrs. Tagore & yourself as soon as the Swami had started. Little did I think that before I shd. have written, my own fate wd. have been reversed !

I am really not at all happy to be going away from India— even for a little while— and long talks with yourself on all sorts of delightful things are amongst the many disappointments of the change of plan. Besides, I really wanted to add a new friend to those with which India has already blessed me, and you are so dear to my friend Dr. Bose, that I cd. not help hoping you sd. be my friend too !

But I hope that the greatest ends may be better served by my going than by my staying— & if that is so I know that you will feel with me that personal considerations simply do not count.

My Au Revoir includes a great many wishes for your good health & happiness until we meet again. Please give my kind regards and respects to Mrs. Tagore & my love to your charming children.

And believe me dear Mr. Tagore

Sincerely Yours,
Nivedita

9, Elysium Row,
Calcutta.
April 18th, 1903.

Dear Mr. Tagore,

You asked me to write you an account of the actual discoveries which Prof. Bose had made, & of the difficulties under which he had laboured in making them. But I imagine that you only want the kind of account that I can give you in a letter. I imagine, too, that in writing you a letter I am making a more or less confidential communication, so that I need not fear to use names occasionally knowing that I shall not be quoted in any public way.

When I came to Calcutta I first knew Prof. & Mrs. Bose, in the end of the year 1898. I was horrified to find the way in which a great worker could be subjected to continuous annoyances & petty difficulties-- with the evident earnest desire of those who were about him to end his distinction which was personally galling to them. The college-routine was made as arduous as possible for him, so that he could not have the time he needed for investigation. And every little thing that happened was made an excuse for irritating correspondence & flagrant misrepresentation.

These things may seem small in your eyes, but if you have the least idea (as you must have) of how impossible it is to do work requiring great insight or great & sustained emotion, unless there is freedom & peace, you will know how wonderful it is that

our friend should have continued to work on & achieve, in spite of his surroundings at that time. If one could also realise, in a country situated as India is, the sacrifices that a free people, like the Americans or English, the French or the Germans wd. be willing to make in order to obtain such a worker as Dr. Bose—of their own blood—one wd. stand amazed, as I did, at the spectacle of a great scientific man working alone as he was. I had come, of course, from Europe, where Prof. Bose's name was well known as the discoverer of the Etheric Waves that penetrate minerals. His work was belated in reaching Europe. It was announced along with the Röntgen rays, & obviously went deeper—since that form of light was deterred by bone & metal, while his penetrated these substances. Already, early in the year 1895, I believe, he had demonstrated the existence of these invisible rays at the Town Hall, Calcutta—and it was not till two years after he had thus made the essential discovery—as some of the Italian scientific papers were the first to point out,—that Marconi began to work out & apply it on the large scale.

Of course you understand that men of the inventor & discoverer type—men like Marconi, Tesla, Mascine, & so on,—rank in the world of science far below the investigator, the man of Sannyasin mind like Dr. Bose, who pursues knowledge for its own sake. Even Prof. ... jeopardises his great reputation, & certainly minimises his historic importance by taking patents & becoming involved

in commercial schemes. But Dr. Bose not only demonstrated the existence of these particular etheric waves. He proved himself as great in constructive ability as in research itself, & his instrument, popularly known as the Artificial Eye, was considered a marvel of compactness & simplicity. Prince Kropotkin was talking of how Prof. Thomson the week before at the Royal Institn. had exhibited an apparatus some yards long, to act as a polariser of light—and Prof. Bose, the following week, to do the same thing, simply took up a book (it happened to be a Bradshaw) & showed how the rays wd. pass one way & not the other. "I said to myself", said Prince K, "that this was the simplicity of the highest genius." But of course Prof. Bose was only able to perform this great simplification of methods because his theory was so much more sound than those of his English & German competitors in this field.

He began to publish Papers through the Royal Society in, I think, the year 1894. From that date, working under all his difficulties as he was, he published 2 or 3 every year till he left for Paris in 1900. (One Paper in 2 years is considered a good record for a life that is surrounded by advantages.) And Prof. Bose's work was in each case completely original & in a special sense accurate & exhaustive. He was like a man haunted by the fear that if he failed at any point his people wd. be held to have no right to education. "Everyone knows that we have brilliant imagination" he told me, when he was fighting against death in

London in 1900, & still struggling to make a record of his latest discoveries, "but I have to prove that we have accuracy & dogged persistence besides." He did prove it. Lord Rayleigh & Sir Wm. Crookes both told him that while the perfection of his methods was unquestioned, no one had yet been able, in 1901, to repeat his experiments of 1895-6! His manipulation was beyond rivalry.

The work of '94 to 1900 had consisted of some dozen or more separate investigations on invisible light-polarisation. The existence of a dark cross— &c. &c.— these were valuable pieces of work, full of suggestions to some of the advanced workers in Europe, who were not slow to take hints from his instruments & theories. It was apparently in the year 1900, however, that all these separated tasks began to combine in a series of great generalisations which have not yet been given to the world in their completeness, and which are to prove of wider & wider philosophic interest as time goes on.

I allude to the great Theory of Stress & Strain— which, if only he can command time & strength to work it out in publication, will be held as epoch-making as Newton's Law of Gravitation— a tribute worthy of India's contributing to world-knowledge.

It is the minor applications of this generalisation that have hitherto attracted so much attention— one of the first discoveries to which it led was that of the Binocular Alternation of Vision.

Another was of a more practical (i.e. commercial)

nature— leading to the improvement of the coherer in Wireless Signalling, & Lodge's collaborator, Dr. Muirhead, freely confessed that in the development of the system lately adopted for India, they had owed most important suggestions to Dr. Bose's Papers & conversation. The largest applications of the theory are however purely scientific. It gives an immediate clue to whole classes of apparent anomalies in photography, in chemistry, & in Molecular Physics generally. Amongst other things it led to the immediate discovery & formulation of the phenomenon known as Vegetable Response. In realms like these it has disproved the contentions of many would-be theorists of a smaller scale, & there is therefore a strong opposition to Prof. Bose's work amongst those physiologists who have tried to prove the unique character of life. This opposition is of course perfectly normal. It is usually in fighting against it, that a scientific man proves his greatness, & conquers those who disagree with him. But in this case, there is a strong race-feeling of jealousy to combine with the natural & necessary scientific opposition, & I have no doubt that it was through the efforts of these men at the India Office that the opportunity was taken to refuse Dr. Bose any extension of deputation, at the moment when his opinions began to be known, & before his book had yet come out.

It was the very man of whom I have this suspicion who in November, believing Prof. Bose to be in India, (to have been forced back to India indeed) stole some

of his results & published them as his own. Fortunately Prof. Bose's position in the world of Science was too well assured for him to touch it, & though he has been able to organise a small party, we may regard it as easily discredited if the work can only be continued in an adequate way.

The book on Response in Living & Non-Living is now triumphant. I want a far greater work, such as only this Indian man of science is capable of writing, on Molecular Physics,— a book in which that same great Indian mind that surveyed all human knowledge in the era of the Upanishads & pronounced it one, shall again survey the vast accumulations of physical phenomena which the 19th Century has observed & collected, & demonstrated to the empirical, machine-worshipping, gold-seeking mind of the West that these also are One— appearing as Many.

But I recognise that under present conditions one cannot even ask for the beginning of such a work. The petty daily persecution where perfect sympathy & every facility are absolutely necessary : the distracting routine of a paid servant who is never allowed to feel independent of daily bread, the constant difficulties thrown in the way by minor officials who have power enough to impede, but not enough to be raised above jealousy,— are these things not enough ? And then we ask him to undertake great work— but what are we willing to do for him ? Can we supply him with companions in learning who will stimulate & encourage the arduous work ? Does it trouble us that he

is the one man in India doing work of the first rank, & that to this day he is paid less than any Englishman, even the commonest, wd. receive in his place'?

Dr. Garnett of London told me of the splendour of the great College of Sciences at Vienna, and how, when he exclaimed as to its cost, the government representative replied proudly that if one scientific man shd. be produced in a century there, it wd. be more than worth their while. Which of us feels like this?

Ah India ! India ! Can you not give enough freedom to one of the greatest of your sons to enable him,—not to sit at ease, but—to go out & fight your battles where the fire is hottest & the labour most intense, and the contest raging thickest? And if you cannot do this—if you cannot even bless your own child & send him out equipped, then,—is it worthwhile that the doom should be averted, & the hand of ruin stayed, from this unhappy & so-beloved land?

This is all very inadequate, dear Mr. Tagore. But I have used many sheets of note-paper I see— & I must draw my letter to a close.

Ever yours faithfully
Nivedita
of Ramakrishna-V.

ঐহপরিচয়

ঐগদীশচন্দ্র ১৯০০ সালে লণ্ডন-প্রবাসকালে রবীন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন (২ নভেম্বর ১৯০০) —

‘তিন বৎসর পূর্বে আমি তোমার নিকট একপ্রকার অপরিচিত ছিলাম। তুমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ডাকিলে। তার পর একটি একটি করিয়া তোমাদের অনেকের স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ হইলাম। তোমাদের উৎসাহধ্বনিতে মাতৃস্বর শুনিলাম।’^১

রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) ও ঐগদীশচন্দ্র (১৮৫৮-১৯৩৭) সৌহার্দ্যের বিষয় আলাচনাপ্রসঙ্গে ঐগদীশচন্দ্রের জীবনীকার প্যাট্রিক গেডিস লিখিয়াছেন^২ —

Turning now to Bose's friendships among men, foremost and greatest... has been that with the poet Rabindranath Tagore. On the occasion of Bose's return [April, 1897] from his successful visit to Europe in 1896, Tagore called to congratulate him and, not finding him at home, left on his work-table a great blossom of magnolia, as a fitting and characteristic message of regard. Since that time the two have been increasingly together, each complementing and thereby widening and deepening the other's characteristic outlook on nature and life .

রবীন্দ্র-ঐগদীশ-সৌহার্দ্যের এই সূচনাকালের কোনো চিহ্ন পদ্মাকারে

১ প্রবাসী, আষাঢ় ১৯০০, পৃ ৪১০

২ Patrick Geddes, *The Life and Work of Sir Jagadis C. Bose* (1920), p. 222

৩ ‘১৮৯৭ সালের এপ্রিল মাসে বঙ্গ মহাশয় ভারতে প্রত্যাপ্ত হন।’ — অগদানন্দ রায়, ‘বিজ্ঞানচার্য্য ঐগদীশচন্দ্রের আদিকার’ [১৯১৯], পৃ ৫

রক্ষিত হয় নাই; একমাত্র নিদর্শন 'কল্পনা' গ্রন্থে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের 'জগদীশচন্দ্র বসু' ('বিজ্ঞানলক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিমমন্দিরে') কবিতা। বর্তমান গ্রন্থের সূচনায় পুনর্মুদ্রিত এই কবিতাটি মাঘ ১৩০৪ সংখ্যা প্রদীপ পত্র 'অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতি' এই শিরোনামে প্রকাশিত হয়; রচনাশেষে তারিখ আছে ৪ঠা শ্রাবণ ১৩০৪ (১২ জুলাই ১৮২৭)।

১৮২২ সাল হইতে উভয়েরই অনেকগুলি পত্র রক্ষা পাইয়াছে; তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পত্রগুলি এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইল। জগদীশচন্দ্রের অধিকাংশ চিঠি প্রবাসী পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল; অপ্রকাশিত কয়েকখানি পত্র রবীন্দ্রসদনে আছে। উভয় পত্রগুচ্ছের সংখ্যার তুলনা করিয়া সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি চিঠি রক্ষা পায় নাই বা আবিষ্কৃত হয় নাই।

প্রবাসীতে জগদীশচন্দ্রের পত্রাবলীর প্রকাশ সমাপ্ত হইলে রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী প্রকাশিত হয়।^১

জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর, তাঁহাকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের আরো কয়েকখানি চিঠি প্রবাসী পত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল।^২ এইসকল পত্র 'চিঠিপত্র' গ্রন্থের বর্তমান খণ্ডে সংকলিত হইয়াছে। জগদীশচন্দ্রের সহধর্মিণী অবলা বসু মহোদয়াকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের সাতখানি চিঠিও এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইল; উহার প্রথম ছয়খানি ইতিপূর্বে প্রবাসীতে প্রকাশিত।^৩ রবীন্দ্রনাথকে লিখিত অবলা বসু মহোদয়ার চিঠিপত্রও প্রবাসীতে মুদ্রিত হয়।^৪

১ প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ-পৌষ, ১৩৩৩

২ প্রবাসী, মাঘ-চৈত্র, ১৩৩৩

৩ প্রবাসী, কাঙ্কন ১৩৪৪ - আষাঢ় ১৩৪৫

৪ প্রবাসী, চৈত্র ১৩৪৪, শ্রাবণ ১৩৪৫

৫ প্রবাসী, কাঠিক, অগ্রহায়ণ ১৩৩৩, বৈশাখ ১৩৩৪

পত্র ১। ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬। 'কতকগুলি পৌরাণিক গল্প আমার মস্তিষ্কের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে।'

এই প্রসঙ্গে দৃষ্টব্য 'কথা' (প্রকাশ ১ মাঘ ১৩০৬— ইহার অনেক-গুলি কবিতা ১৩০৬ সালের আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণের মধ্যে রচিত হয়) এবং 'কাহিনী' (প্রকাশ ২৪ ফাল্গুন ১৩০৬)। কথা কাব্য অগদীশচন্দ্রকে উৎসর্গীকৃত।

তুলনীয় অগদীশচন্দ্রের পত্র (২০ মে ১৮৯৯, ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬)—

'আপনার পৌরাণিক কবিতাগুলি সন্দেশে স্মরণ হইয়াছে। এগুলি কবে সম্পূর্ণ করিবেন? মহাভারত হইতে আরও অনেকগুলি লিখিবেন।' >

অগদীশচন্দ্র কর্ণ-চরিত্রের একান্ত অমুরগী ছিলেন। এই পয়েটে তিনি লিখিতেছেন—

'একবার কর্ণ সপক্ষে লিখিতে অমুরোধ করিয়াছিলাম। ভীষ্মের দেবচরিত্রে আমরা অভিভূত হই, কিন্তু কর্ণের দোষগুণমিশ্রিত অপরিপূর্ণ জীবনের সহিত আমাদের অনেকটা মহামুভূতি হয়। দটনাচক্রে যাহার জীবন পূর্ণ হইতে পারে নাই, যাহার জীবনে ক্রুদ্রতা ও মহৎভাবের সংগ্রাম সর্বদা প্রজ্জ্বলিত ছিল, যে এক এক সময়ে মামুস হইয়াও দেবতা

১ 'দালাকালে এবং পরবর্তী জীবনে কোন কোন দটে মনে ছাপ রাখিয়া গিয়াছে' এই প্রশ্নের উত্তরে অগদীশচন্দ্র ৭ ২ ৩৩ তারিখ লিখিয়াছিলেন—

'দালাকালে মহাভারত পাঠ করিয়াই জীবনের আদর্শ উপলক্ষি করিয়াছিলাম। যে দ্বিতীয়াধি মহাভারতে প্রচারিত হইয়াছিল সেই নীতি যেন দর্শমান কালেও জীবনযুদ্ধে প্রচারিত হয়। তদনুসারে যদি কেহ কোন দৃষ্ট কার্যে জীবন উৎসর্গ করিতে উন্মুগ্ন হন, তিনি যেন ফলাফল-নিরূপক হইতে পারেন। তাহা হইলে বিশ্বাস-নয়নে কোনদিন সোপিত পাউলেন যে, বারবার পরাজিত হইয়া যে পরাঘুণ হয় নাই, সেই একদিন বিজয়ী হইবে।'— ২৩শী, আশ্বিন ১৩০৬

পত্র ২, ৩

হইতে পারিত, এবং যাহার পরাজয় জয় অপেক্ষাও মহত্তর, তাহার দিকে মন সহজেই আকৃষ্ট হয়।’

এই বৎসরেই রবীন্দ্রনাথ “কর্ণ-কুন্তী-সংবাদ” রচনা করেন (১৫ ফাল্গুন ১৩০৬)।

পত্র ২। ‘মেই অর্ধশত গল্পটি...আস্তে আস্তে লিখি’

এই গল্পটি ‘চোখের বালি’ হইলেও হইতে পারে। ২৬ শ্রাবণ ১৩০৭ তারিখে প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রে ‘চোখের বালি’র (‘বিনোদিনী’র) যেরূপ উল্লেখ দেখা যায় তাহাতে মনে হয় ইহা দীর্ঘকাল ধরিয়া ক্রমশ লিখিত হইয়াছিল। অপন পক্ষে ‘চিরকুমার সভা’ও একপে লিখিত ও ভারতী পত্রে ১৩০৭ বৈশাখ হইতে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়, তবে এই ক্ষেত্রে ‘মাসিক পত্রের তাড়া’ যথেষ্টই ছিল।

পত্র ৩। ১০ আষাঢ় ১৩০৬ (২৪ জুন ১৮৯৯)। ‘আপনার পত্রখানি পড়িয়া আমি বিশেষ সাহুনা ও আনন্দ লাভ করিয়াছি।’

দ্রষ্টব্য জগদীশচন্দ্রের পত্র, ২১ জুন ১৮৯৯ (৭ আষাঢ় ১৩০৬)—

‘আপনার পত্র পাঠলাম। আমাকে বন্ধুভাবে স্মরণ করিয়াছেন ইহাতে অতিশয় সুখী হইয়াছি। আপনার সুখ ও উৎকৃষ্টতার সময় সহভাগী করিয়া যেরূপ সুখী করেন, অল্প সময়ে স্মরণ করিলে বন্ধুতাব নিদর্শন দেখি।

‘আপনি যে গল্পের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা দেখিয়া অবাক হইয়াছি। ইতিপূর্বেই সম্পাদককে এতৎসম্বন্ধে আমার কিছু মন্তব্য লিখিব স্থির করিয়াছিলাম। তবে একপ বিষয়ে একান্ত উপেক্ষা করাই

১ প্রিয়নাথ সেন, প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি, পৃ ২৮৩

সমুচিত কিনা মনে করিয়া ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। আমি লিখিব কিন্তু অধিক importance দিতে চাহি না। আপনি অনেক উচ্চ আছেন; এসব কর্মে আপনাকে স্পর্শ করিতে না।

‘আমি সম্পূর্ণ বৃত্তিতে পারি, বাহ্যিক কাযে ততী তাঁহারা অনেকের ভালবাসা দ্বারা উন্নীত না হইলে কাযা সমাধা করিতে পারেন না। ঈশ্বরানুগ্রহে আপনার ভক্তের অভাব নাই। যদি কেহ আপনার কবিতা হইতে বঞ্চিত হন, তাঁহাদিগকে করুণার পাদ মনে করি। আর বাহ্যিক আপনার লেখা হইতে জীবন নবীন ও পূর্ণতর কবিতা পারিয়াছেন, তাঁহাদের আশীর্ষক কি আপনার নিকট পৌঁছনা? আমি ত কখন কখন আপনার দাক্ষিণ্য পদার্থ ভুলিয়া যাই। বৃহত্তর জীবন আপনার জীবনকে পরাস্ত ও অধিকার করিয়াছে।’

এই প্রসঙ্গে তুলনীয়, প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র (৭ আশ্বিন ১৩০৬, ২১ জুন ১৮৯৯)—

‘কৃষ্ণ আত্মীয়ের পক্ষে সংবাদ পাঠানাম যে সাহিত্যের কোন গল্পে আমাকে অত্যন্ত কুসমিত আক্রমণ কর হইয়াছে। এ সম্বন্ধে যদি তোমার কোন বন্ধুত্ব্য করিবার থাকে ত করিব।’

প্রিয়নাথ সেন ও জগদীশচন্দ্রের উত্তর পাঠিয়া, রবীন্দ্রনাথ যেদিন জগদীশচন্দ্রকে আলোচ্য চিঠিখানি লিখিয়াছেন সেদিন (১০ আশ্বিন ১৩০৬) প্রিয়নাথ সেনকেও লিখিতেছেন—

১ রবীন্দ্রনাথ যে পক্ষে ‘গল্পের কল’ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ্য হইয়াছে। ৪ আশ্বিন ১৩০৬ তারিখের পত্রটি এই গল্পের প্রসঙ্গ ছিল, প্রকাশিত দুইপত্রের প্রসঙ্গ বঞ্চিত হইয়াছে, একপত্র হইতে পারে। মূল পত্রখানি এ ক্ষেত্রে পাঠ্য হইয়াছে না।

২ প্রিয়নাথ সেন, প্রিয়-পুস্তকালয়, পৃ ২৭০

‘আমি সাহিত্য পড়ি নাই। কিন্তু তুমি যে নিম্নক লেখকের প্রতি এতটা ঘৃণা অশুভব করিয়াছ তাহাতে আমি সাহুনা পাইলাম। তোমর আমার হইয়া রাগ করিলে, মনে হয়, আমার আন রাগ করিবার বা দুঃখ পাইবার দরকার করে না— আমি শাস্তিলাভ করি।— মন শাস্ত না থাকিলে আমি কোন কাজ করিতে পারি না— সেইজন্য জীবনকে নিষ্ফলতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য সকল প্রকার ক্ষোভের কারণ হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করি— কিন্তু সংসারের কাঁটার উপবে পানা ফেলিলেও কাঁটা আপনি আসিয়া পায়ে কোটে, — দুঃখ বেদনাব পূর্ণ অংশ হইতে বঞ্চিত হইবার উপায় নাই— আছে নিজেব মনে— তাহার সাধনা মাঝে মাঝে অবলম্বন করি, কিন্তু তাহার সিদ্ধি বহুদূরে।’^১

জগদীশচন্দ্রের চিঠি উল্লেখ করিয়া ঐ পত্রেই লিখিতেছেন—

‘ডাক্তার জগদীশ বসু লেখকের কাপুকমতার প্রতি ঘৃণা এবং আমার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিয়া একখানি সুন্দর পত্র লিখিয়াছেন— তোমার এবং তাহার এই পত্রে আমি মনেব মনে বিশেষ বল লাভ করিয়াছি, — বন্ধুহৃদয়ের সমবেদনা আমার পক্ষে বৃষ্টিদারাব মত— তাহা আমার সফলতা লাভেব এক প্রধান সহায়।’

পত্র ৩। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমারের সহিত ববৌন্দ্রনাথের বিশেষ মোহাদ্য ছিল, ইহার ইতিহাসচর্চায় ববৌন্দ্রনাথ যে প্রেরণা সঞ্চার করেন ‘ইতিহাস’ গ্রন্থে তাহার প্রভূত নিদর্শন সংকলিত আছে। অক্ষয়কুমার বেশমণিলে বিশেষমুগ্ধ এবং দেশে ঐ শিল্পের প্রতিষ্ঠাকল্পে উদ্যোগী ছিলেন—

১ প্রিয়নাথ .সন, প্রিয়-পুষ্পাঙ্কলি, পৃ ২৭৩-৭৫

রবীন্দ্রনাথের সহিত এ বিষয়েও তাঁহার আলোচনা চলিত।^১ অক্ষয়কুমার ব্রাহ্মসাহী শিল্পবিদ্যালয়ের একজন প্রধান উন্মোচনা ছিলেন, এই বিদ্যালয় হইতে বেশমের কাপড় কিনিয়া রবীন্দ্রনাথ নিজে ব্যবহার করিতেন, বন্ধুদেরও উপহার দিতেন— ‘বন্ধুদের নিকট আমার এই সকল বস্ত্র উপহার কেবল আমার উপহার নহে তাহা স্বদেশের উপহার।’^২

রবীন্দ্রনাথও এই সময় পল্লীর উন্নতিকল্পে নানা কল্পনাও পরীক্ষায় উৎসুক, সেই সূত্রেই ‘বেশমের গুটি’র অভ্যাগম।

পত্র ৩। লরেন্স।

শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের পুত্রকন্যাদের গৃহশিক্ষক^৩, পরে শাস্ত্রী নিকেতনেও অধ্যাপক ছিলেন। ‘এক পাগলা মেজাজের চালচলোশীল ইংরেজ শিক্ষক হঠাৎ গেল জুটে। তার পড়াবার কাহ্নদা খুবই ভালো, আরো ভালো এই যে কাজে ফাঁকি দেওয়া তার দাতে ছিল না।’^৪

বেশমের চাষ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরও বলেন—

‘লরেন্সকে পেয়ে বসল বেশমের চাষের নেশায়। শিলাইদহের

১ রবীন্দ্রনাথকে লিখিত অক্ষয়কুমারের পত্র, ৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৫৩, পৃ ২৫৭

২ মহিমচন্দ্র ঠাকুরকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র, ৩০ চৈত্র ১৩০৫। রবীন্দ্রশ্রুতি পূর্বাশা [১৩৪৮], পৃ ১০৭

৩ ‘আমাদের শাস্ত্রীনিকেতনের সোল্ডিয়ার বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রকে পড়াইব, সেটজন্য লরেন্সকে অত্যন্ত উঃপের সঙ্গে দিয়ার দিতে কইতেছে। যদি তোমাদের আগদতলার ঠাকুরদের স্কুলে তাহাকে ইংরেজি অধ্যাপক নিযুক্ত কর তবে তোমাদেরও উপকার তাহারও উপকার। একপ সুযোগ আর পাউবে না। লরেন্স পড়াইবার বিজ্ঞা যেমন জানে এমন অল্প লোককেই দেখিরাছি। ও আমাকে এখনও ছাড়িত চায় না কিছু উপায় দেখি না। - ১৮ই আশ্ব ১৩০৮’ — মহিমচন্দ্র ঠাকুরকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র, রবীন্দ্রশ্রুতি পূর্বাশা, পৃ ১০৮

৪ রবীন্দ্রনাথ, আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, ৭ পৌষ ১৩৫৮ সংস্করণ, পৃ ৪০

নিকটবর্তী কুমারখালি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে রেশম-ব্যবসায়ের একটা প্রধান আড্ডা ছিল। সেখানকার রেশমের বিশিষ্টতা খ্যাতিলাভ করেছিল বিদেশী হাতে। সেখানে ছিল রেশমের মস্ত বড়ো কুঠি। একদা রেশমের তাঁত বন্ধ হল সমস্ত বাংলা দেশে, পূর্বস্বতির স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে কুঠি রইল শূন্য পড়ে। যখন পিতৃঋণের প্রকাণ্ড বোঝা আমার পিতার সংসার চেপে ধরল বোধ করি তারই কোনো এক সময়ে তিনি রেলওয়ে কোম্পানিকে এই কুঠি বিক্রি করেন।...

‘লরেন্সের কানে গেল রেশমের সেই ইতিবৃত্ত। গুর মনে লাগল, আর একবার সেই চেষ্টার প্রবর্তন করলে ফল পাওয়া যেতে পারে; ...চিঠি লিখে যথারীতি বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে সে খবর আনালে। কীটদের আহাৰ জোগাবার জন্তে প্রয়োজন ভেরেণ্ডা গাছের। তাড়াতাড়ি জন্মানো গেল কিছু গাছ কিন্তু লরেন্সের সবুর সইল না। রাজশাহি থেকে গুটি আনিয়ে পালনে প্রবৃত্ত হল অচিরাৎ। প্রথমত বিশেষজ্ঞদের কথাকে বেদবাক্য বলে মানলে না, নিজের মতে নতুন পরীক্ষা করতে করতে চলল। কীটগুলোর ক্ষুদে ক্ষুদে মুখ, ক্ষুদে ক্ষুদে গ্রাস, কিন্তু ক্ষুধার অবমান নেই। তাদের বংশবৃদ্ধি হতে লাগল ঋণের পরিমিত আয়োজনকে লঙ্ঘন করে। গাডি করে দূর দূর থেকে অনবরত পাতার জোগান চলল। লরেন্সের বিছানাপত্র, তার চৌকি টেবিল, খাতা বই, তার টুপি পকেট কোঠা—সর্বত্রই হল গুটির জনতা। তার ঘর দুর্গম হয়ে উঠল দুর্গন্ধের ঘন আবেষ্টনে। প্রচুর বায় ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ের পর মাল জমল বিস্তর, বিশেষজ্ঞেরা বললেন অতি উৎকৃষ্ট, এ জাতের রেশমের এমন সাদা রঙ হয় না। প্রত্যক্ষ দেখতে পাওয়া গেল সফলতার রূপ— কেবল একটুখানি ক্রটি রয়ে গেল। লরেন্স বাজার ঘাটাই করে

জানলে তখনকার দিনে এ মালের কাটতি অল্প, তার দাম সামান্য। বন্ধ হল ভেরেণ্ডা পাতার অনবরত গাড়ি-চলাচল, অনেকদিন পড়ে রইল ছালাভরা গুটিগুলো; তার পর তাদের কী ঘটল তার কোনো হিসেব আঁক কোথাও নেই। সেদিন বাংলাদেশে এই গুটিগুলোর উৎপত্তি হল অসময়ে।”

দেশীয় শিল্পের পুনঃপ্রবর্তনের এই চেষ্টায় “প্রচুর ব্যয় ও অক্লান্ত অধ্যবসায়” রবীন্দ্রনাথের পক্ষ হইতে কী পরিমাণ যুক্ত হইয়াছিল তাহার কথা এই বিবরণে উল্লিখিত হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্রের ২৫ এপ্রিল ১৮৯৯ তারিখের পত্রে দেখা যায়, তিনিও, সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের উৎসাহেই, এই সময় বেশমের কীট-পালনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

পত্র ৩। ‘চাম-বাসের কাজ।’

এই পত্র লিপিবদ্ধ কিছুকাল পূর্ব হইতে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে পৈতৃক জমিদারিতে বাস করিতেছিলেন। ইহারও পূর্বে, জমিদারি-পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়া, ‘দুঃখপীড়িত অলবিখ্যাসপরায়া অল্পবয়স্ক প্রজাদের’ ‘যেন আমার একটি দেশজোড়া বৃহৎ পরিবারের লোক’ বলিয়া তিনি অনুভব করিতেছিলেন, ‘এই সমস্ত নিঃসহায় নিকৃপায় নিতাস্থনিঃস্ব-পর সর্বল চামাবাসীদের’ অক্ষয় অবস্থা তাঁহার মনকে আন্দোলিত করিতেছিল।’ — রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল ধরিয়া বারংবার বিফলকাম

১ পূর্বোক্ত — অক্ষয়ের কল ও বিকাশ, পৃ ৪১-৪২।

২ ছিন্নপত্র গ্রন্থ ২১ অগস্ট ১৮৯৩ তারিখের পত্র। অপিচ ১০ মে ১৮৯৩ তারিখের পত্রে উল্লেখ—

‘আমার এই দরিদ্র চামী প্রজাগুলোক দেশে আমার স্মৃতি মারা করে, এরা যেন বিধাতার শিশুসন্তানের মত নিকৃপায়। তিনি এদের দুঃখ নিঃস্বয় হাতে কিছু তুলে না

হইয়াও পরীক্ষকের বে উদ্‌যোগ ও আয়োজন করিয়াছেন আলোচ্য সময়ে 'চাষ-বাসের কাজ' তাহার একরূপ সূচনা বলা বাইতে পারে—

'শিলাইদহে কুঠিবাড়ির চার দিকে যে জমি ছিল প্রজাদের মধ্যে নতুন ফসল প্রচারের উদ্দেশ্যে সেখানে নানা পরীক্ষায় লেগেছিলাম। এই পরীক্ষাব্যাপারে সরকারি কৃষিবিভাগের বিশেষজ্ঞদের সহায়তা অত্যধিক পরিমাণেই মিলেছিল। তাঁদের আদিষ্ট উপাদানের তালিকা দেখে চিচেস্টরে যারা এগ্রিকালচারাল্ কলেজে পাশ করে নি এমন-সব চাষিরা হেসেছিল; তাদেরই হানিটা টিকেছিল শেষ পর্যন্ত। মরার লক্ষণ আসন্ন হলেও শ্রদ্ধাবান রোগীরা যেমন করে চিকিৎসকের সমস্ত উপদেশ অক্ষুণ্ণ রেখে পালন করে, পঞ্চাশ বিঘে জমিতে আলু চাষের পরীক্ষায় সরকারি কৃষিতত্ত্বপ্রবীণদের নির্দেশ সেইরকম একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করেছি। তাঁরাও ... পরিদর্শনকার্ষে সর্বদাই যাতায়াত করেছেন। তারই বহব্যয়সাধ্য ব্যর্থতার প্রহসন নিয়ে বন্ধুবর অগদীশচন্দ্র আজও প্রায় মাঝে মাঝে হেসে থাকেন।'

পত্র ৩। বিজ্ঞান্দ্রলালবাবু— বিজ্ঞান্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের স্নহৃৎশ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন; ১৩০৪ সালে (১৮২৭) তিনি তাঁহার 'বিবহ' নাটিকা 'কবির শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের কবকমলে' এইভাবে উৎসর্গ করেন— 'বন্ধুবর! আপনি আমার রহস্যগীতির

দিলে এদের আর গতি নেই।... সোশিয়ালিষ্টরা যে সমস্ত পৃথিবীময় ধনবিত্তাগ করে দেয় সেটা সম্ভব কি অসম্ভব ঠিক জানি নে—বদি একেবারেই অসম্ভব হয় তাহলে বিধির বিধান বড় মিষ্টর, মানুষ তারি হতভাগ্য। কেমনা পৃথিবীতে বদি দুঃখ থাকে তো থাকুক তোর মধ্যে এতটুকু একটু ছিন্ন একটু সম্ভাবনা রেখে দেওয়া উচিত যাতে সেই দুঃখমোচনের জন্যে মানুষের উন্নত অংশ অবিশ্রাম চেষ্টা করতে পারে, একটা আশা পোষণ করতে পারে।'

১ পূর্বোক্ত— আজকের রূপ ও বিকাশ, পৃ ৩৯-৪০

পক্ষপাতী। তাই রহস্যগীতিপূর্ণ এই নাটিকাখানি আপনায় করে অর্পিত হইল'। রবীন্দ্রনাথ এই কালে ষ্টিভেন্সলালের নিয়োকৃত কাব্যগ্রন্থগুলির প্রশংসা রচনা করেন— আর্ষগাথা, দ্বিতীয় ভাগ (১৮৯৩), ১৩০১ অগ্রহায়ণ সাধনা পত্রে; আবাঢ়ে (১৮৯৯), ১৩০৫ অগ্রহায়ণ ভারতী পত্রে; এবং মস্ত্র (১৯০২), ১৩০৯ কার্তিক বহুদর্শন পত্রে। এই রচনাগুলি রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে মুদ্রিত আছে। রবীন্দ্রনাথ সাধনা-সম্পাদকরূপে 'সাময়িক সাহিত্য' বিভাগেও, মাসিক পত্রে প্রকাশিত ষ্টিভেন্সলালের কোনো কোনো রচনার ভূয়সী প্রশংসা করেন। উভয়ের মধ্যে বিরোধের প্রকাশ্য সূচনা 'বহুভাষার লেখক' (১৩১১) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের আত্মপরিচয় প্রকাশের পর। এই সৌহৃদ্য ও বিচ্ছেদের বিবরণ দেবকুমার রায় চৌধুরী -প্রণীত ষ্টিভেন্সলাল গ্রন্থে ও ত্রিপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় -লিখিত রবীন্দ্রজীবনী গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

'শব্দকোষ পর্য্যবেক্ষণ' প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ষ্টিভেন্সলাল বিলাত হইতে কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া আসিয়াছিলেন।

পত্র ৪। এই পত্রে সাল লিখিত নাই, তারিখ ও মাস (১ আশ্বিন) উল্লিখিত আছে; ১৩০৭ সালে লিখিত বলিয়া অনুমিত। এই পত্রে লোকেন্দ্রনাথ পালিত -কৃত ওমর খৈয়ামের একটি কবাই'এর অনুবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে; উহা ১৩০৮ বৈশাখ সংখ্যা ভারতীতে মুদ্রিত হয়, রচনার তারিখ দেওয়া আছে ডায় ১৩০৭।

১৯০০ সালে প্যারিস প্রদর্শনীতে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অব সিজিসিস্ট্‌স্‌এ আমন্ত্রিত হইয়া অগদীশচন্দ্র বাংলা ও ভারত সরকারের প্রতিনিধিরূপে তাহাতে যোগ দেন (আগস্ট মাসে) ও Response of Inorganic and Living Matter সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ

পত্র ৪

করেন।^১ তথা হইতে লণ্ডনে গিয়া জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে যে চিঠি লেখেন (৩১ আগস্ট ১৯০০) তাহাতে তাঁহার নবাবিষ্কৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে প্যারিস ও লণ্ডনের বিজ্ঞানীদের মনোভাবের বিবরণ দিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের চিঠিখানি সম্ভবতঃ জগদীশচন্দ্রের এই পত্রের উত্তরেই লিখিত—

‘একদিন [প্যারিস] Congressএর President হঠাৎ আমাকে বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। আমি কিছু কিছু বলিয়াছিলাম। তাহাতে অনেকে অতিশয় আশ্চর্য হইলেন। তারপর Congressএর Secretary... আমার সহিত দেখা করিতে আইসেন, এবং আমার কাজ লইয়া discussion করেন। এক ঘণ্টা পর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন— But, monsieur, this is very beautiful (butএর অর্থ আমি প্রথমে বিশ্বাস করি নাই।) তারপর আরও তিন দিন এ-সম্বন্ধে আলোচনা হয়, প্রত্যহই more and more excited— শেষদিন আর নিজকে সম্বরণ করিতে পারিলেন না। Congressএর অন্যান্য Secretary এবং Presidentএর নিকট অনর্গল ফরাসী ভাষায় আমার কার্য্য-সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন।...

‘এই গেল প্যারিসের পাল্লা। তাহার পর লণ্ডনে আসিয়াছি। এখানে একজন physiologist আমার কার্য্যের জনরব শুনিয়াই বলিলেন, যে, কখনও হইতে পারে না, there is nothing common between the living and non-living। আর একজন বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে ৪ ঘণ্টা কথা হইয়াছিল। প্রথম ঘণ্টায় ভয়ানক বাদান্তুবাদ, তারপর কথা না বলিয়া কেবল শুনিতেছিলেন, এবং ক্রমাগত বলিতেছিলেন, this is magic ! this is magic ! তারপর বলিলেন, এখন তাঁহার

১ পেডিস, পূর্বোন্নিখিত গ্রন্থ, পৃ ৮৮

নিকট সমস্তই নূতন, সমস্তই আলোক। আরও বলিলেন, এইসব সময়ে accepted হইবে; এখন অনেক বাধা আছে। আমার theory পূর্ব সংস্কারের সম্পূর্ণ বিরোধী, সুতরাং কোন-কোন physicists, কোন-কোন chemists এবং অবিকাংশ physiologists আমার মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবেন। কোন-কোন মহামান্য বৈজ্ঞানিকের theory আমার মত গ্রাহ্য হইলে মিথ্যা হইবে। সুতরাং তাঁহারা বিশেষ প্রতিবাদ করিবেন। এবার সপ্তরথীর হস্তে অভিমত্যা বধ হইবে; আপনারা আমোদ দেখিবেন...

‘কিন্তু আপনাদের প্রতিনিধি রূপে পৃষ্ঠভঙ্গ দিবে না। সে মনচ্ছকুতে দেখিবে, যে, তাহার উপর অনেক স্নেহদৃষ্টি আপাততঃ রহিয়াছে।’

পত্র ৪। ‘লর্ড রবার্টসের মত... প্রিটোরিয়ায় ফিষ্টমাস করতে পারবেন।’

১৮৯৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় বোয়ারদের সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধ বাধে; ইংরেজ সেনাপতি লর্ড রবার্টস্ বিশাল বাহিনী লইয়া রাডধানী প্রিটোরিয়ার দিকে অগ্রসর হইলেন। ১৯০০ সালের ৫ জুন প্রিটোরিয়া অধিকৃত হয়।

পত্র ৪। ‘আপনি ‘ক’ বিন্দুতে কম্পমান, আমি ‘খ’ বিন্দুতে দিবা নিশ্চেষ্ট’

জগদীশচন্দ্রের ষে পত্রের (৩১ আগস্ট ১৯০০) উত্তরে রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি, তাহাতে জগদীশচন্দ্র তাঁহার আবিষ্কার -প্রসঙ্গে কোনো বিজ্ঞানীর মন্তব্য উদ্ধৃত করেন ‘এত Surprise একেবারে লোকে মনে ধারণা করিতে পারিবে না— it is



পত্র ৪

human nature, A বিন্দু পর্য্যন্ত উঠিতে পারে, তারপর হঠাৎ মন
ভাঙ্গিয়া B বিন্দুতে নামিয়া যায়’— এই পতন-অভ্যুদয় অগদীশচক্র
চিঠিতে চিত্রিত করিয়াও দেখাইয়াছিলেন। তাহারই অনুবর্তনে
রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন যে, অগদীশচক্র বিদেশে উচ্চম-উদ্দীপনার
উচ্চবিন্দুতে, রবীন্দ্রনাথ পল্লীগ্রামে ‘নিশ্চেষ্ট’তার নিম্নবিন্দুতে।

পত্র ৪। ‘Sketch Book নিয়ে ব’সে ব’সে ছবি আঁকি।’

রবীন্দ্রনাথ চিত্রচর্চায় মনোনিবেশ করেন প্রাচীন বয়সে (১৩৩৫);
কিন্তু প্রথমজীবনেও চিত্রবিদ্যার অনুরাগী ছিলেন, একান্তে কখনো কখনো
এ বিষয়ে চর্চাও করিয়াছেন। আলোচ্য পত্র লিখিবার সাত বৎসর পূর্বে
শ্রীমতী ইন্দিরাদেবীকে লিখিতেছেন—

‘আমি বাস্তবিক ভেবে পাইনে কোন্টা আমার আসল কাজ।...
লক্ষ্যের মাথা খেয়ে সত্যিকথা যদি বলতে হয় তবে এটা স্বীকার করতে
হয় যে, ঐ যে চিত্রবিদ্যা বলে একটা বিদ্যা আছে তার প্রতিও আমি
সর্বদা হতাশ প্রণয়ের লুকু দৃষ্টিপাত করে থাকি— কিন্তু আর পাবার
আশা নেই, সাধনা করবার বয়স চলে গেছে। অগ্ণাণ বিদ্যার মত
তাঁকেও সহজে পাবার জো নেই— তাঁর একেবারে ধমুকভাঙা পণ—
তুলি টেনে টেনে একেবারে হয়রান্ না হলে তাঁর প্রসন্নতা লাভ করা
যায় না।’ ছিন্নপত্র, ৩০ আষাঢ় ১৮৯৩ [১৩০০]

ইহারও পূর্বে চিত্রচর্চার উল্লেখ পাওয়া যায় জীবনস্মৃতি গ্রন্থে ‘বর্ষা ও
শরৎ’ অধ্যায়ে—

‘মনে পড়ে, ছুপুরবেলায় জাম্বিন-বিছানো কোণের ঘরে একটা ছবি
আঁকার খাতা লইয়া ছবি আঁকিতেছি। সে যে চিত্রকলার কঠোর
সাধনা তাহা নহে— সে কেবল ছবি আঁকার ইচ্ছাটাকে লইয়া আপন-

মনে খেলা করা। যেটুকু মনের মধ্যে থাকিয়া গেল, কিছুমাত্র আঁকা গেল না, সেইটুকুই ছিল তাহার প্রধান অংশ।’

এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত গানগুলির প্রকাশ-তারিখ হইতে মনে হয় যে, সম্ভব ইহা ১৮৮৫ (১২২২) বা তাহার কাছাকাছি সময়ের কথা।

পত্র ৪। ‘আপনি আমাকে একটি ভ্রমণ-সঙ্গ-দানে প্রতিশ্রুত’

এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয় চার বৎসর পরে। ১৯০৪ সালের অক্টোবর মাসে রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র বুদ্ধদ্বর্গসহ বুদ্ধগয়া যান। ভগিনী নিবেদিতাও এই সঙ্গে ছিলেন, তাহার স্মৃতি-আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বহুনাথ সরকার মহাশয় (“Sister Nivedita as I knew her”, Hindusthan Standard, Puja Annual, 1952) এই ভ্রমণের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত দিয়াছেন, নিয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল—

Early in the month of October, 1904, Nivedita, Dr. Jagadish C. Bose, Rabindranath Tagore, Swami Sadanand (Gupta Maharaj), Brahmachari Amulya (now Swami Shankaranand) went to pass a week at Bodh Gaya. I was invited and joined them from Patna. We were lodged in the mahant's guest-house.

There were daily readings from Warren's *Buddhism in Translations* and occasionally Edwin Arnold's *Light of Asia* ; some songs and recitations by the Poet, too. In the daytime we strolled through the temple enclosure, or visited the neighbouring villages. In the evening twilight we went to the Bodhi tree and sat in the gloom in silent meditation. There we found a remarkable character. Fuji, a poor Japanese fisherman had

by hard austerity for many years, saved money to gratify his life's dream of making a pilgrimage to the spot where the Blessed One had attained to Enlightenment. He had at last come here and lived frugally in a room of the pilgrim house. Every evening he would come and sit under the Bodhi Tree praying and chanting the hymn—

Namo namo Buddha Divakaraya,
Namo namo Gotama-Chandimaya,
Namo namo Nanta-Gunannabaya,
Namo namo Sakya-Nandanaya.

In the silence and gloaming the Sanskrit (Prakrit) words uttered with a Japanese accent, rose like the tolling of a low bell, which made us feel as if overpowered by the spirit of the place. Words were not uttered ; it was beyond speech.

It interests me to think that Rabindranath remembered this hymn,^১ and when he wrote his play *Natir Puja* he took care to insert it as Shrimati's prayer. Fuji had given the hint.

পত্র ৪ । 'লোকেন আমার যে কাব্য-চয়ন প্রকাশে প্রবৃত্ত ছিল... নিজেই এ কাজে হাত দিতে পারি।'

সম্ভবতঃ লোকেন্দ্রনাথের উদ্যোগ কার্ণে পরিণত হয় নাই, এই কাব্য-

১ এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এই আপানী ভক্তের কথা রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘকাল পরেও স্মরণ করিয়াছেন, ১৩৪২ বৈশাখী পূর্ণিমায় কলিকাতা ত্রিধর্মরাজিক চৈত্যাবিহারে বুদ্ধদেবের অস্মাৎসবে সস্তাপতির অতিভাবে। ত্রুটব্য রবীন্দ্রনাথ-প্রণীত বুদ্ধদেব (ভৈষ্য ১৩৬৩) পৃ ২-৩

চয়ন প্রকাশিত হয় নাই ; 'চয়নিকা' প্রকাশিত হয় অনেক পরে (১৯০৯), কবির ভরণ অমুরাগীগণ, অক্ষিতকুমার চক্রবর্তী, চাকচাক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সম্ভবত এ বিষয়ে উদ্বোধনী ছিলেন । সম্প্রতি একখানি 'কাব্য-গ্রন্থে' (১৮৯৬) কবির হাতের নানা সম্পাদনা লক্ষ্য করিয়াও মনে হয়, তিনি 'নিজেই এ কাজে হাত' দিয়াছিলেন, যদিও তাহা সমাধা হয় নাই । এই সম্পর্কে ৬-সংখ্যক পত্রও দ্রষ্টব্য ।

পত্র ৪ । 'আর্ষা ।' তুলনীয় রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্রের ২৫ এপ্রিল ১৮৯৯ তারিখের চিঠি— 'Mrs কথাটা বাংলাতে অতি বীভৎসজনক । আপনি একটি নূতন কথা বাহির করিবেন ।'

পত্র ৪ । 'শ্যালকজায়া আর্ষা সরলা' মতীশরঞ্জন দাসের পত্নী সরলতা ।

পত্র-৪ । 'শিক্ষা-প্রণালীটি আমার রচিত ।... আমার পদ্ধতি যতে যদি তিনি সংস্কৃত শেখেন তা'হলে এক বৎসরের মধ্যেই তাঁর সংস্কৃত ভাষায় অধিকার জন্মাবে ।'—

'ভাষার সহিত কিছুমাত্র পরিচয় হইবার পূর্বেই শিশুদিগকে তাহার ব্যাকরণ শিখাইতে আরম্ভ করা, ভাষা শিক্ষার সহপায় বলিয়া আমি গণ্য করি না ।

'এইজন্য আমার গৃহে বালকবালিকাদিগকে যখন সংস্কৃত শিখাইবার সময় উপস্থিত হইল, তখন আর কোনো সুবিধা না দেখিয়া নিজে একটা সংস্কৃত পাঠ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম ।

'তাহাতে গোড়া হইতে প্রয়োগ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই ভাষা শিক্ষা ও ভাষার সহিত পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ ব্যাকরণ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল ।' — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সম্পাদকের নিবেদন', [ত্রিহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় -প্রণীত] সংস্কৃত প্রবেশ, প্রথম ভাগ ।

রবীন্দ্রনাথ-প্রণীত ‘সংস্কৃত পাঠ’, দুই খণ্ডে, ১৮৯৬ সালে ‘সংস্কৃত শিক্ষা’ নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম খণ্ড পাওয়া যায় নাই, দ্বিতীয় খণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলীতে (অচলিতসংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ডে) পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

পত্র ৪। ‘আপনার জন্মে পুরীর জমীটি’

পুরীতে রবীন্দ্রনাথের ‘জমি ও গোটাকতক ঘর’ ছিল। জগদীশচন্দ্রকে এই জমি রবীন্দ্রনাথ দিতে চাহিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন (১৮ আগস্ট ১৯০৩)—

‘তুমি যে পুরীর জায়গা আমাকে দিতে চাহিয়াছ! তুমি কি মনে কর আমার কোন স্থানের উপর কোনমাত্র টান আছে? কেবল একসময় মনে করিয়াছিলাম যে, দুজনে একটি কুটার নির্মাণ করিয়া মাঝে মাঝে যাইয়া থাকিব। ... তুমি যদি একপ নিরাসক্ত হও, আর তুমি যদি পুরীতে সঙ্গী না হও, আমার পক্ষে ওরূপ নির্জনবাস অসহ্য হইবে।’

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ঋণমোচনের জন্ত অবশেষে তাহা বিক্রয় করিয়া দিতে হয়।’ এই প্রসঙ্গে শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ তাঁহার ‘রবীন্দ্রনাথ’ (১৩৪৮) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

‘বিদ্যালয়ের fund হইতে এই বাড়িটা করিয়া দিলে কিরূপ হয়? তা যদি না হয় তবে সেখানকার ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেট বলিতেছিলেন ... পুরীতে জমি কিনিবার জন্ত অত্যন্ত উৎসুক। যদি হাজার তিন চার টাকা পাওয়া যায়, তবে তাঁহাকে বেচিয়া ঐ টাকা বিদ্যালয়ে জমা করা যাইতে পারে। তুমি কাহাকে দিয়া ... নিকট যাচাই করিতে পার?’

১ ‘সমুদ্রতীরবাসের লোভে পুরীতে একটা বাড়ি করেছিলুম। সে বাড়ি একদিনও ভোগ করবার পূর্বে আশ্রমের ক্ষুধার দাবিতে বিক্রি হয়ে গেল।’ —আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, পৃ ৬৪

পুরী এক সময় রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়া থাকিবে ; জগদীশচন্দ্রকেও পুরীতে সস্বীকৃতিতে পাইবার জন্য তাঁহাকে এখানে গৃহ-নির্মাণে তিনি উৎসাহিত করেন । জগদীশচন্দ্র এক চিঠিতে (২১ জুন ১৯০০) রবীন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলেন—

‘পুরীর বর্ণনা শুনিয়া আমার মন সেখানে আছে । সমুদ্রগর্জন ও বাতাস ও ঢেউ আমাকে ঘেরিয়া আছে । এই সংকীর্ণ নগর ত্যাগ করিয়া প্রকৃতির মনো নিভকে হারাতে চাহি ।’

পত্র ৫ । ‘মীজার যে নৌকায় চড়েন সে নৌকা কি কখনও ডুবিতে পারে ?’

একানিক পত্রে রবীন্দ্রনাথ বিশেষের বিজ্ঞানীসমাজে জগদীশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠা-অর্জন প্রসঙ্গে মীজারের কীতির উল্লেখ করিয়াছেন, ২০-সংখ্যক পত্রেও লিখিয়াছেন ‘মীজারের নৌকা কখন ডুবে না’ । মীজারের বিষয়-যাত্রা সম্বন্ধে যেরূপ নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত, ‘উক্ষয় গলবাসী’ জগদীশচন্দ্রের জয়বার্তাও এককালে সেইরূপ অলোকসামাগ্র বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল— ‘ঈশ্বর তোমার ললাটে বিজয়-তিলক অঙ্কিত করিয়া তোমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন’, ‘ভারতবর্ষের অবমেনের গোড়া তোমার হাতে আছে।’ ‘মীজারের নৌকা’ প্রসঙ্গে বোধ করি নিম্নলিখিত কাহিনীটি রবীন্দ্রনাথের মনে জাগিতেছিল—

At Apollonia, since the force which he had with him was not a match for the enemy and the delay of his troops on the other side caused him perplexity and distress, Caesar conceived the dangerous plan of embarking in a twelve-oared boat, without any

১ ইংরেজি উদ্ভূতি ইন্দুজী ইচন্দ্র সেনের সৌভাগ্য প্রাপ্ত ।

one's knowledge, and going over to Brundisium, though the sea was encompassed by such large armaments of the enemy. At night, accordingly, after disguising himself in the dress of a slave he went on board, threw himself down as one of no account, and kept quiet. While the river, Aous was carrying the boat down towards the sea, the early morning breeze, which at that time usually made the mouth of the river calm by driving back the waves, was quelled by a strong wind which blew from the sea during the night; and the river therefore chafed against the inflow of the sea and the opposition of the billows, and was rough, being beaten back with a great din and violent eddies, so that it was impossible for the master of the boat to force his way along. He therefore ordered the sailors to come about in order to retrace his course. But Caesar, perceiving this, disclosed himself, took the master of the boat by the hand, who was terrified at sight of him, and said: "Come, good man, *be bold and fear naught; thou carryest Caesar and Caesar's fortune in thy boat.*" The sailors forgot the storm and laying to their oars, tried with all alacrity to force their way down the river...

পত্র ৫ । 'আমার সমস্ত ছোটগল্প একত্র ছাপিতে প্রবৃত্তি হইয়াছে ।'

ইহাই প্রথমসংস্করণ গল্পগুচ্ছ, দুই খণ্ডে প্রকাশিত; প্রথম খণ্ড ১ আশ্বিন ১৩০৭ (বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা-অনুযায়ী ১১ অক্টোবর ১৯০০) তারিখে এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৩০৭ [১৯০১] সালে প্রকাশিত ।

পত্র ৫। 'আপনার প্রস্তাব উপলক্ষ্যে'

জগদীশচন্দ্র পাশ্চাত্তা দেশে রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রচারে উদ্বোধনী হইলেও সে চেষ্টা তখন সার্থক হয় নাই। ১৯০০ সালের ২ নভেম্বর তারিখে লণ্ডন হইতে জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন—

'এখন তোমার বিষয়ে দু-একটি কথা লিখিব। তুমি যে cutting পাঠাইয়াছ, তাহাতে আমি একটুও সন্তুষ্ট হই নাই। তুমি পল্লীগ্রামে লুক্কায়িত থাকিবে, আমি তাহা হইতে দিব না। তুমি তোমার কবিতা-গুলি কেন একরূপ ভাষায় লিখি যাহাতে অন্য কোন ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব? কিন্তু তোমার গল্পগুলি আমি এদেশে প্রকাশ করিব। লোকে তাহা হইলে কতক বুঝিতে পারিবে। আর ভাবিয়া দেখিও, তুমি সার্ক-ভৌমিক। এদেশের অনেকের সহিত তোমার লেখা লইয়া কথা হইয়াছিল। একজনের সহিত কথা আছে (শীঘ্রই তিনি চলিয়া যাইবেন) যদি তোমার গল্প ইতিমধ্যে আসে তবে তাহা প্রকাশ করিব। Mrs Knightকে অন্য একটি দিব। প্রথমোক্ত বন্ধুর দ্বারা লিখাইতে পারিলে অতি সুন্দর হইবে। তারপর লোকেনকে ধরিয়া translate করাইতে পার না? আমি তাহাকে অনেক অনুরোধ করিয়া লিপি দাছি।'

জগদীশচন্দ্র পুনরায় এ বিষয়ে ১৯০০ সালের ২৩ নভেম্বর তারিখে লিখিতেছেন—

'তোমার পুস্তকের জন্য আমি অনেক মতলব করিয়াছি। তোমাকে যশোমণ্ডিত দেখিতে চাই। তুমি পল্লীগ্রামে আর থাকিতে পারিবে না। তোমার লেখা তরঙ্গমা করিয়া এদেশীয় বন্ধুদিগকে শুনাইয়া থাকি, তাঁহারা অত্র সম্বরণ করিতে পারেন না। তবে কি করিয়া publish করিতে হইবে, এখনও জানি না। publisherরা ফাঁকি দিতে চায়।

সে যাহা হউক, তোমার ভাগে কেবল glory, লাভালাভের ভাগ আমার। যদি কিছু লাভ হয়, তাহার অর্ধেক ত্বরজমাকারীর, আর অর্ধেক কোন সদহুষ্ঠানের। ইহাতে তোমার আপত্তি আছে কি? আমি অনেক castles in the air প্রস্তুত করিতেছি।

‘এবার যদি তোমার নাম প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, তাহা হইলেই যথেষ্ট মনে করিব। ৬টি গল্প বাহির করিতে চাই। শীঘ্র তোমার অন্যান্য গল্প পাঠাইবে। Mrs. Knightকে দেই নাই।’

১২০১, ১৬ জানুয়ারি তারিখে জগদীশচন্দ্র লিখিতেছেন—

‘তোমার গল্পের পুস্তক ২য় খণ্ড কবে পাইব? প্রথম খণ্ড হইতে ৩টি গল্প ত্বরজমা হইয়াছে। ভাষার সৌন্দর্য ইংরাজীতে রক্ষা করা অসম্ভব। কি করিব বল? তবে গল্পের সৌন্দর্য ত আছে। এখন নরওয়ে সুইডেন ইটালী দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প এদেশে আগ্রহের সহিত পঠিত হয়, সে-সবের সঙ্গে তুলনার জন্য তোমার লেখা বাহির করিতে চাই। এদেশে এমন লোক আজকাল অধিকমাত্রায় হইয়াছে, যাহাদের কিপ্লিংই গুরু, সুতরাং popular হইবে কি না জানি না। তবে তিন শ্রেণীর বন্ধুগণের মত জোগাইতেছি :—

‘প্রথম। এক সম্ভ্রান্ত আমেরিকান মহিলা— সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগ আছে। “ছুটা” গনিয়া কাঁদিয়া আকুল।

‘দ্বিতীয়— Typical John Bull। “ছুটা” গনিয়া বলিলেন যে, local colour ত কিছু দেখিলাম না— ফটিক যে আমাদের দেশী ছেলে,

১ জগদীশচন্দ্রকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র [১২ ডিসেম্বর ১২০০]—‘আমার গল্পের অনুবাদ ছাপাইয়া কিছু বে লাভ হইবে, ইহা আমি আশা করি না— যদি লাভ হয় আমি তাহাতে কোন দাবী রাখিতে চাহি না— তুমি বাহাকে খুসি দিও।’

একশ দু-একজনকে আমি জানি— true to life। তাঁহার বিখ্যাস ছিল যে, ভারতবর্ষীয় ছেলেদের স্বভাব অন্তরূপ।

‘তৃতীয়। আমার এই বন্ধুটির’ সম্বন্ধে দেখা হইলে বলিব; ইহার জীবন অতি আশ্চর্য। ইনি একজন বিশেষ সম্ভ্রান্তবংশীয়— ইয়োয়োগীয়া বহু ভাষায় পণ্ডিত। He has not seen such a fine touch in any European Literature.

‘স্বতন্ত্র সাধারণের নিকট কিরূপ লাগিবে জানি না।

‘কয়েকটি গল্প একত্র করিয়া এখনকার একজন publisherএর নিকট পাঠাইতে চাই। এদেশীয় publisher চোর। অনেক দর-দস্তুর করিতে হইবে। প্রথমে লোকমান পূরণের জন্য টাকা চাহিবে।

‘অথবা কোন Magazineএ পাঠাইতে পারি।’

পুনরায় ঐ বৎসর ২২ মে তারিখে লিখিতেছেন—

‘তোমার লেখা অনুবাদ করিয়া কোন মাগাজিনে পাঠাইয়াছিলাম। তাঁহারা দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন, গল্প অতি সুন্দর; কিন্তু original ব্যতীত অনুবাদ আমরা বাহির করি না। তোমার নাম জাল করিতে যদি অধিকার দাও, তাহা হইলে অনুবাদের কথা না বলিয়া একবার তোমার নাম দিয়া পাঠাইতে পারি। কি বল?’

কথিত আছে, রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহে বাসকালে জগদীশচন্দ্র বসু তাঁহার সন্দর্শনে যাইতেন তখন এই কড়ার থাকিত যে, রবীন্দ্রনাথ প্রত্যাহ

১ সম্ভবতঃ Prince Kropotkin

২ বর্তমান এসক্রে প্যাট্রিক সেন্ডিস পূর্বোক্ত গ্রন্থে (পৃ ২২৩) লিখিয়াছেন—

Tagore, though occupying the foremost literary position in India, was not at that time known in Europe, and Bose felt keenly that the West had not the opportunity of realising his friend's

একটি গল্প রচনা করিয়া জগদীশচন্দ্রের চিত্তবিনোদন করিবেন।^১ জগদীশচন্দ্রর একখানি চিঠিতে দেখি (১৮ এপ্রিল ১৯০০), তিনি শিলাইদহ হইতে কিরিয়া তাঁহার 'পাওনা' আদায়ের চেষ্টা করিতেছেন—

'আপনার লেখা গল্প মাঝে-মাঝে পাঠাইবেন। প্রথম কয়টা দিন আপনি ফাঁকি দিয়াছেন। অস্তুতঃ সে কয়টা গল্প আমার পাওনা আছে।'

জগদীশচন্দ্রর অনেক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের সকৌতুক উল্লেখ অমুপ্রবিষ্ট— 'আমি এ কয়দিন "মেঘ ও রৌদ্রের" মধ্য দিয়া গিয়াছি। মেঘের মধ্যে রক্তরেখা কখন কখন দেখা দিয়াছে' (৬ মার্চ ১৯০০)। 'দেখিবেন সদরের অমুগ্রহে যেন আমি অন্ধরের বিরাগভাজন না হই' (১৬ মার্চ ১৯০০)। 'তোমার মিনির বিবাহ হইল। কাবুলী ওয়ালা তাহাতে উপস্থিত থাকিতে না পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত আছে' (১১ জুলাই ১৯০১)।

greatness. So during his second visit to England, in 1900, he had one of his stories, 'The Kabuliwalla', translated into English. Prince Kropotkin—a good critic in letters as well as science—declared it to be the most pathetic story he had ever heard, reminding him of the greatest writers among his countrymen; and Bose submitted it to *Harper's Magazine*. It was declined, because the West was not sufficiently interested in Oriental life! The time had not yet come; but Bose during his last visit to America in 1915, when Tagore's fame was reaching its meridian, did not fail to utilise the opportunity to rub this in when Harper was publishing one of his own articles.

১ Once, on receiving an invitation from the poet to stay with him at his house at Silaida on the river Padma, Bose accepted it with the demand of the fullest and highest hospitality his friend could render him—that of a new story to be written every day, and read to him every evening!—গেডিস, পূর্বোক্তিত গ্রন্থ, পৃ ২২২

রবীন্দ্রনাথের 'জয়পরাজয়' গল্প জগদীশচন্দ্রকে কিরূপ উদ্ভুদ্ধ করিয়াছিল জগদীশচন্দ্রের রবীন্দ্রনাথকে লিখিত একখানি চিঠিতে (৩০ আগস্ট ১৯০১) তাহার উল্লেখ আছে—

'তোমার 'জয়পরাজয়' গল্পটি আমাকে কিরূপ আবিষ্ট করিয়াছে, বলিতে পারি না। রয়্যাল ইন্সটিটিউশনের বক্তৃতার দিন যেন তাহারই অভিনয় হইতেছিল। যদি ভক্তের পূজা ভারতী গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে জয় পরাজয় আমার নিকট একই।'

এই ভাবে আবিষ্ট হইয়াই জগদীশচন্দ্র বস্তুবিজ্ঞানমন্দির-প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষ্যে (৩০ নভেম্বর ১৯১৭) 'নিবেদন' এর পরিসমাপ্তিতে বলিলেন—

'যখন প্রদীপ্ত জীবন নিবেদন করিয়া ও তাহার সাধনার সমাপ্তি হইবে না, যখন পরাজিত ও মৃগ্ণ হইয়া সে মৃত্যুর অপেক্ষা করিবে, তখনই আরাধ্যা দেবী তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন। এইরূপে পরাজয়ের মধ্য দিয়াই সে তাহার পুরস্কার লাভ করিবে।'

পত্র ৫। ত্রিপুরার মহারাজ 'পূর্বপ্রতিশ্রুত দানের অপেক্ষা আরো অনেকটা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।'

৬, ১৭, ১৮ -সংখ্যক পত্রের এই প্রসঙ্গ আলোচিত; বর্তমান পত্রও সংগৃহীত অন্ত কোনা কোনা পত্র এবং প্রত্যক্ষও এই প্রসঙ্গ আছে। ত্রিপুরার মহারাজার নিকট হইতে জগদীশচন্দ্র যে আশুকুলা লাভ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে জগদীশচন্দ্র একটি বক্তৃতায় 'সবিস্তারে উল্লেখ করিয়াছেন। জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে বাদাকিশোরের এই যোগাযোগ সাধন

১ জগদীশচন্দ্র বসু, 'অদাস্ত'

২ মহিমচন্দ্র দেবদর্শী কর্তৃক তাহার 'দেশীয় রাজ্য' গ্রন্থে "ত্রিপুরার মহারাজের রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধে The Englishman পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।

করিয়াছিলেন প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্রের প্রতি আনুকূল্যবিধানের জন্য মহারাজকে রবীন্দ্রনাথ যেকপ বারংবার প্রবর্তিত করিয়াছেন সে কথা, রবীন্দ্রনাথের যে চিঠিগুলি এইখণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতেই প্রকাশ। ত্রিপুরার মহিমচন্দ্র দেববর্মা এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

‘একবার কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র, রবিবাবু প্রভৃতি বন্ধুদিগকে স্বীয় গবেষণার ফলাফল দেখাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তখনো বানাকিশোরবাবু সহিত জগদীশবাবুর সংস্রাম পরিচয় ছিল না। ...১৯০০ খৃঃ অব্দের বিষয়।... রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাকে জানিতে দিয়াছিলেন, “...যদি তুমি পাব উপস্থিত হইও।”... মহারাজ এ খবর পাঠিয়া বিনা নিমন্ত্রণে উক্ত কলেজের বিজ্ঞানাগারে যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিলেন।... রবিবাবু মহারাজকে দেখিয়া পুলকিত হইলেন এবং আচার্য জগদীশ বাবু সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন।...

‘তারপর একদিন রবিবাবুর তলবে জগদীশবাবুর গৃহে উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলাম, প্রাইভেট কার্যে কলেজের বিজ্ঞানাগার ব্যবহার করা কদুপক্ষেই অভিঃপ্রত নহে। রবিবাবু ইহাতে মন্বাত্মিক বেদনা অনুভব করিলেন, বিশেষতঃ বুঝিলেন, জগদীশবাবুর নিজের বিজ্ঞানাগার না হইলে তাহার বিজ্ঞানের নতুন তথ্য আবিষ্কারের পথ চিবতরে বন্ধ হইয়া যাইবে। পরামর্শ হইল ২০,০০০ হাজার টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে, ১০,০০০ হাজার টাকা রবিবাবু নিজে আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিবেন, বাকি টাকার জন্য ত্রিপুর বাজ দরবারে ভিক্ষা করিতে উপস্থিত হইবেন। মহারাজ বানাকিশোর তখন কলিকাতায় উপস্থিত ছিলেন। কবিকে ভিক্ষুবোধে আসিতে দেখিয়া

বলেন, “এ বেশ আপনাকে মাছে না, আপনাব বীণে রাজানই কাছ, আমরা ভক্তবৃন্দ ভিষ্কাব কুলি বহন করিব।...” তখন যুবরাজ বীরেন্দ্রকিশোরের বিবাহ উপস্থিত। মহারাজ বলিলেন—“বহুমানের আমার ভাবী বধুমাতার হৃৎক পদ অলঙ্কার নাই বা... হইল” ১

‘... তৎপর জগদীশবাবু বিলাতে বৈজ্ঞানিক সমাধে যৌথ গবেষণা প্রচারের বাসনায় বিলাত যাত্রা করেন। তথায় নানা কারণে তাঁহার আবিষ্কারের প্রতিষ্ঠা স্থাপনে বিলম্ব হইতে লাগিল। অর্থাৎ কুটী ফুবাটীয়া আসায় ভয়-মনোবশ হইয়া তাহাকে ফিরিতে হইত, যেমনি অবস্থায় বাদাকিশোরের ঐকাম্বিক উৎসাহ বণী এবং ২০,০০০ টাকা দান অর্থ সাহায্যলাভ, বিলাতের বৈজ্ঞানিক সমাধের সফলতা লইয়া দেশে ফিরিলেন। সে কাহিনী স্বয়ং আচার্য জগদীশ বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অভিভাবকে স্মরণে ভাষায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।’

পত্র ৫। ‘বিলাতে কাছ = ওয়া সম্বন্ধে কি দিব বর্ণিতেন?’

উহার কিছুকাল পূর্বে জগদীশচন্দ্র বিষ্ণু বাসোমিসেশনের বাঙ্গালী সভায় প্রদক্ষপাঠ (সেপ্টেম্বর ১৯০০) করিলে বৈজ্ঞানিক শোভাবর্গ সম্বন্ধে হন, এবং তাঁহার গবেষণা বাহ্যে অস্বাভাবিক ভাবে চলিলে পূর্বে এতদৃশ্য তাঁহাদের কেহ কেহ জগদীশচন্দ্রকে ইংরেজি অস্বাভাবিক ভাবে হইতে অস্বাভাবিক করেন। জগদীশচন্দ্র রসায়নকে ১০ সেপ্টেম্বর ১৯০০ তারিখের পূর্বে এ বিষয়ে লিখিত হইল।

‘বহুতার পর Lodge বন্ধুগণকে লইয়া আমার stereoscope এ

১ তুলনীয় “জগদীশচন্দ্র”, পৃষ্ঠা ১১০
 ২ পূর্বে উল্লিখিত বহুতা
 ৩ মহিমচন্দ্র দেবদাস, “উপরে উল্লিখিত রসায়ন”, দেবদাস প্রকাশ, গুট প্রকাশ
 “ত্রিপুরা-প্রসঙ্গ” প্রবন্ধেরও কোনো কোনো বাক্য এই উদ্দেশ্যে অস্বাভাবিক।

পত্র ৬

MERO ইত্যাদি দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য হইয়াছেন। আমাকে বলিলেন, "You have a very fine research in hand, go on with it"। হঠাৎ বিজ্ঞানী করিলেন, "Are you a man with plenty of means? All these are very expensive and you have many years before you, your work will give rise to many others—all very important"। আমি কথা কাটাইয়া দিলাম।

‘তার পরের দিন Prof. Barret আমাকে বলিলেন, "We had a talk last night (Lodge was one of us). We thought your time is being wasted in India and you are hampered there. Can't you come over to England? Suitable chairs fall seldom vacant here, and there are many candidates. But there is just now a very good appointment (কোন সুপ্রসিদ্ধ Universityর নূতন Professorship) and should you care to accept it, no one else will get it."

‘এখন বলুন কি করি? এক দিকে আমি যে কাজ আরম্ভ করিয়াছি—যাহার কেবল outskirts লইয়া এখন ব্যাপ্ত আছে এবং যাহার পরিণাম অদ্ভুত মনে করি, সেই কাজ amateurish রকমে চলিবে না। তাহার জন্য অসীম পরিশ্রম ও বহু অল্পকূল অবস্থার প্রয়োজন। অন্য দিকে আমার সমস্ত মনপ্রাণ ছুঃখিনী মাতৃভূমির আকর্ষণ ছেদন করিতে পারে না। আমি কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। আমার সমস্ত inspirationএর মূলে আমার বদেশ্বর লোকের স্নেহ। সেই স্নেহবন্ধন ছিন্ন হইলে আমার আর কি রহিল?’

কিন্তু এই জীবনকাহিনীর সঙ্গে যাহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা

জানেন, প্রথমজীবনে কর্মক্ষেত্রে বহু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বহু অনাবশ্যক বাধার সহিত সংগ্রাম করিয়া তাঁহাকে বিজ্ঞানসাধনার নিম্ন ধাক্কিতে হইয়াছে। বিদেশে যখন তাঁহার আবিষ্কার বিজ্ঞানীসমাজে গভীর ঔৎসুক্য ও বিশ্বাসের সঞ্চার করিয়াছে, তখনও পাশ্চাত্যদেশে অল্পকূল পরিবেশে তাঁহার গবেষণাকে পরীক্ষা করিয়া লইবার ও তাহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ ও অবসর সামান্য পরিমাণে লাভ করিতেও তাঁহাকে প্রকৃত বেগ পাইতে হইয়াছে। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত বহু পত্রে অগদীশচন্দ্রের বিধানমোলিত চিন্তের উদ্বেগ প্রকাশিত হইয়াছে—

৫ অক্টোবর ১৯০০। ‘জীবনের কথা কেহ বলিতে পারে না; নতুবা ইচ্ছা ছিল, ভারতবর্ষ হইতে এক নূতন School of Workers হইতে এক সম্পূর্ণ নূতন বিষয় প্রকাশিত হইবে। আপনারা কেন এই কার্যক্ষেত্র প্রস্তুত করিলেন না? তাহা হইলে এক বিষয়ের কলক চিরকালের অন্ত মুছিয়া যাইত। জীবন অনিত্য বলিয়াই আমাকে তাড়াতাড়ি প্রকাশ করিতে হইতেছে। আমি দেশ হইতে আসিবার সময়ও জানিতাম না, যে, কি বিশাল ও অনন্ত বিষয় আমার হাতে পড়িয়াছে। সম্পূর্ণ না ভাবিয়া যে খিওরি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহার অর্ধপরিষ্কৃতিও প্রতি কথায় কি আশ্চর্য ব্যাপার নিহিত আছে, প্রথমে বুঝি নাই। এখন সব কথার অর্থ করিতে যাইয়া দেখি, যে, যোয় অন্ধকারে অকস্মাৎ জ্যোতির আবির্ভাব হইয়াছে। যে দিকে দেখি, সে দিকেই অনন্ত আলোক-রেখা। অন্যজন্মান্তরেও আমি ইহা শেষ করিতে পারিব না। আমি কোন্টা ছাড়িয়া কোন্টা ধরিব তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। আবার এদিকে আমার এখানকার সময়ও ফুরাইয়া আসিতেছে।’

২ নভেম্বর ১৯০০। 'আজ প্রায় দু মাস যাবৎ অহোরাত্র মনোভিত্তিক সংগ্রাম চলিতেছে। এখানে থাকিব, কি দেশে ফিরিয়া যাইব। তুমিও কি আমাকে প্রলুব্ধ করিবে ?

'ভাবিয়া দেখ। যদি সকলেই আমাদের বোঝা ফেলিয়া চলিয়া আসি, তবে কে ভার বহিবে ?...

'তোমাদের পশ্চাতে আমি এক দীনা চীরবসনপরিহিতা মূর্তি সন্ধান দেখিতে পাই। তোমাদের সহিত আমি তাঁহার অঞ্চলে আশ্রয় লই। আমি ভাষায় সে-সব কথা কি করিয়া প্রকাশ করিব ? তুমি বুঝিবে।

'সাধারণতঃ লোকের যে-সব বন্ধন থাকে, তাহা হইতে আমি মুক্ত। কিন্তু আমি সেই অঞ্চল-ডোর ছেদন করিতে পারি না।...

'আমার হৃদয়ের মূল ভারতবর্ষে। যদি সেখানে থাকিয়া কিছু করিতে পারি, তাহা হইলেই জীবন ধন্য হইবে। দেশে ফিরিয়া আসিলে যে-সব বাধা পড়িবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। যদি আমার অভীষ্ট অপূর্ণ থাকিয়া যায়, তাহাও সহ করিব।

'... এখন experiment দিয়া বুঝাইলে নূতন মত প্রচারের সুবিধা হইবে। নতুবা অনেকেই বুঝিতে পারিবেন না। দুঃখের বিষয় এই যে Easterএব পূর্বেই আমার ছুটি ফুরাইয়া আসিবে। ছুটি চাহিতে ইচ্ছা করে না, আর চাহিলেও পাইব কিনা সন্দেহ।

'... এখন দুই বৎসর এখানে থাকিতে পারিলে অনেকটা শেষ করিতে পারিতাম। Physiological Laboratory ইত্যাদি দেশে পাইব না। আমি কি করিব স্থির করিতে পারিতেছি না। এই সময়ে বাধা পড়িলে পুনরায় কয়েক বৎসর পর আরম্ভ করিতে অনেক সময় নষ্ট হইবে

আর এই সময়ে লোকের interest হইয়াছে, এখন করিতে পারিলেই ভাল হইত।’

২৩ নভেম্বর ১৯০০। ‘সকলে বলিতেছেন, যে, আমার কাণ্ড শেষ না করিয়া যেন না যাই। ছুটির জন্য আবেদন করিয়াছি, আমি না পাইব কি না।’

১০ ডিসেম্বর ১৯০০। ‘আমি ভবিষ্যতে কি করিব, এ সম্বন্ধে তুমি যাহা ভাল বিবেচনা কর, লিখিও। আমার সময়ে যাহাতে সম্ভাব্য হয়, লিখিও।’

‘ভারতবর্ষের স্বাধীনভাবে আত্মপরিচয় দিবার সময় ‘আমি যাচ্ছি’, ‘বিশ্বসভায় ভারতবর্ষের অমর বার্তা উচ্চারণ করিবার সময় উপস্থিত’— এই কল্পনায় বরদীন্দ্রনাথের মন এই সময় উৎকল, ভগ্নলীলচন্দ্রের চরিত্রে তিনি ‘সংকল্পের যে একটি সূত্র শক্তি’ সকল বাদ্য স্ব দ্বিধাকে অতিক্রম করিয়া উদ্ভাসিত দেখিয়াছিলেন তাহা প্রবলভাবে তাঁহার মনকে আন্দোলিত করিয়াছিল— ভগ্নলীলচন্দ্র ‘নবী ভারতের প্রথম কথিক্রমে জ্ঞানের আলোকশিখায় নতন হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত’ করিতেন, তাঁহার সাধনায় ভারতবর্ষ আব-একদা ‘গুরুর বেনীতে আরোহণ’ করিত, এষ্ট ভাবনা এই সময় বরদীন্দ্রনাথের হৃদয় পূর্ণ করিয়া ছিল— ‘ভারতবর্ষের অশ্বমেধের ঘোড়া তোমার হাতে আছে, তুমি কিরিয়া আমিলে আমার যজ্ঞ সমাধা হইবে।’

অসময়ে ভগ্নলীলচন্দ্র কিরিয়া আমিলে এষ্ট যজ্ঞ পাঁচে ‘অসম্পূর্ণ থাক’, এই কথা মনে করিয়া বরদীন্দ্রনাথ ভগ্নলীলচন্দ্রের স্বাধীন অশুকন করিবার জন্য স্বীয় শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। ভগ্নলীলচন্দ্রের সাধনা সম্বন্ধে বিপুল শ্রদ্ধা ও প্রত্যাশায় বরদীন্দ্রনাথ এই সময় ভগ্নলীলচন্দ্রকে

নিরন্তর উৎসাহপূর্ণ পত্র লিখিয়া এক দিকে তাঁহার মনকে অবসাদ ও দ্বিধা হইতে মুক্ত রাখিতে চেষ্টিত, অপর দিকে তাঁহার কর্মের আর্থিক ও আনুষ্ঠানিক বাধা যাহাতে প্রবল হইয়া না উঠে সেজন্যও তিনি উদ্যোগী। তাঁহার নিজের অর্থসম্বল এ সময়ে ক্ষীণ, কিন্তু ‘জগদীশবাবুর কার্যে আমি মান অপমান অভিমান কিছুই মনে স্থান দিতে পারি না—লোকে আমাকে যাহাই বলুক এবং যতই বাধা পাই না কেন তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত ভারমুক্ত করিতে পারিলে আমি কৃতার্থ হইব’।^১ ‘ইহা কেবল বন্ধুত্বের কার্য নহে, স্বদেশের কার্য’^২ এই কথা মনে করিয়া ‘অভিমানকে সম্পূর্ণ বিসর্জন’^৩ দিয়া তিনি জগদীশচন্দ্রের জন্য অর্থসংগ্রহে ব্রতী হইলেন; জগদীশচন্দ্রকে লিখিলেন, ‘তুমি তোমার কর্মের ক্ষতি করিও না, যাহাতে তোমার অর্থের ক্ষতি না হয় সে ভার আমি লইব।’^৪ ইহাও লিখিলেন, ‘তুমি যাহা করিয়াছ আমরা তাহার উপযুক্ত প্রতিদান কিছুই দিতে পারি না। আমি যে চেষ্টা করিতেছি তাহা কতটুকু এবং তাহার মূল্যই বা কি?’^৫

এই ব্রতোদ্যাপনে রবীন্দ্রনাথের প্রধান সহায় ছিলেন ত্রিপুরার মহারাজা, তাঁহার প্রসঙ্গে সে কথা উল্লিখিত হইয়াছে। তৎকালে ভারতবর্ষে জগদীশচন্দ্রের কর্মক্ষেত্র কিরূপ বাধাসংকুল, রবীন্দ্রনাথ পূর্বাধিই সে কথা জ্ঞাত ছিলেন; অন্যভূমির প্রতি মমত্ববশতঃ জগদীশচন্দ্র দেশে ফিরিয়া আসিতে উৎসুক বৃত্তিতে পারিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব করেন যে, জগদীশচন্দ্র এ দেশে থাকিয়াই স্বাধীনভাবে কাজ করুন—‘কাজ করে তুমি সামান্য যে টাকাটা পাও সেটা যদি আমরা পূরিয়ে দিতে না পারি তাহলে আমাদের দিক’।^৬ এ প্রস্তাব নানা কারণে জগদীশচন্দ্রের

১ দ্রষ্টব্য বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ১৩০

২ বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ১২

৩ বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ৪১

৪ বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ১৭

পক্ষে স্বীকারযোগ্য হয় নাই’ ; অপর পক্ষে ছুটি পাইতে বাধা হইবার সম্ভাবনায়, বিলাতে থাকিয়া বিজ্ঞানচর্চার সুযোগ অকালে নষ্ট হইতে পারে এই আশঙ্কায় রবীন্দ্রনাথ, ১২ ডিসেম্বর [১৯০০] তারিখের পত্রে, বিনা বেতনে জগদীশচন্দ্রের ছুটি লইবার প্রস্তাব করিতেছেন— ‘যদি সে-সম্ভাবনা থাকে তবে তোমার সেই ক্ষতিপূরণের জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টা করিতে পারি।’

৩ মে ১৯০১ তারিখের পত্রে জগদীশচন্দ্র লিখিতেছেন—

‘তোমার নিকট পরামর্শ চাই। অসুভঃ আরও ৫ বৎসর এখানে থাকিতে পারিলে এই কাৰ্য্য কোনরূপে সমাধা হইতে পারে, দেশে ফিরিলে (যতদূর বুদ্ধিতে পারিতেছি) সব কাৰ্য্যের বিরাম। এদেশে আর কিছুকাল থাকিব কি? আরও ইচ্ছা হয় যে জার্মেনী, ফ্রান্স, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে এবিষয় প্রচার করি। কি মনে কর?’

উত্তরে ২১ মে ১৯০১ তারিখে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

‘যদি পাঁচ ছ বৎসর তোমাকে বিলাতে থাকিতে হয় তুমি তারই অন্তে প্রস্তুত হোয়ো। ...তুমি আমাকে একটু বিস্তারিত করে লিখো এই ৫।৬ বৎসর সেখানে থাকতে গেলে ঠিক কী পরিমাণ সাহায্য তোমার দরকার হবে। . . যাতে তুমি স্বচ্ছন্দে ও নিশ্চিন্তচিত্তে সেখানে থেকে তোমার কাজ করতে পার আমি বোধ হয় তার ব্যবস্থা করে দিতে পারব।’

১৭ মে ১৯০১ তারিখের পত্রে জগদীশচন্দ্র লিখিতেছেন—

‘কি করিব বল? আমার দেশে ফিরিবার সময় আসিয়াছে (আগামী

১ জগদীশচন্দ্রের পত্র, ৩ জানুয়ারি ১৯০১, প্রবাসী, শ্রাবণ ১০১১

September মাসে)। সেখানে সমস্ত কাজ ত বন্ধ হইবে। আমি সমস্ত মন দিয়া সমস্ত গোলমাল হইতে দূরে থাকিয়া যদি কার্য্য করিতে পারি, তবে আর দুই বৎসরে যদি কোন প্রকারে কার্য্য সমাধা করিতে পারি। আমাকে যে আর ছুটি দিবে একরূপ বিশ্বাস হয় না।’

উক্তরে ৪ জুন ১৯০১ তারিখে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

‘তোমাকে বারম্বার মিনতি করিতেছি— অসময়ে ভারতবর্ষে আসিবার চেষ্টা করিও না। তুমি তোমার তপস্যা শেষ কর— দৈত্যের সহিত লড়াই করিয়া অশোকবন হইতে সীতা-উদ্ধার তুমিই করিবে, আমি যদি কিঞ্চিৎ টাকা আহরণ করিয়া সেতু বাধিয়া দিতে পারি তবে আমিও ফাঁকি দিয়া স্বদেশের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিব।’

২২ মে ১৯০১ তারিখে জগদীশচন্দ্র লিখিতেছেন—

‘যদি আমার এদেশে অধিক দিন থাকা আবশ্যক মনে কর তবে তোমাকে আসিতে হইবে।’

ইহার পূর্বদিনই (২১ মে ১৯০১) রবীন্দ্রনাথও লিখিয়াছিলেন—

‘আমার ভারি ইচ্ছা করচে আমরা জন দুই তিনে মিলে তোমার ওখানে মাছের ঝোল খেয়ে আগুনের কাছে ঘরের কোণে ঘণ্টা দুই তিনের জন্তে জমিয়ে বসি।’

জগদীশচন্দ্রের ২২ মে ১৯০১ তারিখের পত্র পাইবার পর রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন (৩ জুলাই ১৯০১)—

‘তুমি যদি দীর্ঘকাল যুরোপে থাক তবে যেমন করিয়া হোক একবার সেখানে গিয়া তোমার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিব।’

১৭ সংখ্যক পত্রে [সেপ্টেম্বর ১৯০১] রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

‘বিলাতে ঘাইবার লোভ এখন আমার মনে নাই— কিন্তু একবার

তোমার সঙ্গে দেখা করিয়া কথাবার্তা করিয়া আসিবার জন্য মন প্রায়ই ব্যগ্র হয়। তোমার সার্কুলার রোডের সেই ক্ষুদ্র কক্ষটি এবং নীচের তলায় মাছের কোলের আবাদন সর্বদাই মনে পড়ে।’

পত্র ৬। ‘লোকেনকে ... পারা গেল না।’

বর্তমান প্রসঙ্গে ৫-সংখ্যক পত্রের টীকা দ্রষ্টব্য।

লোকেন্দ্রনাথ পালিত রবীন্দ্রনাথের কোনো গল্পের অনুবাদ প্রকাশ না করিয়া থাকিলেও, রবীন্দ্রনাথের দুইটি কবিতার উহার কৃত অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল— Fruitless Cry (‘নিফল কামনা’) এবং The Death of a Star (‘তারকার আত্মহত্যা’) নামে এই দুইটি অনুবাদ মডার্ন রিভিউ পত্রে ষষ্ঠাক্রমে ১৯১১ সালের মে ও আগস্ট সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রনাথ-কৃত ‘কণিকা’-অনুবাদ প্রভৃতি ইহার পরবর্তী-কালের রচনা বলিয়া মনে হয়।’

পত্র ৭। ‘বিসর্জন নাটকের অভিনয় হইবে, আমি রঘুপতি সাক্ষিব।’

পরবর্তী পত্রেও এই প্রসঙ্গ উল্লিখিত। অভিনয়পত্রী-অনুধারী ভারত সঙ্গীত সমাজে এই অভিনয়ের তারিখ ১ পৌষ ১৩০৭ (১৬ ডিসেম্বর ১৯০০) ; পাত্রগণ—

রাজা গোবিন্দমাণিক্য	শ্রীঅটল কুমার সেন।
নন্দকর রায়	শ্রীঅমর নাথ বসু।
রঘুপতি	শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।
অয়সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র বসু মল্লিক।

১ দ্রষ্টব্য, Ramananda Chatterjee, Foreword, The Golden Book of Tagore

পত্র ৮

মন্ত্রী	শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ ঘোষ ।
চাঁদপাল	শ্রীভূত নাথ মিত্র ।
নয়নরায়	শ্রীবেণীমাধব দত্ত ।
গুণবতী	শ্রীমণীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ।

এই অভিনয়ের তারিখ হইতেও ৭ ও ৮ -সংখ্যক চিঠি দুটির তারিখ অনুমানের সুবিধা হয় ।

পত্র ৮ । ‘আমাকে তুমি কি এক দিগ্গজ পুরাতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া ভ্রম করিয়াছ ?’

এ বিষয় জগদীশচন্দ্রের ৩০ নভেম্বর ১৯০০ তারিখের নিম্নোদ্ধৃত পত্রে উল্লিখিত ; তাঁহার ৩ জানুয়ারি ১৯০১ তারিখের পত্রেও এ প্রসঙ্গ আছে । এরূপ ও অন্যান্য তথ্য -অনুযায়ী ৮-সংখ্যক পত্রের তারিখ অনুমিত । ৩০ নভেম্বরের পত্রে জগদীশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

‘আমাকে Society of Arts বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন । আমার ইচ্ছা ভারতবর্ষীয় পুরাতন বিজ্ঞান সম্বন্ধে বলি । অর্থাৎ ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচর্চা আধুনিক ব্যাপার নহে । এ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় যাহা কিছু পার সংগ্রহ করিয়া একটা প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইবে ।’

পত্র ৮ । ‘শাস্তিনিকেতনের উৎসবের জন্য এক বক্তৃতা’

‘শাস্তিনিকেতনে দশম সাম্বৎসরিক ত্রয়োৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক পঠিত’ ‘ত্রয় মন্ত্র’ পুস্তিকাकारে প্রকাশিত হয় ‘৮ মাঘ ১৩০৭’ তারিখে— অচলিতসংগ্রহ রবীন্দ্র-রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত ।

১ চিঠিখানির এক অংশ প্রবাসীতে মুদ্রিত হয় নাই, উদ্ধৃতি রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত মূলপত্রানুযায়ী ।

পত্র ৮। 'চিরকুমার সভা।'

'চিরকুমার সভা' প্রথমে ভারতী পত্রে ১৩০৭ (বৈশাখ-কার্তিক, পৌষ-চৈত্র) ও ১৩০৮ সালে (বৈশাখ-বৈশাখ) প্রকাশিত হয়— প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত বিভিন্ন পত্রে' দেখা যায় বইখানি বিভিন্ন দফায় লিখিত; ১১ চৈত্র ১৩০৭ তারিখের পত্রে লিখিতেছেন, 'কাল চিরকুমার সভা শেষ করিয়া ফেলিয়া হাড়ে বাতাস লাগাইতেছি'।

পত্র ৮। 'বড় দাদা তাঁহার পাণ্ডুলিপি'২

অ্যামিতিচর্চা আয়োজন বিষয়ে প্রথমে বাসনাব্যবস্থা ছিল— সম্ভবতঃ এই বিষয়ের পাণ্ডুলিপি। এই চিঠির কিছুকাল পূর্বে (১৮২২) তাঁহার "দ্বাদশশ্লোকীয়া বর্জিত অ্যামিতি" প্রবন্ধ ১৩০৬ সালের ভারতী পত্রের ভাদ্র ও আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়— সম্ভবতঃ ইহাই বিদেশে 'ঘাটাই' করিতে পাঠাইয়াছিলেন। অ্যামিতি সম্বন্ধে বিশেষনাথ আরও প্রবন্ধ ও পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন।

জগদীশচন্দ্রের পত্রে (১১ অক্টোবর ১২০১) জানা যায়—

'তোমার দাদার পুস্তক এখানকার এক Mathematical Societyর Secretaryকে দেখিতে দিয়াছিলাম। তিনি বিশেষ যত্ন করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি ingenuityর বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তবে

১ পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ-পুস্তকগুলি

২ মূলপত্র পাওয়া যায় নাই। ইহাতে বঙ্গনীমধ্যে শব্দ দুইটি, অসামান্য-সম্পাদক মহাশয় অর্থবোধ-সৌকর্য্য বঙ্গনীমধ্যে যোগ করিয়া দিয়াছিলেন না অর্থাৎ পত্রের শব্দ অনুমান করিয়া বসাইয়া দিয়াছিলেন এইরূপ মনে হয়। অসামান্যে 'বড় দাদা তাঁহার'-এর পর বঙ্গনীমধ্যে 'পুস্তকের' এবং 'তাঁহার মতে ইহা'র পর বঙ্গনীমধ্যে 'লেখাটা' এই শব্দ ছিল, ইহাও সম্পাদকের যোগ বলিয়া বোধ হয়; অর্থবোধের জন্য শব্দ দুইটি তেমন আবশ্যিক বোধ হয় নাই বলিয়া এই প্রবেশ মুদ্রিত হয় নাই। বঙ্গনীমধ্যে astronomy শব্দটিও এইরূপ সম্পাদকের যোগ হইতে পারে।

পত্র ২, ১০

নূতন notation বলিয়া আপত্তি করিয়াছেন। তাঁহার চিঠি পাঠাই। এখানে Conservation সব দিকেই বেশী, যদি একজন অনেক কাল ধরিয়া নূতন সংস্কা প্রচলিত করিতে না পারেন, তবে তাহা সৰ্বসাধারণে দেখিতে চাহে না।...

পত্র ২। এই পত্র সম্ভবতঃ জগদীশচন্দ্রের ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৯০১ তারিখের পত্র পাইয়া লিখিত। জগদীশচন্দ্র ১০ ডিসেম্বর ১৯০০ তারিখের পত্রে 'আগামী কল্য Operation হইবে' এই সংবাদ দিয়া ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৯০১ তারিখে লিখিতেছেন, 'আরও চার সপ্তাহ পর্যন্ত বিশ্রাম করিতে হইবে, পরে কাজ আরম্ভ করিতে পারিব।' রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, 'এখনো বোধ হয় ডাক্তারের হাতে রহিয়াছ—আমার এই চিঠি যখন পৌঁছবে, আশা করি, ততদিনে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়া উঠিয়াছ।' রবীন্দ্রনাথ যে এই পত্রে লিখিয়াছেন 'তোমার কাজে আমাদের স্বার্থ—সুতরাং সেই কার্য সমাধার ব্যয় আমাদেরই বহনীয়', এ বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা জগদীশচন্দ্রের ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৯০১ তারিখের পত্রে আছে।

পত্র ১০। 'মহারাজের সঙ্গে দার্জিলিঙে আসিয়াছি।'

ত্রিপুরার মহারাজ রাধাকিশোর মানিক্য ১৩১১ ত্রিপুরাব্দ (১৩০৮ বঙ্গাব্দ) ১৪ বৈশাখ তারিখে রবীন্দ্রনাথকে এক পত্রে লিখিতেছেন—

'আপনার পত্র পাঠে আপনি দার্জিলিং যাইতে ইচ্ছুক আছেন জানিতে পারিয়া বড় সুখী হইলাম।... হিমালয়ের মহান সৌন্দর্যের সহিত আপনার কবিতা ও সঙ্গীত সংযোগে আমার অবসরকালের বিশ্রাম কত যে মধুর হইবে তাহাই ভাবিয়া উৎসাহিত আছি। আপনার কবিতার খাতা ও দুই একখানা বই সঙ্গে লইবেন। আমিও

ছুচারখানা সঙ্গে আনিতেছি।... ২৩শে তারিখ সোমবার এখান হইতে যাত্রা করিব। মঙ্গলবার বিকাল বেলা অহুমান ৩টাের সময় কুষ্টিয়া ষ্টেশনে পৌঁছিব। তথা হইতে আমরা একত্রে বাইতে পারি।”

এই ব্যবস্থাক্ষয়ী নির্দিষ্ট দিবসে রবীন্দ্রনাথ এই যাত্রার কার্ডিলিং সিদ্ধাছিলেন ধরিয়া লইয়া এই চিঠির তারিখ অহুমান করা হইয়াছে।

পত্র ১০। ‘বেলায় বিবাহ’

এই বিবাহের তারিখ ১ আষাঢ় ১৩০৮; ত্রুটবা শ্রীঅহুরূপা দেবী, “মাধুরীলতা”, প্রবাসী, পৌষ ১৩৪৮। শ্রীযুক্তা ইন্দ্রিয়াদেবীও বতদূর স্বরণ করিতে পারেন, এই বিবাহের তারিখ ১ আষাঢ়। ১৩০৮ সালে ১ আষাঢ় বিবাহের শুভদিনও ছিল।

পত্র ১০। ‘তুমি এমন কোনও তারহীন বিদ্যাদ-ধান এখনো কি প্রস্তুত কর নাই?’

অগদীশচন্দ্র যেমন তাঁহার বহু চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের কবিতাক বা গল্পের চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথও সেইরূপ তাঁহার চিঠিতে কখনো কখনো অগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের উল্লেখ করিয়াছেন। বৈদ্যাত্তিক তরঙ্গ-সাহায্যে অগদীশচন্দ্র সর্বপ্রথম বিনা ভাবে বার্তাপ্রেরণের সূচনা করেন— রবীন্দ্রনাথ তাহারই কথা এখানে ইঙ্গিত করিতেছেন।

পত্র ১০। ‘বঙ্গদর্শন কাগজখানি পুনর্জীবিত হইতেছে।’

১৩০৮ বৈশাখ হইতে নবপর্ষায় বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয়; রবীন্দ্রনাথ ১৩০৮-১২ এই পাঁচ বৎসর কাল ইহার সম্পাদনা করেন।

পত্র ১০। ‘মহারাজও এই পত্রটিকে আশ্রয় দান করিয়াছেন।’

ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মণিক্য পূর্বোক্ত পত্রে রবীন্দ্রনাথকে

১ এই পত্র রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে।

লিখিতেছেন—

‘বন্ধিমের বঙ্গদর্শনের পুনঃপ্রকাশের সংবাদ অতি সুসংবাদ। ...আমার মতে আপনি অর্গোণে ও অবিচারিত চিত্তে ইহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করুন এবং আমাকে কি কি করিতে হইবে বলুন। আমি সর্বতোভাবে ইহার ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত রহিলাম।’

রবীন্দ্র-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র যাহা লিখিয়াছিলেন রাধাকিশোর মাণিক্যকে লিখিত এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন।’

পত্র ১১। ‘পৃথিবীকে সর্বত্র চিম্টি কাটবার যে উপায়... বের করেছ’ কৃত্রিম চক্ষুর উপর বৈদ্যাতিক তরঙ্গ পড়িলে তাহাতে যে বৈদ্যাতিক প্রবাহ বহিতে থাকে তাহার মূলে আছে এই চক্ষুর ভিতরকার পদার্থের আণবিক পরিবর্তন; জগদীশচন্দ্রের এই মত যখন জয়যুক্ত হইল তখন তিনি স্থির করিলেন যে, আণবিক পরিবর্তন অণু রকম উত্তেজনায়ও হইতে পারে, আর তাহাও সাড়ারূপে দেখা দিবে।

তিনি জড়ের উপর মাদকদ্রব্য, ক্লোরোফর্ম প্রভৃতি উত্তেজক পদার্থ প্রয়োগ করিলেন, তজ্জনিত সাড়া লিপিবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। জড়কে ‘চিম্টি’ কাটিলেন, অবশ্য যন্ত্রের সাহায্যে; চিম্টির পরিমাণ ও তীব্রতা মাপিবারও ব্যবস্থা করিলেন— অমুরূপ সাড়া পাইলেন। এমন সব যন্ত্র তিনি নির্মাণ করিলেন যাহা চালাইলে জড় উদ্ভিদ ও প্রাণীর সাড়ালিপি আপনা হইতে লিপিবদ্ধ হইতে থাকে। তিনি দেখাইলেন যে, একখণ্ড টিন, একটি গাছের ডগা, ব্যাঙের একটি পেশী বাহিরের

উত্তেজনায একই ভাবে সাড়া দেয়।’ এই-সকল পরীক্ষার কথাই রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করিয়াছেন।^১

পত্র ১১। ‘আর একবার আমি লোকেদের সঙ্গে লগনে গিয়েছিলুম ... দুদিন থেকেই নিতান্ত দিক্কারসহকারে সেখান থেকে দৌড় দিয়েছিলুম।’ ‘যুরোপযাত্রীর ডায়ারি’ দ্বিতীয় খণ্ডে এই যাত্রার দিনলিপি আছে। ২২ আগস্ট ১৮৯০ বোম্বাই হইতে যাত্রা করেন, ১০ সেপ্টেম্বর লগুন পৌঁছান, ৯ অক্টোবর লগুন ত্যাগ করেন।

পত্র ১১। ‘বঙ্গদর্শন প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছে।’ নবপথায় বঙ্গদর্শনের ১৩০৮ বৈশাখ সংখ্যা। প্রকাশ-তারিখ বেঙ্গল লাইব্রেরির তালিকা-অনুযায়ী ১৫ মে ১৯০১, অর্থাৎ ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮।

পত্র ১২। এই পত্র জগদীশচন্দ্রের ১৭ মে ১৯০১ তারিখের পত্র পাইয়া লিখিত, এইরূপ অনুমান স্বচ্ছন্দেই করা যাইতে পারে। ১৯০১ সালের ১০ মে রয়াল ইন্সটিটিউশনে জড় ও জীবের সাড়া (On the response of inorganic matter to stimulus) সম্বন্ধে তাঁহার আবিষ্কারের বিষয় আলোচনা করেন, বিদ্বান্ণ গুলোর নিকট উহা বিশেষ সমাদর ও স্বীকৃতি লাভ করে। এই বক্তৃতায় ‘জড় ও জীবের মধ্যে দুর্লভ্য বৈষম্য তিনি ভেদ করিয়া বিজ্ঞানীগণকে সচকিত করিয়া তুলিয়াছেন। আঘাত, উত্তেজনা প্রভৃতি দ্বারা দাতুপদার্থ ও সজীবপদার্থে একই রূপ ফল উৎপন্ন হয়, ইহা পরীক্ষা দ্বারা প্রত্যক্ষ দেখাটয়া তিনি জড়জীবের সাধারণ্য প্রমাণ করিয়াছেন।’^২

১ এই প্রসঙ্গে, পরিশিষ্টে মুদ্রিত রবীন্দ্রনাথের “জড় কি সজীব” প্রদত্ত দৃষ্টব্য— ইচ্ছাতে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সহজ ভাষায় ব্যাখ্যাত। অপিচ দৃষ্টব্য রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্রের ৩ মে ১৯০১ তারিখের চিঠি।

২ রবীন্দ্রনাথ, জড় কি সজীব, দর্শন প্রবন্ধ, পৃ ১১০

এইদিন (৪ জুন ১৯০১) রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের সহধর্মিণীকেও অভিনন্দনস্বাপনপূর্বক পত্র লিখিয়াছিলেন।

পত্র ১২। ‘আমার সভার মধ্যে তুমি তোমার অদৃশ্য কিরণের আলোক জালিয়া দিয়াছ।’

জগদীশচন্দ্র যে বৈজ্ঞানিক তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যাহা আলোকেব সমধর্মী অথচ দৃশ্য নয়, সেই অদৃশ্য আলোকেব কথা রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করিতেছেন।^১

পত্র ১৩। ‘আমার কণ্ঠার প্রতি তোমার উপহার।’

সম্ভবতঃ Joan of Arc-এর জীবনী।^২

পত্র ১৩। ‘আমি সাহসে ভয় করিয়া... তোমার নব আবিষ্কার সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছি’

রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে কেবল উৎসাহবাণী প্রেরণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, বঙ্গদর্শন-সম্পাদক-রূপে স্বয়ং তাঁহার বিজ্ঞানসাধনার বিবরণ বাঙালী পাঠকসমাজে প্রচারে উদ্যোগী হন। এ সম্বন্ধে তাঁহার রচনা দুইটি (“আচার্য্য জগদীশের জয়বার্তা”,^৩ বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১৩০৮ ; “জড় কি সজীব ?”, বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১৩০৮) বর্তমান গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের রচনা পড়িয়া জগদীশচন্দ্র ২৫ জুলাই ১৯০১ তারিখের পত্রে লিখিয়াছিলেন—

‘তুমি যে গত মাসে আমার কার্যের আভাস বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলে

১ এই টীকা এবং ১০ ও ১২-সংখ্যক পত্রে যথাক্রমে তারহীন বিদ্যাদ-বান ও অদৃশ্য কিরণ সম্বন্ধে টীকা, জীতারচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-লিখিত।

২ জড়ব্য জগদীশচন্দ্র বহুর পত্র, ১৪ জুন ১৯০১, প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৩৩

৩ ইহার পরেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা ‘জগদীশচন্দ্র বহু’ মুদ্রিত হইয়াছিল।

তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে। তুমি যে এত সহজে বৈজ্ঞানিক গভা হির রাখিয়া এরূপ সুন্দর করিয়া লিখিতে পার, ইহাতে আমি আশ্চর্য হইয়াছি। আমি অনেক সময় মনে করিয়াছি, যে, বাঙ্গলা কোন মাসিক পত্রে আমার এই নূতন কার্যসম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিব, কিন্তু কথা খুঁজিয়া পাই না বলিয়া সে-ইচ্ছা মনেই রহিয়াছে। যদি তুমি সেগুলি কোনদিন প্রস্তুত করিতে পার, তাহা হইলে সুখী হইব।’

বন্ধু ও আশ্রয় -মণ্ডলীকেও রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের জঘবর্তী -প্রচারে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সহকর্মী জগদানন্দ রায় এই সময় ধারাবাহিকভাবে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সম্বন্ধে প্রবন্ধ সাময়িক পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন, যথা “অধ্যাপক বঙ্গর আবিষ্কার”, ভারতী ১৩০৭, আষাঢ়, শ্রাবণ, কার্তিক।’ রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতৃপুত্র সুরেন্দ্রনাথ ১৩০৮ আষাঢ় সংখ্যা ভারতী পত্রে “বিলাতে অধ্যাপক বঙ্গ” শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন; ১৩০৮ আশ্বিন সংখ্যা বঙ্গদর্শনে রবীন্দ্রনাথের প্রিয়সুহৃৎ রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদীর “অধ্যাপক বঙ্গর নবাবিষ্কার” রচনা মুদ্রিত হয়; রামেন্দ্র-সুন্দরের অপর একটি রচনা, “অধ্যাপক জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার”, ১৩০৮ ভাদ্র সংখ্যা সাহিত্য পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

পত্র ১৪। ইহা জগদীশচন্দ্রের ৬ জুলাই ১২০১ তারিখের পত্র পাইয়া লিখিত, এরূপ মনে হয়। জগদীশচন্দ্র এই চিঠিতে লিখিতেছেন— ‘তোমার পত্র ও কবিতা পাইয়া আমি কিরূপ উৎসাহিত হইয়াছি, তাহা জানাইতে

১ আচার্য জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে জগদানন্দ রায়ের রচনাবলী ১৩১২ সালে “বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার” নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিতেছেন— ‘ঐযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় গ্রন্থপ্রকাশে যে উৎসাহ দিয়াছেন’ ইত্যাদি।

পারি না। তুমি কি জান যে, এই বিদেশে থাকিয়া, দিন রাত্রি পরিশ্রম করিয়া আমার মন কিরূপ অবসন্ন ও শুষ্ক হইয়া গিয়াছে? সম্মুখে অজ্ঞাতরাজ্য, আমি একাকী পথ ধুঁজিয়া একান্ত ক্লান্ত, কখনও একটু আলোক পাই তাহার সন্ধানে চলিতেছি। তোমার স্বরে আমি কীর্ণ মাতৃস্বর শুনিতে পাই— সেই মাতৃদেবী ব্যতীত আমার আর কি উপাস্ত আছে? তাঁহার বরেই আমি বল পাই আমার আর কে আছে? তোমাদের স্নেহে আমার অবসন্নতা চলিয়া যায়, তোমরা আমার উৎসাহে উৎসাহিত, তোমাদের বলে আমি বলীয়ান্। তোমাদের আশাতে আমি আশাবিত। আমি আর নিজের সুখ-দুঃখের কথা ভাবিব না; কি করিতে হইবে বলিও। তোমরা যে আমাকে ঘিরিয়া আছ, আমি যে একাকী নই, তাহা এখন বুঝিতে পারিয়াছি। তবে আমি যে কার্যভারে ও নিরাশায় অনেক সময় অবসন্ন হইয়া পড়ি, একথা মনে রাখিও, মাঝে মাঝে তোমাদের উৎসাহবাক্যে আমাকে পুনর্জীবিত করিও।

‘আর-একটা কাজ তোমাকে করিতে হইবে। তুমি যদি আমাকে তোমার হৃদয়ে স্থান দিয়া থাক, তাহা হইলে তুমি আমার সুখে সুখী, আমার কষ্টে দুঃখী। আমি আমার সম্মানের কার্য ভিন্ন অন্য কথা ভাবিতে পারি না, ভাবিলেও কি উচিত বুঝিতে পারি না। আমার কি শ্রেয়ঃ তুমিই তাহা আমার হইয়া স্থির করিও। তুমি আমার সমস্ত বিষয় জানিয়া যাহা ভাল তাহা স্থির করিও।...

‘আমি দুই বৎসরের Extentionএর জন্য India Officeএ আবেদন করিয়াছিলাম।... হঠাৎ খবর পাইলাম, যে, যদিও আমার scientific work is very important, yet the Secretary of State regrets, ইত্যাদি।...

ইতিমধ্যে British Association ইত্যাদি স্থান হইতে নিয়ন্ত্রণ পাইয়াছিল। আন্তে আন্তে আমার মত যে গৃহীত হইল তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছিল, কিন্তু এই সংবাদে সমস্ত ছাড়িয়া গেল। বন্ধ, তুমি কি আমার মনের কষ্ট বুঝিতে পার ?

‘আমি কি করিব জানি না। ফার্লোর ক্ষমত আবেদন করিব, কিন্তু যদি আমার এদেশে থাকা তাহাদের অনভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে যে ছুটি পাইব মনে হয় না।

‘তুমি তপস্কার কথা লিখিয়াছ ; বল ত আমি কি করিয়া মনস্থির করিতে পারি।...

‘যদি তুমি বল তাহা হইলে একবার দেশে থাকিয়া সমস্ত ছাড়িয়া এদেশে থাকিব।’

পত্র ১৪। ‘কল্লাকে ইতিমধ্যে স্বামীগৃহে রাখিয়া আসিলাম।’

রবীন্দ্রনাথ আষাঢ় মাসে মজঃফরপুর গিয়া থাকিবেন ; ১ আষাঢ় ১৩০৮ (জুলাই ১২০১) তথায় তাঁহার সংবর্ধনা।^১ এই পত্রের কাল এই সংবাদেও অজ্ঞান করা যায়।

পত্র ১৪। ‘শান্তিনিকেতনে... একটা নির্জন অধ্যাপনের ব্যবস্থা করিবার চেষ্টায় আছি।’

এই পত্র লিখিবার কয়েক মাস পরে, ১৩০৮ সালের ৭ পৌষ তারিখে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। যে কল্লনা-দ্বারা উদ্ভূত হইয়া রবীন্দ্রনাথ এই বিদ্যালয় স্থাপন করেন, পরবর্তী কয়েকখানি চিঠিতে তাহার উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছেন।

১ এযাসী ভাত্র ১৩০৮

পত্র ১৫। ‘আজ রমেশবাবুর চিঠি পাইয়া বিশেষ উৎসাহিত হইয়াছি।’
পঞ্চম পরিশিষ্টে এই চিঠিখানি মুদ্রিত হইল; মূল পত্র শাস্তিনিকেতন
রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে। রমেশচন্দ্রের চিঠির তারিখ (১৬ জুলাই
১৯০১) হইতেই রবীন্দ্রনাথের চিঠির তারিখ অনুমিত হইয়াছে।

২০ জুলাই ১৯০১ তারিখের পত্রে রমেশচন্দ্র দত্ত -প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্র
রবীন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন—

‘রমেশবাবুর সহিত সেদিন দেখা হইয়াছিল। তিনি আমার দেশে
ফিরিয়া যাইবার কথায় পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেন। একবার এইভাবে
বাধা পাইলে যে আর ফিরিয়া যাইব না, তাহা বুঝিতে পারি। এদিকে
দেশের মায়ার বন্ধনও সম্পূর্ণ কাটাইতে পারি নাই। কি করিব কিছুই
স্থির করিতে পারি না। তোমার পত্র পাইলে স্থির করিব।’

পত্র ১৫। ‘তোমার স্পন্দন-রেখার খাতাখানি... বঙ্গদর্শনে এইগুলি
খোদাইয়া ছাপাইবার ইচ্ছা আছে।’

১৩০৮ আশ্বিন সংখ্যা বঙ্গদর্শনে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর “অধ্যাপক
বঙ্গ নবাবিকার” প্রবন্ধে এই রেখাচিত্রগুলিই মুদ্রিত হইয়া থাকিবে।

৩০ আগস্ট ১৯০১ তারিখের পত্রে, রবীন্দ্রনাথকে বর্তমান চিঠির
প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্র লিখিতেছেন—

‘তুমি আমাকে কয়মাসের জন্য আসিতে লিখিয়াছ, “সকল কথা
পরীক্ষার রূপে আলোচনা করিয়া লইতে।” তুমি আমাকে ছাড়িয়া দাও,
যাহা ভাল মনে কর, আমার হইয়া কর। আমি কেবল এক কাজ বুঝি,
আর বাকী সব তোমরা আমার হইয়া কর। আমি এখন ভাবে আবিষ্ট
হইয়া আছি। তাহা যদি কিছুদিনের জন্য ছাড়িয়া দেই, তবে সূত্র
পুনরায় ধরিতে পারিব কি না এই ভয় হয়। এই দেখ, এইমাত্র একটি

আশ্চর্য্য Experiment করিয়া আসিলাম, জন্তু এবং অ-জীবের মধ্যে ভয়ানক মস্ত একটা ব্যবধান, তাই সেতু বাধিবার জন্ত উদ্ভিদের জীবন-স্পন্দন-রেখা আছে কি না তার চেষ্টা করিতেছিলাম। এইমাত্র অত্যাশ্চর্য্য পরীক্ষার ফল পাইলাম— এক ! এক ! সব এক ! ... বন্ধু, আমি শত জীবনে ইহার চিন্তা করিতে পারিব না— আমি সব দেখিতেছি— কেবল সময়ভাব। আমি কি করিয়া এসব ফেলিয়া একদিনের জন্তুও চলিয়া আসি ? একজন্তু আমাকে একেবারে ছাড়িয়া দাও। কেবল তুমি কয়মাসের জন্তু এখানে আইস।’

পত্র ১৬। ‘তোমার ছবি আজ পাঠিয়া’

এই চিঠি জগদীশচন্দ্রের ২৫ জুলাই ১৯০১ তারিখের চিঠির উত্তর ; জগদীশচন্দ্রের এই চিঠির তারিখ হইতে রবীন্দ্রনাথের চিঠির তারিখ অনুমিত। জগদীশচন্দ্রের এই পত্রে ছবি পাঠাইবার উল্লেখ আছে। এই কোটোগ্রাফ শাস্ত্রনিকেতনের রবীন্দ্রসদনে স্থগিত, বর্তমান গ্রন্থে মুদ্রিত হইল। রবীন্দ্রনাথের এই পত্রে যে ‘শিলাইদহের গুপ’ ছবির উল্লেখ আছে রবীন্দ্রসদন-সংগ্রহ হইতে তাহাও মুদ্রিত হইল।

পত্র ১৬। ‘তোমার প্রেরিত আশা ছবিখানি।’

জগদীশচন্দ্র এই ছবির প্রতিলিপি পাঠাইয়া উক্ত পত্রে লিখিয়াছিলেন—
‘আর একখানা ছবি তোমার বসিবার ঘরে রাখিও। ‘ঘাটের’ “আশা” অঙ্ক-বালিকা— যহ্নের তদ্বী ছিঁড়িয়া গিয়াছে, কেবল একটিমাত্র অবশিষ্ট আছে, তাহাই বাছাইতে চেষ্টা করিতেছে।

‘আমাদের আশাও এই ভগ্নতরুর মত।’

পত্র ১৬। 'মহারাষ্ট্র দেশে ত তিলক ও পরাঙ্গণে আছে'

লোকমান্য তিলক এবং তাঁহার অস্তুত্ব স্বহৃৎ জি. জি. আগরকর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি লাভ করিবার পর স্থির করেন যে তাঁহারা সরকারি চাকুরি গ্রহণ না করিয়া দেশে স্বল্পব্যয়ে শিক্ষাপ্রসারের ব্যবস্থা করিবেন। ইহাদের সঙ্গে যোগ দেন বিষ্ণুশাস্ত্রী চিপালংকার। ১৮৮০ খৃস্টাব্দে ইহাদের চেষ্টায় পুনা ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। অল্পদিনের মধ্যেই এই বিদ্যালয় বিশেষ জনপ্রিয় হয়। তিলক ও তাঁহার সহকর্মীগণ মহারাষ্ট্রে সুপরিচালিত প্রশালীতে শিক্ষা-প্রসারের জন্য একটি সমিতি স্থাপনের প্রয়োজন অনুভব করেন; ফলে ১৮৮৪ সালে ডেকান এডুকেশন সোসাইটি স্থাপিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য ছিল 'to facilitate and cheapen education by starting, affiliating and incorporating at different places, as circumstances permit, schools and colleges under private management or by any other ways best adapted to the wants of the people.'

এই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া ডেকান এডুকেশন সোসাইটি সুবিখ্যাত ফার্মগুসন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিলক এই কলেজে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত গণিত ও সংস্কৃতের অধ্যাপনা করিয়াছেন। রঘুনাথ পুরুষোত্তম পরাঙ্গণেও বিশেষ ত্যাগস্বীকার-পূর্বক এই কলেজে (১৯০২-২৪ সাল) যোগ দেন। মহারাষ্ট্রের অনেক সুসন্ধান এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন, পরে ষাাহাদের নাম উক্ত আছে তাঁহাদের কথাই উল্লিখিত হইল। ডেকান এডুকেশন সোসাইটি ফার্মগুসন কলেজ ব্যতীত আরও অনেকগুলি শিক্ষায়তন স্থাপন করেন।^১

১ এই তথ্য ইতিহাসরচন দল্লোপাধ্যায়ের সৌজন্যে সংকলিত।

পত্র ১৬। 'বিংশ শতাব্দীতে নৈবেদ্যের যে-সমালোচনা'

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় তাঁহার *Twentieth Century* পত্রের (প্রকাশ ১২০১) ৩১ জুলাই ১২০১ তারিখের সংখ্যায় নবহরি দাস এই ছদ্মনামে নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থের (আঘাত ১৩০৮) সুদীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন; ঐ পত্রিকা দুপ্রাপ্য বলিয়া, রচনার নিদর্শন-রূপে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইল—

'Naivedya is a natural offering of the human heart to the Divine—an offering of joy and sorrow, of struggle and fruition, of all-embracing love, of national aspiration and desire for union with the Unrelated....In all places of worship, be they Christian, Muhamedan or Hindu, the hundred sonnets can be recited or sung without scruple...The poet has sung again the old song of the Upanishads in a new strain and let it rise as a cry of our people to heaven, as a memorial for Divine grace. Naivedya is the essence of *Bhakti* made compatible with the knowledge of the transcendent Reality before whose splendour the shadow of relationship is changed into light. The sonnets are like so many brilliant pearls illuminated with Divine grace...'

এই সমালোচনাসূত্রেই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সহিত রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়; জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ এই সমালোচনার কথা বারবার স্মরণ করিয়াছেন। 'আশ্রমবিদ্যালয়ের সূচনা' প্রবন্ধে (১৩৪০) রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

‘এমন সময় ব্রহ্মবাক্তব উপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। আমার নৈবেদ্যের কবিতাগুলি প্রকাশ হচ্ছিল তার কিছুকাল পূর্বে। এই কবিতাগুলি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তাঁর সম্পাদিত Twentieth Century পত্রিকায় এই রচনাগুলির যে প্রশংসা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন সেকালে সেইরকম উদার প্রশংসা আমি আর কোথাও পাই নি। বস্তুত এর অনেক কাল পরে এই সকল কবিতার কিছু অংশ এবং খেয়া ও গীতাঞ্জলি থেকে এই জাতীয় কবিতার ইংরেজি অনুবাদের যোগে যে সম্মান পেয়েছিলাম তিনি আমাকে সেইরকম অকুণ্ঠিত সম্মান দিয়েছিলেন সেই সময়েই।’

এই সময় রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিতেছেন, এই উদ্যোগে তিনি ব্রহ্মবাক্তব উপাধ্যায়কে প্রধান সহযোগী-রূপে লাভ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন—

‘এই পরিচয় উপলক্ষেই তিনি জানতে পেরেছিলেন আমার সংকল্প, এবং খবর পেয়েছিলেন যে, শাস্ত্রিনিকেতনে বিদ্যালয়স্থাপনের প্রস্তাবে আমি পিতার সম্মতি পেয়েছি। তিনি আমাকে বললেন, এই সংকল্পকে কার্ধে প্রতিষ্ঠিত করতে বিলম্ব করবার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর কয়েকটি অল্পগত শিষ্য ও ছাত্র নিয়ে আশ্রমের কাজে প্রবেশ করলেন।... তখন উপাধ্যায় আমাকে যে গুরুদেব উপাধি দিয়েছিলেন আজ পর্যন্ত আশ্রমবাসীদের কাছে আমাকে সেই উপাধি বহন করতে হচ্ছে।’

পত্র ১৬। ‘আমার মধ্যম কন্যা রেণুকার বিবাহ হইয়া গেছে।’

১ আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, পৃ ৩০-৩১

২ আশ্রমের রূপ ও বিকাশ, পৃ ৩১-৩২

বিবাহের তারিখ ২৪ শ্রাবণ ১৩০৮।^১

‘একটি ডাক্তার’, মতোজনাথ ভট্টাচার্য।

‘তোমার বন্ধু’, রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা মীরা।

পত্র ১৭। ‘মিস নোবল’

মার্গারেট নোবল, ডগিনী নিবেদিতা (জন্ম ২৮ অক্টোবর ১৮৬৭, মৃত্যু ১৩ অক্টোবর ১৯১১)। ইনি অগদীশচন্দ্রের একজন প্রধান উৎসাহদাত্রী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়— ‘অগদীশচন্দ্রের জীবনের ইতিহাসে এই মহনীয় নারীর নাম সন্মানের সঙ্গে বন্ধার যোগ্য।’^২ রবীন্দ্রনাথের সহিতও এই সূত্রে নিবেদিতার সৌহৃদ্য অস্তিত্ব ছিল। নিবেদিতার ভাষায়— ‘You are so dear to my friend Dr. Bose, that I cd. not help hoping you sd. be my friend too !’^৩

অগদীশচন্দ্রের বিলাতপ্রবাসকালে তাঁহার অধিবর্তা ডগিনী নিবেদিতাও অনেকসময় রবীন্দ্রনাথকে জানাইয়াছেন। এই পত্রে উল্লিখিত চিঠিখানি পাওয়া যায় নাই ; রবীন্দ্রনাথকে লিখিত ডগিনী নিবেদিতার অপর দুইখানি চিঠির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, পঞ্চম পরিশিষ্টে সেগুলি মুদ্রিত হইল ; মূলপত্র শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, নিবেদিতার সহিত রবীন্দ্রনাথেরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিয়াছিল ; তিনি শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথের আতিথ্যও স্বীকার করিয়া-

১ ক্রষ্টীয় দ্বিভাষ্য পত্রিকা, আশ্বিন ১৩৪৯, দ্বাধাকিশোর বাপিক্যকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র, ২৪ শ্রাবণ ১৩০৮, ‘আজ আমার মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী রেণুকায় বিবাহ। পাত্রটি মনের মত হওয়ার দুই তিন দিনের মধ্যেই বিবাহ হির করিয়াছি।’

২ ক্রষ্টীয় বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ১২৮

৩ ক্রষ্টীয় বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ১৪০

ছেন। রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়াল গল্পেব তিনি ইংরেজি অনুবাদ
করিয়াছিলেন, নিবেদিতার মৃত্যুর পর তাহা প্রকাশিত হয়।^১

নিবেদিতার সহিত রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' চরিত্রের যোগাযোগেব
বিষয়ে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র-জীবনী^২ গ্রন্থে বিস্তারিত
আলোচনা আছে। রবীন্দ্রনাথ গোরা'র ইংরেজি অনুবাদক উইলিয়াম
উইলিংট্যানলি পিয়ার্সনকে এক পত্রে (১৯২২) লেখেন—

You ask me what connection had the writing of
Gora with Sister Nivedita. She was our guest in
Shilida and in trying to improvise a story according
to her request I gave her something which came very
near to the plot of *Gora*. She was quite angry at
the idea of *Gora* being rejected even by his disciple
Sucharita owing to his foreign origin. You won't find
it in *Gora* as it stands now— but I introduced it in
my story which I told her in order to drive the point
deep into her mind

নিবেদিতার মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ প্রবন্ধ^৩ এই 'লোকমাতা'ব
'অমর জীবন'এর কথা— 'আমরা আমাদের চোখেব সামনে মতীর এই
যে তপস্যা দেগিলাম' তাহার স্বরূপ— বিবৃত করিয়াছেন।

১ *The Modern Review*, January 1912

২ দ্বিতীয় খণ্ড (১:৫৫), পৃ ২১৬-১৮

৩ Rabindranath Tagore, "Letters to W. W. Pearson", *The
Visva-Bharati Quarterly*, August-October 1943, p. 179

৪ 'ভগিনী নিবেদিতা' (১৯১৮), পরিচয়। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৮শ খণ্ড। এই
প্রবন্ধের আংশিক অনুবাদ ভগিনী নিবেদিতার *Studies from an Eastern Home*
(1913) গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় পরিশিষ্টে মুদ্রিত 'আচার্য্য জগদীশেব জয়বাস্তা' প্রবন্ধে যে 'বিদ্যুৎ ইংরাজ মহিলা'-প্ৰেবিত বিবরণ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তাহাও সম্ভবতঃ ভগিনী নিবেদিতা -কৃষ্ণ বসুনাথকে লিখিত ।

পত্র ১৭ । 'তোমার বন্ধুত্ব যে আমাকে জানিতাম না।'

এই উক্তি প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্র বসুনাথকে ১৫ অক্টোবর ১৯০১ তারিখের পত্রে লিখিতোছেন—

'তুমি লিখিয়াছ, আমার বন্ধুত্ব তোমাকে এমন প্রবল ও গভীর ভাবে আকৃষ্ট করিবে তাহা এক বৎসর পূর্বে জানিতাম না। হয়ত জানি না যে, আমার অবস্থাও ঐরূপ। কেন আকৃষ্ট হইয়াছি তাহাব কারণ এষ্ট যে জনয়ের অনেক আকাঙ্ক্ষা বাহা আমার মনেই থাকিত তাহা তোমার মুখে তোমার লেখাতে পরিষ্কৃত দেখিতে পাই। নিবাসাব মতো কে মন বাধিতে পারে? তবুও এক বিশ্বাস যে আমরা একদিন আলোর সন্ধান পাইবই, সেই আশায় তোমাকে দেখিরা বিশ্বস্ত হইয়াছি। তুই অভ্যস্তের শত্রু হইতে আমাদেরকে রক্ষা করিবে হইবে,— প্রথম বিখ্যাত অভিমাত্রী স্বভাববৎসল, আর স্বার্থে সম্বন্ধ স্বভাবিত্রাহী। আমার মনে হয় এমন বিনয়ী, বিশ্বাসী, বৈশাখালী স্বভাবিত্রাহকের সংখ্যা দিনদিন বৃদ্ধিত হইতেছে। তুমি ইহাদিগকে আকৃষ্ট করিবে এবং একসঙ্গে গ্রথিত করিবে। তুমি যে নতুন বিজ্ঞানমূল্যবান তাহাতে সূচী হইলাম। বৎসরে ২৫টি পুরুষ যদি এই ভাবে প্রণোদিত হয়, তাহা হইলে আমরা বিনষ্ট হইব না।

১ বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ১০২-১১২

২ বসুনাথ পুস্তকটিতে 'বিশ্বাসী' কথন 'বিশ্বাসী' পদটি বাদ হইতে দেখা হইবে এই সংবাদ দিয়াছিল।

‘তুমি জান না তোমার পত্র পাইয়া আমি কিরূপ আশ্বস্ত হই। আমার পদে পদে কত বিষ তাহা তুমি মনেও করিতে পার না। আমি কখন কখন একেবারে নিরাশ্বাস হই।’

১৭-সংখ্যক পত্রের উত্তরেই জগদীশচন্দ্রের এই চিঠি লিখিত এইরূপ মনে করিয়া ১৭-সংখ্যক পত্রের তারিখ অনুমান করা হইয়াছে।

পত্র ১৮। ‘বর্তমান সঙ্কট।’

ইতিপূর্বে জগদীশচন্দ্র লিখিয়াছিলেন (৬ সেপ্টেম্বর ১৯০১)—

‘আমার deputationএর extension পাইলাম না। ফাল্গুন দিয়াছে। তৎক্ষণাৎ বিবিধ গোলমাল সহ করিতে হইবে। এ কয়মাস যাহা করিয়াছি এখন তাহার অর্ধেক কাটা যাইবে। ইহাতে কতদিন থাকিতে পারিব জানি না। আর জার্মেনী ও আমেরিকা যাওয়ার আশা ত্যাগ করিতে হইবে।

‘তোমরা যদি পার তবে আমার মুক্তির সংবাদ শীঘ্র দিবে। আমার মন দিতে পারিতেছি না। যদি আমার কার্য নিরূপদ্রবে কয়বৎসর পর্যন্ত না করিতে পারি তবে হাত দিয়া কোন লাভ নাই।

‘আমি যাহা করিতেছি তাহা অনেক প্রচলিত মতের বিরুদ্ধ।...এই-জন্ত এই কার্যে হাত দিতে হইলে বন্ধ সংস্কারের সহিত অনেক দিন ধরিয়া যুদ্ধ করিতে হইবে।... আমি প্রস্তুত আছি ... আমাকে যদি নিশ্চিত করিতে পার যে, আমার কার্যের ব্যাঘাত হইবে না, তবে আমি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব।’

সম্ভবতঃ এই সংকটের কথাই রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করিয়াছেন। ১১ অক্টোবর ১৯০১ তারিখের পত্রেও জগদীশচন্দ্র এই বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

এই সময় রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্রের আর-একখানি পত্র (২২ নভেম্বর ১৯০১) বিশেষ ভাবে উদ্ধারযোগ্য—

‘গাছ মাটি হইতে রস শোষণ করিয়া বাড়িতে থাকে, উদ্ভাপ ও আলো পাইয়া পুষ্পিত হয়। কাহার গুণে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইল?— কেবল গাছের গুণে নয়। আমার মাতৃভূমির রসে আমি জীবিত, আমার স্বভাতির প্রেমালোকে আমি প্রস্ফুটিত। যুগ যুগ ধরিয়া হোমানলের অগ্নি অনির্কাপিত রহিয়াছে, কোটি কোটি হিন্দুসন্তান প্রাণবায়ু দিয়া সেই অগ্নি রক্ষা করিতেছেন, তাহারই এক কণা এই দূরদেশে আসিয়া পড়িয়াছে। আমি যে তোমাদেরই প্রাণের অংশ, তোমাদেরই স্নেহ-দুঃখের অংশী, সর্বদা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দাও। তাহা হইলে আমি শত বাধা পাইয়াও ভগ্নোন্ময় হইব না এবং তোমাদের জন্ত জয়লাভ করিব।’

পত্র ১২। ‘আজ তোমার জয় সংবাদ পাইয়া’

জড়, উদ্ভিদ, জীবের সাড়া (‘Electric Response of Metal and of Ordinary Plants’) সম্বন্ধে ১৯০১ সালের জুন মাসে রয়াল সোসাইটিতে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, কোনো কোনো বৈজ্ঞানিকের আপত্তির ফলে সোসাইটি তাহা প্রকাশ করেন নাই। ১৯০২ সালের মার্চ মাসে জগদীশচন্দ্র “Biology সম্বন্ধে সর্কপ্রধান Society” Linnean Societyতে পুনরায় ঐ বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তাঁহার আবিষ্কার প্রচার করেন; এই সভায় কোনো বৈজ্ঞানিক আর তাঁহার প্রতিবাদ করেন নাই। এই সভার বিবরণ দিয়া জগদীশচন্দ্র ২১ মার্চ [১৯০২] তারিখের পত্রে রবীন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন—

‘আজ আমার কর্ণে এখনও রণক্ষেত্রের হুমুভি বাজিতেছে, কারণ

এইমাত্র আমি সংগ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। তুমি আমার জয়-সংবাদে সুখী হইবে। ... সমবেত Physiologist-Biologist-প্রমুখ বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী, তাহার মধ্যে তোমার বন্ধু একাকী এই প্রতিপক্ষ-কূলের সহিত সংগ্রামে নিযুক্ত। ১৫ মিনিটের মধ্যেই বৃষ্টিতে পারিলাম যে রণে জয় হইয়াছে। ... এতদিন পর আমার এই প্রথম সংগ্রামে কৃতকাৰ্য্য হইয়াছি।’

১৯-সংখ্যক পত্র জগদীশচন্দ্র এই চিঠি পাইয়া লিখিত, এই অনুমানে তাহার তারিখ এপ্রিল ১৯০২ নির্দেশ করা হইয়াছে। ‘গতকাল প্যারিসে তোমার বলিবার কথা ছিল’ ইহাও ১৯০২ সালের এপ্রিল মাসের কথা, জগদীশচন্দ্র ৪ এপ্রিল ১৯০২ তারিখের পত্রে রবীন্দ্রনাথকে প্যারিস হইতে লিখিতেছেন—‘এখানে ৪ স্থানে বক্তৃতার জন্য আহূত হইয়াছি।’

পত্র ২০। ‘তুমি কি আমাদের মত লোকের কাছ হইতে বলের বা উৎসাহের অপেক্ষা রাখ?’

১ মে ১৯০২ তারিখের চিঠিতে জগদীশচন্দ্র লিখিতেছেন—

‘তোমার নিকট কত বিষয় বলিবার আছে, কিন্তু পত্রে কথা পরিস্ফুট হয় না। উৎসাহ কিম্বা অবসাদের সময়ে তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করে। অধিকাংশ সময়েই ত অবসাদ, সুতরাং তোমার সান্নিধ্য অনুভব করিতে ইচ্ছা হয়। সেদিন তোমার কতগুলি কবিতা পড়িতেছিলাম, সেই শিলাইদহের প্রাস্তর, ও নদী, সেই আকাশ ও বালুর চর আমার চক্ষের সম্মুখে ভাসিতেছে। বলিতে পার কি এই হৃদয়ের আকর্ষণের অর্থ কি? তোমার কি মনে হয় যে এই পৃথিবীর ছায়ার অন্তরালে আত্মা আত্মার সহিত অভিন্ন হইয়া যায়?’

‘তুমি ত এতদিন নিৰ্জনে সাধনা করিয়াছ, বলিতে পার কি, কি করিলে সুখ দুঃখের অতীত হইতে পারা যায়? একদিন ভারতে সুদিন আসিবেই, কিন্তু একথা সৰুদা মনে থাকে না। ইহা যে সত্য, একথা আমার মনে মুদ্রিত করিয়া দাও। একটা আশা না থাকিলে আমার শক্তি চলিয়া যায়।’

২০-সংখ্যক পত্র এই চিঠির উত্তরে লিপিত হইতেও পারে এই অনুমানে উহার তারিখ কল্পিত হইয়াছে। জগদীশচন্দ্রের পূর্বপত্রের (৮ এপ্রিল ১৯০২) উত্তরেও ২০-সংখ্যক চিঠি লিপিত হইয়া থাকিতে পারে। উহাতে জগদীশচন্দ্র লিপিতেছেন—

‘তুমি মনে কর যে আমি সৰুদাটী কৰ্ম-সাধনে উনুগ। তুমি যদি জানিতে যে প্রতিমূহুর্তে আমাকে নিঃস্বপ্ন সহিত কত সংগাম করিতে হয়। আমার মন সৰুদা ছুটিয়া যাইতে চাহে, এষ্ট অবিরাম যুদ্ধিয়া আমি ক্লান্ত হইয়াছি। স্বভাবের কোড়ে, যেখানে সমস্ত নিশ্চক, সমস্ত শাস্তিময়, সেখানে মন ছুটিয়া যায়। তোমরা যদি নিরাশ্রম হও তবে আমি একা যুদ্ধিয়া কি করিব?’

রবীন্দ্রনাথের রচনায় জগদীশচন্দ্র এষ্ট সময় বিরূপ আবিষ্ট হইয়া ছিলেন তাহার নিদর্শন-স্বরূপ জগদীশচন্দ্রের ৩০ মে ১৯০২ তারিখের পত্র উদ্ভূত করা যাইতে পারে—

‘এতকাল কেবল কৰ্মসংবাদ লিপিয়াছি। একদিনও মন খুলিয়া চিঠি লিপিতে সময় পাই নাই। আজ আর-সব কথা ভুলিয়া তোমার গৃহে অতিথি হইলাম। এক এক সময় মনে হয় দূর চটক দুঃখের কথা—মানুষের হৃদয় বলিয়া ত একটা জিনিস আছে। সজ্জার পর তোমার ঘরে যেন বসিয়াছি। আমার ক্রোড আমার ছোট বন্ধুটি বসিয়া আছে,

অদূরে বন্ধুভাষা, আর তুমি তোমার লেখা পড়িয়া শুনাইতেছ। আমি তোমার লেখাগুলি পড়িতেছিলাম, তোমার স্বর যেন শুনিতে পাইতেছি। তুমি যে কালিদাসের সময়ের কথা লিখিয়াছ,^১ মনে হয় যেন পূর্বজন্মের কথা শুনিতেছি। সে সব দিনের কথা স্মরণ করিয়া মন কেমন পুলকে বিহ্বল হয়। একরূপ মধুর স্মৃতি, একরূপ উজ্জ্বল সরল প্রেম, একরূপ সুখ, একরূপ কল্যাণ, অশ্রু কোন আতিতে কি কখনও ছিল? তোমার আর একটি কথা আমার নিকট বড়ই ভাল লাগিয়াছে— সে কথা কল্যাণী^২— তুমি ঠিকই বলিয়াছ একধার অর্থ অশ্রু ভাষায় প্রকাশ পায় না।’

স্বীয় আবিষ্কার-বর্ণন-সূত্রে ঐ পত্রেরই জগদীশচন্দ্র লিখিতেছেন—

‘আগামী সপ্তাহে Photographic Societyতে বক্তৃতার সম্বন্ধে অক্ষুণ্ণ হইয়াছি— দৃষ্টি ও ফটোগ্রাফী সম্বন্ধে বলিতে হইবে। চক্রে বে-ছায়া পড়ে তাহা মিলাইয়া যায়, কেবল তাহার প্রতিধ্বনি সুপ্ত ও জাগরিত স্মৃতিরূপে থাকিয়া যায়। কিন্তু photoর ছবি একেবারে অপরিবর্তিতরূপে মুদ্রিত হইয়া যায়। কি করিয়া সেই আণবিক আড়ষ্টতা (molecular arrest) সাধিত হয় তাহার সম্বন্ধে অতি আশ্চর্য্য experimentএ সফলতা লাভ করিয়াছি। ইঠাং মনে হইল, তুমি আমার আবিষ্কার চুরী করিয়া ইতিপূর্বে কবিতারূপে প্রচার করিয়াছ।^৩ স্বরদাস যখন তাহার চক্ষু শলাকাবিদ্ধ করিতে যাইতেছিল তখন তাহার মনে হইল যে, চির-অন্ধকারে পলকহীন স্মৃতি চিরমুদ্রিত থাকিবে।’

১ জগদীশচন্দ্র সম্ভবতঃ এই কবিতার কথা উল্লেখ করিতেছেন— ‘সেকাল’, ‘আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে’, কণিকা (১৯০০)।

২ সম্ভবতঃ কণিকা কাব্যগ্রন্থের ‘কল্যাণী’ কবিতার স্মরণে।

৩ জগদীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মানসী গ্রন্থের (১৮৯০) ‘স্বরদাসের প্রার্থনা’ কবিতার উল্লেখ করিতেছেন।

পত্র ২১। 'আমি বোধ হয় দুই এক মাসের মধ্যেই তোমাকে কিছু সাহায্য করিতে পারিব— তাহার ব্যবস্থা করিমাছি।'

বর্তমান গ্রন্থের ১৩৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত রাধাকিশোর মাপিকাকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের ২৪ শ্রাবণ ১৩০২ তারিখের চিঠি দ্রষ্টব্য।

পত্র ২১। 'আমার শাস্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে একটি জাপানী ছাত্র সংস্কৃত শিখিবার জন্য আসিয়াছে।'

ইহার নাম হোরি মান। 'ওকাকুরার ব্যবস্থায় নব-প্রতিষ্ঠিত শাস্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে আসেন হোরি মান সংস্কৃত পড়িতে ... সম্রাস্ত সামুদ্রাই বংশে তাঁহার জন্ম— ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রথম বিদেশী ছাত্র তিনি। হোরি না জানিতেন ইংরেজি, না জানিতেন অন্য কোনো ভারতীয় ভাষা। কিন্তু কী নিষ্ঠার সহিত জ্ঞানার্জন শুরু করেন। অকালে পঞ্জাব ভ্রমণে গিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। ঘটনাটি [এই ছাত্রের আগমন] অতি সামান্য— এত সামান্য যে উল্লেখযোগ্য নহে; কিন্তু ভারতের ও পূর্ব-এসিয়ার বিস্তৃত আধ্যাত্মিক যোগকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার দিকে জাপানের ইহাই প্রথম প্রয়াস।'^১

পবিত্রকালে চীন-জাপানের সহিত ভারতের যোগ পুনঃস্থাপনকল্পে রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগ বহুবিদিত। আলোচ্য পর্বেও শাস্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করিয়া এ বিষয়ে যে-সকল কল্পনা চলিতেছিল রবীন্দ্রনাথকে লিখিত অগদীশচন্দ্রের নিম্নোদ্ধৃত চিঠিখানি (১ জানুয়ারি ১৯০৩) হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়—

'তোমার স্কুলের কথা সর্বদাই ভাবিতেছি। বতই ভাবি ততই ভবিষ্যতে ইহা হইতে যে এক জাতীয় মহাবিদ্যালয় উৎপন্ন হইবে

১ ঈশ্বরভট্টকুমার দুঃখাপাখ্যায়, রবীন্দ্র-জীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড (১৩৫৫), পৃ ৪২৬

তাহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে।... তবে একটা বিষয় শীঘ্রই করিতে হইবে। এইটি সহজসাধ্য— পরে বৃহৎ আকারে হইবে। কিন্তু বর্তমান সুবিধা ছাড়িয়া দিতে নাই।

‘নবদীপ ত সতীশ’ বাইনে। কিন্তু চীন ও জাপান হইতে পুঁথির কাপি সংগ্রহ অতি সত্বরই করিতে হইবে।

‘একজনকে চীন ভাষায় দিগ্গজ করা এখনও সময়সাপেক্ষ। কিন্তু তাহার পূর্বে কতকগুলি preliminary কাজ করিলে এ সম্বন্ধে একটা নূতন উৎসাহ হইবে। তাহার বলে কঠিনগুলি সহজ হইবে।

‘আমার plan এই—

‘এখন একজন একটি সংস্কৃত ও ইংরেজীবিদ ছাত্র সন্ধান করিয়া ৬ মাস Asiatic Societyতে বুদ্ধধর্ম সম্বন্ধে Tibetএর Mss. ও অন্যান্য লিপি বাহা আছে তাহা অভ্যস্ত করিতে হইবে। তারপর তোমার Mr. Horyকে সঙ্গে করিয়া তিনি চীন দেশের ও জাপানের নানা বিহারে বাজালা ও দেবনাগরী পুঁথির কাপি করিবেন; এ সম্বন্ধে হোরির মত করাইতে হইবে। তাহার খরচ আমাদিগকে দিতে হইবে। এরূপ মহৎ কার্যে হোরীর সহায়কৃতি পাইতে পার। আর জাপান ও চীনদেশের খ্যাতনামা লোকের সহিত আলাপের সুবিধা এখন হইতেই করিতে হইবে।

‘এই প্রথম exploration হইতে অনেক তথ্য বাহির হইবে, তাহার পর আরও systematic রূপে অনুসন্ধান করিতে হইবে।’

পত্র ২৩। ‘আমি পলাতক... এখন তুমি আমাকে ডাক দিলে চলিবে কেন?’

১ সন্তবতঃ ‘শ্রীশ্রীপদকল্পতরু’-সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায়।

এই চিঠিখানি সম্ভবতঃ অগস্টীশচন্দ্রের নিয়মিত পত্রখানির উত্তরে লিখিত, তৎসম্বন্ধে ইহার তারিখ অস্মিত হইয়াছে। (যদিও 'সমান-সংবাদ'-এসঙ্গে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ -কর্তৃক ১৩১৮ মাঘে অস্মিত বঙ্গীয়-সংবাদের কথাও স্মৃতিত হইয়া থাকিতে পারে, নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন)—

‘২৩ এ অক্টোবর ১৩০৫

‘তোমাকে একটা বিষয় পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। সর্বপ্রথম আমাদের বঙ্গভবন প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যিক। একটি মূর্ত্তমান এবং বর্ত্তমান জিনিষ আমাদের উৎসাহের প্রধান সহায় হইবে। তারপর এই স্থানে কেন্দ্র করিয়া বহু বড় কাজ আরম্ভ হইবে। এই স্থানে ৫০০০ লোকের বসিবার স্থল যেন নিৰ্ম্মিত হয়। সেখানে প্রতি পক্ষে নিয়মিতরূপ ছাত্রদের জন্য বস্তুতা, কথকতা প্রভৃতি হইবে। তারপর আমাদের সেই ‘আত্মীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের’ বস্তুতা এখানে নিয়মিতরূপ দেওয়া হইবে।...

‘তারপর আত্মীয় ভবনে তোমার [পত্নী] সমাজের অধিবেশন হইবে, নানা বিভাগে শিল্প বাণিজ্য ইত্যাদির আয়গা থাকিবে।

‘...এই কেন্দ্র হইতে নানা বিষয়ের অনুসন্ধান সংবাদ ইত্যাদির দরকার।

১ এই পত্র লিখিবার পূর্বদিন, ‘কার্লাইল সার্ক লার’-এর বিষয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়— ছাত্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান নিষিদ্ধ করিবার কারণে যে সার্ক লারের প্রতিবাদে আত্মীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা হয় বলা যায়—‘২০শে [অক্টোবর] তারিখেই জানা যায় সরকার... এক ইত্যাহার জারি করিয়া ছাত্রদিককে রাজনীতিক অনুষ্ঠানে সভাসমিতিতে যোগ দিতে নিষারণ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।’—
শ্রীকেশবপ্রসাদ ঘোষ, ‘কংগ্রেস’, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ ১১৬

‘এখানে রামমোহন রায়, বঙ্কিম, ঐশ্বর বিদ্যাসাগর, ইত্যাদির স্মৃতিচিহ্ন থাকিবে, ইত্যাদি।

‘তুমি এবিষয়ে অতি সুন্দর প্রবন্ধ প্রস্তুত করিবে। ত্রাতৃদ্বিতীয়ের দিন নানা স্থানে পঠিত হইবে।

‘এসময় আমাদের বিজ্ঞানেরা বিবিধ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দিবেন এবং ধুমাইবার পরামর্শ দিবেন। এখনই জাগ্রত থাকিবাব সময়। তোমাকে চৌকিদারী করিতে হইবে।’

ইহার এক সপ্তাহ পূর্বে, ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর (৩০ আশ্বিন ১৩১২), ‘ফেডারেশন হল’ ‘মিলনমন্দির’ বা ‘অথ গুরুভবন’ -প্রতিষ্ঠান সূচনা হয়, জগদীশচন্দ্রের ভগিনীপতি আনন্দমোহন বসু এই অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব করেন, এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ‘দোষণাপত্রে’র বঙ্গামৃতবাদ সভাস্থলে পাঠ করেন। সেই ফেডারেশন হলের পরিকল্পনা লইয়াই জগদীশচন্দ্রের এই পত্র। উক্ত ‘জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়’-এর প্রতিষ্ঠা-উদ্যোগেও রবীন্দ্রনাথ যুক্ত ছিলেন।’ কিন্তু স্বদেশী আন্দোলন যে পথে পরিচালিত হইতেছিল তাহা রবীন্দ্রনাথের কল্পনা-অনুযায়ী ও আদর্শের অনুরূপ হয় না; এই

১ রুটনা কেদারনাথ দাসগুপ্ত -কর্তৃক প্রকাশিত ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -লিখিত ভূমিকা -সহিত শিক্ষার আন্দোলন [১৩১২] পুস্তিকা এবং *Calendar 1906-1908*, National Council of Education, Bengal, 1908। কার্লাইল মার্কলার প্রকাশিত হইলে কলিকাতার ছাত্র ও ছাত্রহিতৈষীদের এই সময় যেসকল সভা হয় তাহার অনেকগুলিতে রবীন্দ্রনাথ যোগ দিয়াছিলেন ও বক্তৃতা করিয়াছিলেন। যথা— ১০ কাঠিক ১৩১২, পটলডাঙার মনিকবাড়িতে ছাত্রসভা, ১৬ কাঠিক, ফিল্ড অ্যাণ্ড অ্যাকাডেমি ভবনে মেম্বর ও ছাত্রগণের সাক্ষাসম্মেলন, ১৯ কাঠিক, ডন সোসাইটিতে ছাত্রসভা, ৩০ কাঠিক, ল্যাণ্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে নেতৃগণের যত্নসভা; ১ অগ্রহায়ণ, ফিল্ড অ্যাণ্ড অ্যাকাডেমিতে জাতীয় শিক্ষা-সমাজ -প্রতিষ্ঠার ঘোষণাসভা। ৩০ কাঠিকের সভায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় -প্রতিষ্ঠার যে

সময়ে রবীন্দ্রনাথ রামেন্দুসুন্দর ত্রিবেদীকে যে পত্র লেখেন তাহাতে এ বিষয়ে তাঁহার মনোভাব সুব্যক্ত হইয়াছে—

‘ইহা নিশ্চয় জানিবেন উচ্চতর লক্ষ্য বিম্বৃত হইয়া যাহারা গবমেণ্টের বিক্রম স্পন্দা প্রকাশ করাকেই আত্মশক্তি-সাধনা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা বলিয়া মনে করেন— যাহারা জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনকে এই স্পন্দা প্রকাশেরই একটা উপলক্ষ্য বলিয়া জান কবেন তাহাদের দ্বারা স্থিরভাবে দেশের স্বাধী মঙ্গল সাধন হইতে পারিবে না। দেশে যদি বর্তমান কালে এইরূপ লোকেরই সংখ্যা এবং ইচ্ছাদেরই প্রভাব অধিক থাকে তবে আমাদের মত লোকের কর্তব্য নিভৃত যথাসাধা নিঃস্বের কাঙ্ক্ষ মনোযোগ করা। বলা চেষ্টায় নিফল আন্দোলনে শক্তি ও সময় ক্ষয় করা আমাদের পক্ষে অগাধ হইবে। বিশেষত উন্নাদনাথ যোগ দিলে কিয়ৎপরিমাণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেই হয় এবং তাহার পবিণামে অবসাদ ভোগ করিতেই হয়। আমি তাই ঠিক করিয়াছি যে, অধিকাংশের আয়োজনে উন্নাত না হইয়া যতদিন আমি আছে, আমার এই প্রদীপটি জালিয়া পথের দ্বারে বসিয়া থাকিব। আমি কোনো ভয়েই “লীডার” বা জনসংঘের চালক নহি— আমি ভাটমাত্র—যুদ্ধ উপস্থিত হইলে গান গাহিতে পারি এবং যদি আদেশ দিবার কেহ থাকেন তাহার আদেশ পালন করিতেও প্রস্তুত আছি। যদি দেশ কোনোদিন দেশীয় বিদ্যালয় গড়িয়া তোলেন এবং তাহার কোনো সেবাকার্যে আমাকে আহ্বান করেন তবে আমি অগ্রসর হইব কিম্ব

প্রতিসনাল এডুকেশন কমিটি নিযুক্ত হয় রবীন্দ্রনাথ তাহার অল্পতম সমস্ত ছিলেন। ২৪ অগ্রহায়ণ, ১৩০৬ খ্রিঃাব্দে আমায় আহ্বান করিয়া দিলেন। তখন আমি উল্লিখিত উপস্থিত ছিলাম কি না আমার জ্ঞান নাট, তবে এই সমস্ত জাতীয় শিক্ষাসমাজের গঠনপ্রণালী এবং অস্তিত্ব বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য সে সমিতি গঠিত হইলে তখন রবীন্দ্রনাথ তাহার সমস্ত মনোনিবেশ হন।

“নেতা” হইবার চূয়াশা আমার মনে নাই— ষাহারা “নেতা” বলিয়া পরিচিত তাঁহাদিগকে আমি নমস্কার করি— ঈশ্বর তাঁহাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন। ইতি ২৬ অগ্রহায়ণ ১৩১২।”

পত্র ২৪। ‘নিজের শোক... নিজের ব্যক্তিগত ক্ষতি’

১৩১৪ সালের ৭ অগ্রহায়ণ (২৩ নভেম্বর ১৯০৭)^১ রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রনাথের (জন্ম ১৮৯৪) মৃত্যু হয়; শমীন্দ্রনাথ মৃত্যুরে রবীন্দ্রনাথের প্রিয়স্বহৃৎ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের আশ্রয়গৃহে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, সেইখানে রোগাক্রান্ত হন। শান্তিনিকেতনের তৎকালীন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল -লিপিত বিবরণে^২ আছে—

‘যতই রাত্রি শেষ হইতে লাগিল ততই শমীর জীবন প্রদীপ নির্বাণোন্মুখ হইতেছে বোধ হইতে লাগিল, রাত্রি প্রভাত না হইতেই সব শেষ হইয়া গেল। রবীন্দ্রনাথ পাশের ঘরেই রহিয়াছেন, এ ঘটনা তাঁহাকে শুনাইতে ষাইবার সাহস হইল না। তখন তিনি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় অবস্থিত। কিছুক্ষণ পরে তিনি আমাকে ডাকিয়া বলিলেন— “এ সময়ের ষাহা কিছু কৃত্য আমি করিয়া দিলাম, এখন অবশেষ ষাহা কর্তব্য আপনি করুন” .. আমরা দাহান্তে গন্ধাস্তান করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। রবীন্দ্রনাথ তখনও প্রসূরের মত নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছেন। কোমলপ্রাণ শ্রীশবাবু কাঁদিয়া আকুল হইলেন। আমি ও শ্রীশবাবু তখন রবীন্দ্রনাথের গৃহে প্রবেশ করিলাম। শ্রীশবাবু অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন, চক্ষে তাঁহার ষারা আর ধামে না, আমারও

১ বঙ্গবাণী, কাঙ্কম ১৩৩৩

২ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় -কর্তৃক রবীন্দ্রজীবনী তৃতীয় খণ্ডে উল্লিখিত তারিখ

৩ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল, “রবীন্দ্র প্রসঙ্গ”, দেশ, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪৯

চক্ষে ধারা বহিতেছিল, এই সময় রবীন্দ্রনাথেরও চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল। আমি তাঁহার অশ্রুপাত দেখিয়া যেন একটু আশস্ত হইলাম। তাঁহার সেই নিশ্চল গভীর ভাব ও শোকপূর্ণ অবস্থা দেখিয়া মনে বড় আতঙ্ক অনুভবিত্তেছিল। সেইদিনই গাড়িতে বোলপুর চলিয়া যাওয়া স্থির হইল।... গাড়ি সাহেবগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছিতেই মাতুল মহাশয় ট্রেনের নিকট ধাবার লইয়া উপস্থিত হইলেন।... তিনি [রবীন্দ্রনাথ] মাতুল মহাশয়ের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহিত পূর্ব হইতেই জানা শুনা ছিল। কিছুক্ষণ পরে আমি মাতুল মহাশয়কে চূপে চূপে মুন্সেরের সমস্ত দুর্ঘটনার কথা জানাইলাম। তিনি শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহার সহিত আলাপ করিবার সময় তিনি কিছুই টের পান নাই যে এত বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিক স্মিতমুখেই তাঁহার সহিত আলাপ করিতেছিলেন।... [শান্তিনিকেতনে] পরদিন বেলা হইলে আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।... একটু কথা কহিতে গিয়াই তাঁহার নেত্র আর্দ্র হইয়া আসিল, কণ্ঠস্বরও যেন বাহির হইতেছিল না।... দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় মধ্যো মধ্যো আসিয়া কিছু বলিতে না পারিয়া কেবল তাঁহার পিঠটিতে হাত বুলাইতে লাগিলেন আর মধ্যো মধ্যো 'রবি', 'রবি' এই শব্দ করিতে লাগিলেন। সে দৃশ্যটি বড় করুণাপূর্ণ।”

এই সময়ে শান্তিনিকেতনের তদানীন্তন অধ্যাপক মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে দুইখানি পত্রে রবীন্দ্রনাথ এরূপ লিখিয়াছিলেন—

‘যে সংবাদ শুনিয়াছেন তাহা মিথ্যা নহে। তোলা [ত্রিশচন্দ্রের

১ অপিচ ত্রৈলোক্য দ্বিতীয়ভাগে মুনোপাধ্যায় -রচিত “রবীন্দ্র স্মৃতি” গ্রন্থের কবিপুত্র রবীন্দ্র অধ্যায়, পৃষ্ঠা, ২০ প্রাকণ ১৯৪২

পুত্র সরোজচন্দ্র] মূর্ছরে তাহার মামার বাড়িতে গিয়াছিল, শমীও আগ্রহ
করিয়া সেখানে বেড়াইতে গেল— তাহার পরে আর ফিরিল না।...
১২শে অগ্রহায়ণ ১৩১৪ ।’

‘ঈশ্বর যাহা দিয়াছেন তাহা গ্রহণ করিয়াছি ; আরো দুঃখ যদি দেন ত
তাহাও শিরোধার্যা করিয়া লইব— আমি পরাভূত হইব না।... ২৪শে
মাঘ ১৩১৪ ।’

অগ্রহায়ণ মাসে শিলাইদহে গিয়া রবীন্দ্রনাথ কয়েক মাস থাকেন— এই
সময়ের মধ্যে পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতির কার্য, জমিদারিতে
“পল্লীসমাজ” স্থাপন, ‘গোরা’ রচনা প্রভৃতি দেশহিতকর্ম ও সাহিত্যকর্ম
অব্যাহত চলিতে থাকে’ ; শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত
অধ্যাপক শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সাগ্নালকে লিখিত বহু পত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে
বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করিতে থাকেন। মৃত্যুশোক তাহার অন্তর্জীবনকে
এ সময় কোন পথে প্রধাবিত করিতেছিল তাহার পরিচয় পাঠ এই কালে
রচিত গানে (যথা, ‘অমৃত মম বিকশিত কর অমৃততম হে’, ২৭ অগ্রহায়ণ
১৩১৪), ১৩১৪ সালের ‘মাঘোৎসবে’র ভাষণে^১, এবং ভূপেন্দ্রনাথ সাগ্নালকে
লিখিত কোনো কোনো চিঠিতে, যেমন—

১ ‘রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাস দুই বৎসরেরও অধিক কাল [১৩১৪ ভাদ্র - ১৩১৬
কাঙ্কন] ধরিয়৷ প্রকাশিতে নাহির হইয়াছিল এবং উক্তর হস্তলিপি ক্রমে ক্রমে
পাইয়াছিলাম... তিনি একবার দাক্ষিণ শোক পাঠিয়াও ঠিক তাহার পরদিন একটি
কিষ্টি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।’ —রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, “রবীন্দ্রনাথ ও মাসিক
পত্র”, ‘শান্তিনিকেতন’, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩। এই ‘শোক’ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুশোক ; দ্রষ্টব্য
শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী ১, প্রথম সংস্করণ, পৃ ৪৬০

২ “রবীন্দ্রনাথের চিঠি”, দেশ, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৪২

৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, “দুঃখ”, ধর্ম। শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ -কর্তৃক তাহার
“কবি-কথা” গ্রন্থে উদ্ধৃত, নিবন্ধারতী পত্রিকা, কাটিক-পৌষ ১৩৫০

‘আমাকে এমনো কিছুদিন কমা করিবেন। আমার হৃদয়ের মধ্যে একটা ব্যাকুলতা অনুভব করিতেছি— তাহার একটা কিনারা না করিয়া আমি কিছুতে মন দিতে পারিব না। আমার বাহিরের সমস্ত কাজকর্মের ভিতর হইতে অত্যন্ত একটা বেদন’র তাগিদ আসিতেছে— আমাকে আমার অসুখায়া ভারি একটা তাড়া লাগাইতেছে। অতএব ম্যা করিয়া আপনার আমাব ছুটি বাড়াইয়া দিবেন।

‘কিন্তু বিদ্যালয়ের প্রসঙ্গে যাহা কিছু আলোচ্য বিষয় আছে তাহা লিপিতে কৃষ্টিত হইবেন না। ১লা ফাল্গুন ১৩১৪।’

‘বিদ্যালয়ে আমাকে শোধ টানিবেন না। আমার দুই একটা কর্ণবো হাত দিয়াছি— তা ছাড়া অসুখামীর সঙ্গেও আমার বোঝাপড়া দরকার। অন্য কোন কাজে আমার মন ঘাইতেছে না। এই ফাল্গুন ১৩১৪।’

এই ‘ব্যাকুলতা’ ও ‘অসুখামী’র সঙ্গে এই ‘বোঝাপড়া’ই গীতাঞ্জলি’র সমকালীন গানে কবিতায় উৎসাহিত হইয়াছে বলা য়ে।

পশ্চিম বংসর পরে, শোভিত্র নীতীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে তাহার মাতৃদেবী শ্রীমতী মীরা দেবীকে বনৌন্দ্রনাথ যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহাতেও, শমীন্দ্রনাথের মৃত্যু বনৌন্দ্রনাথ কিভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, বারংবার পরমাত্মীয়দিগের বিদ্রোহভংগকে ‘তিনি কিভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, সে কথা বিবৃত হইয়াছে—

‘যে রায়ে শমী গিয়েছিল সে রায়ে সমস্ত মন দিবে বলেছিলুম নিরাট বিশ্বস্তার মতো তার অবাধ গতি হোক, আমার শোক তাকে একটুও যেন পিছনে না টানে। তেমনি নীতুর চলে যাওয়ার কথা

১ ‘বনৌন্দ্রনাথের চিঠি’, ১০৩, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩১৮

যখন তখন তখন অনেকদিন ধরে বার বার করে বলেছি, আর তো আমার কোনো কর্তব্য নেই, কেবল কামনা করতে পারি এর পরে যে বিরাটের মধ্যে তার গতি সেখানে তার কল্যাণ হোক। সেখানে আমাদের সেবা পৌঁছয় না, কিন্তু ভালোবাসা হয়তো বা পৌঁছয়— নইলে ভালোবাসা এখনো টিকে থাকে কেন? শমী যে রাত্রে গেল তার পরের রাত্রে রেল আসতে আসতে দেখলুম জ্যোৎস্নায় আকাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাও কিছু কম পড়েচে তার লক্ষণ নেই। মন বললে কম পড়েনি— সমস্তর মধ্যে সবই রয়ে গেছে, আমিও তারি মধ্যে। সমস্তর জন্তে আমার কাজও বাকি রইল। যতদিন আছি সেই কাজের ধারা চলতে থাকবে। ...২৮ আগস্ট ১৯৩২।’^১

২২-সংখ্যক পত্রে মধ্যমা কক্ষা রেণুকার, এবং ২৯-সংখ্যক পত্রে জ্যোষ্ঠা কক্ষা বেলা বা মাধুরীলতার পীড়ার উল্লেখ আছে। পত্র লিখিবার স্বল্প-কাল-মধ্যেই ইহাদের^২ মৃত্যু হয়। এই শোক রবীন্দ্রনাথ কিভাবে গ্রহণ করেন সে বিষয়ে শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ লিখিয়াছেন—

‘১৯১৮ সালের গ্রীষ্মকাল। বড়ো মেয়ে বেলা রোগশয্যায়। জোড়া-গির্জার কাছে স্বামী শরৎচন্দ্রের বাড়িতে। কবি জোড়াসাঁকোয়। মেয়েকে দেখবার জন্য রোজ সকালে তাঁকে গাড়ি করে নিয়ে যাই। কবি দোতলায় চলে যান। আমি নিচে অপেক্ষা করি। রোগিণীর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে আসছিল। রোজ যেমন যাই একদিন সকালে কবিকে নিয়ে ওখানে পৌঁছলুম। সেদিন আমি গাড়িতে অপেক্ষা করছি।

১ রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র ৪, পৃ ১৫২

২ রেণুকা, মৃত্যু ১৯০৩। বেলা, মৃত্যু ১৬ মে ১৯১৮

কবি কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে গাড়িতে চড়ে বসলেন। তাঁর দিকে তাকাতেই বললেন, “আমি পৌছবার আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় খবর পেলুম তাই আর উপরে না গিয়ে ফিরে এসেছি।”

‘গাড়িতে আর কিছু বললেন না। ছোড়াসাঁকোর পৌছিয়ে অল্পদিনের মতো আমাকে বললেন, “উপরে চলো।”... খানিকক্ষণ চূপ করে থেকে বললেন, “কিছুই তো করতে পারতুম না। অনেকদিন ধরেই জানি যে ও চলে যাবে।’ তবু রোজ সকালে গিয়ে ওর হাতখানা ধরে বসে থাকতুম।... ছেলেবেলার মতো বলত, বাবা গল্প বলো। বা মনে আসে কিছু বলে যেতুম। এবার তাও শেষ হ’ল।” এই বলে চূপ করে বসে রইলেন। শান্ত সমাহিত।

‘সেদিন বিকালে ওর একটা কাজ ছিল। জিজ্ঞাসা করলুম, “আজকের ব্যবস্থার কি কিছু পরিবর্তন হবে।” বললেন, “না, বদলাবে কেন? তার কোনো দরকার নেই।”

১ ভ্রষ্টব্য— বেলা দেবীর মৃত্যু -এসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠি [১৯১৮], চিঠিপত্র ২, পৃ ৬৮

ক্রমতী সীতা দেবীও তাঁহার পূণ্যস্মৃতি এছে বেলা দেবীর মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথের অবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মৃত্যুর পরদিন তিনি রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন—

‘প্রণাম করিতে, অল্পদিকে চাহিয়া শুধু বলিলেন, “বোসো।” মুখের চেহারা অত্যন্ত বিবর্ণ ও ক্লিষ্ট, যেন অনেকদিন রোগ ভোগ করিয়া উঠিয়াছেন।... কয়েকবার কথা বলিলেন তবে মধ্যে মধ্যে একেবারে গুরু হটরা বাইতেছিলেন। কি কথার একবার একটু হাস্য করিলেন, হাসিটা তাঁহার মুখে কি নিদারুণ করুণ দেখাইয়াছিল তাহা এই চক্ষুণ বৎসর পরেও মনে আছে।... যে শক্তিশেল তাঁহার মুখে আসিয়া দাখিল কথা-বার্তার তাহার আর উল্লেখ মাত্র করিতেম না।’ —পৃ ৫৫২-৫৫

এই প্রবন্ধেই মধ্যমা কন্ঠার মৃত্যু^১ রবীন্দ্রনাথ কিভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়—

‘সে সময়... দিনের পর দিন আলাপ আলোচনা পরামর্শ। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মশায় রোজ আসেন। আর রোজই অস্থখের খবর নেন। যেদিন মেজো মেয়ে মারা যায় কথাবার্তায় অনেক দেরি হয়ে গেল। যাওয়ার সময় সিঁড়ির কাছে ত্রিবেদী মশায় কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আজ কেমন আছে?’ কবি শুধু বললেন, ‘সে মারা গিয়েছে।’ শুনেছি যে ত্রিবেদী মশায় সেদিন কবির মুখের দিকে তাকিয়ে আর কিছু না বলে চলে গিয়েছিলেন।’^২

পত্র ২৪। ‘কংগ্রেসের ষষ্ঠভঙ্গ’— ‘চরমপন্থী’ ও ‘মধ্যমপন্থী’দের বিসংবাদে সুরাটে কংগ্রেস-অধিবেশন (ডিসেম্বর ১৯০৭) পও হইবার প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে সাময়িক পত্রে প্রবন্ধও (“ষষ্ঠভঙ্গ”^৩) লিখিয়াছিলেন— ‘বিরুদ্ধ পক্ষের সত্তাকে যথেষ্ট সত্য বলিয়া স্বীকার না করিবার চেষ্টাতেই এবার কংগ্রেস ভাঙিয়াছে... দুই দিকেই এই জিন যে বরং কংগ্রেস ভাঙিয়া যায় সেও ভালো তবু হার মানিব না।’

ঈশ্বরপ্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার রবীন্দ্রজীবনী গ্রন্থে বেলা দেবীর মৃত্যুর সহিত ‘পলাতকা’র (অক্টোবর ১৯১৮) “শেষ প্রতিষ্ঠা” কবিতাটি যুক্ত করিয়াছেন। বেলা দেবীর বিবাহের পর তাঁহাকে বসন্তরোগে রাখিয়া (১৯০১) আসিয়া রবীন্দ্রনাথ পত্নীকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন (চিঠিপত্র ১, পৃ ২১-২২) তাহাও উল্লেখ্য।

১ মাতৃহীন পীড়িতা কন্ঠা রোগকে রবীন্দ্রনাথ কিরূপভাবে পরিচর্চা করিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথের অব্যাহতিতে তাহার বিবরণ লিখিয়াছেন শ্রীমতী রানী মহলানবিশ, “ঐ পিতা নোহসি”, বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৫০।

২ ঈশ্বরপ্রসাদচন্দ্র মহলানবিশ, ‘কবি-কথা’, বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৫০।

৩ প্রবাসী, মাঘ ১৩১৪। রবীন্দ্র-রচনাবলীর দশম খণ্ডে প্রথম গ্রন্থসূক্ত।

এই সময় দেশে 'অসহ্য চূর্ণশায় মূর্তি' দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ 'গ্রামে গ্রামে বথার্থভাবে স্বরাজ স্থাপন'এর চিন্তায়' ও নিজের সাধ্যমত তাহার উদ্যোগে ব্রতী'— 'সমস্ত দেশে যা হওয়া উচিত ঠিক তারই ছোট প্রতিকৃতি'— "বল্লভ" প্রবন্ধেও তিনি সেই কথা বলিলেন— 'মধ্যমপন্থী ও চরমপন্থী এই উভয় দলই কংগ্রেস অধিকার করাকেই যদি দেশের কাজ করা বলিয়া একান্তভাবে না মনে করিতেন, যদি দেশের সত্যকার কর্মক্ষেত্রে ইহারা প্রতিষ্ঠালাভ করিতে থাকিতেন— দেশের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-অগ্নের অভাব মোচন করিবার জন্য যদি ইহারা নিজের শক্তিকে নানা পথে অহরহ একাগ্রমনে নিয়োজিত করিয়া রাখিতেন... এবং দেশের জনসাধারণের সঙ্গে কাষমনোবাক্যে যোগ দিয়া দেশের প্রাণকে দেশের শক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিতেন তাহা হইলে কংগ্রেস সভার মঞ্চ ক্রিতিয়া লইবার চেষ্টায় এমন উন্নত হইয়া উঠিতেন না।... সমস্ত দেশের লোককে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে গিয়া সত্যমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তুলিলে তবেই সমস্ত দেশের যোগে ঐ কংগ্রেস সভা হইয়া উঠিবে।... কংগ্রেসকে দিনে দিনে বর্ষে বর্ষে দেশের ভিতর দিয়া সত্য করিয়া তুলিব এই চেষ্টাই কোনো এক পন্থীর হউক।'

ইহার স্বল্পকাল পরেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনীর পাবনা অধিবেশনে^১ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ইহার অভিভাবকে^২ তিনি

১ ব্রহ্মব্যা অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র (২২ পৌষ ১৩১৪), প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৫, পৃ ৬৮৫

২ বর্তমান ব্রহ্মে মুদ্রিত (পৃ ২০) অদলা দয়ু মহোদয়াকে লিখিত পত্র ব্রহ্মব্যা।

৩ ১৯০৮, ১১ ফেব্রুয়ারি; দিন ও মাস ক্রীষ্ণমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ -প্রদীপ কংগ্রেস (দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ ২৫২) হইতে গৃহীত।

৪ সমূহ ব্রহ্মে ও রবীন্দ্র-রচনাবলীর দশম খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত।

“দেশের সমস্ত গ্রামকে নিজের সর্বপ্রকার প্রয়োজনসাধনকম করিয়া গড়িয়া” তুলিবার প্রণালী বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার আয়ত্তাধীন ক্ষেত্রে পল্লীসমাজ-গঠনের স্বয়ং যে উদ্‌যোগ এই সময় করেন তাহার কিছু বিবরণ আছে অবলা বসু মহোদয়াকে লিখিত পত্রে^১। ‘পল্লীসমাজ’এর একটি বিস্তৃত কর্মসূচীও মুদ্রিত আকারে প্রচারিত হয়।^২

পত্র ২৪। ‘বন্দে মাতরম্ কাগজে... কলহ চলিতেছে।’

বন্দে মাতরম্ পত্রিকা ১৯০৬ আগস্টে প্রকাশিত হয়, ১৯০৮ অক্টোবর পর্যন্ত চলিয়াছিল; প্রথমে প্রায় দুই মাস কাল বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় প্রধান সম্পাদক ছিলেন, পরে অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় প্রধানতঃ ইহার সম্পাদনা করেন; ১৯০৮ সালের মে মাসে অরবিন্দ গ্রেপ্তার হইলে বিপিনচন্দ্র পুনরায় ইহার ভার লইয়াছিলেন।^৩ রবীন্দ্রনাথ এই কাগজের অসুরাগী পাঠক ছিলেন; ৯ ভাদ্র ১৩১৪ তারিখে আমেরিকাপ্রবাসী পুত্র রবীন্দ্রনাথকে তিনি লিখিতেছেন—‘Statesman কাগজের চাঁদা ফুরলেই আর পাঠাব না। এখন থেকে ‘বন্দে মাতরম্’ কাগজ পাঠাতে থাকব। ওটা খুব ভাল কাগজ হয়েছে। কিন্তু অরবিন্দকে যদি জেলে দেয় তাহলে ও কাগজের কি দশা হবে জানিনে।’^৪ এই পত্র লিখিবার দুইদিন পূর্বেই

১ চিঠিপত্র, বর্তমান খণ্ড, পৃ ২০

২ এটি ঠিক কোন সময়ে প্রচারিত হয় জানা যায় নাই, করেক বৎসর পূর্বে স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধের রচনাকালে (১৯০৪) হইতে পারে, অথবা আলোচ্য কালেও হইতে পারে। ইহা শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ -প্রণীত কংগ্রেস (দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ ১৩৫-৩৬) গ্রন্থে মুদ্রিত আছে।

৩ বন্দেমাতরম্ পত্রের প্রকাশ সম্পাদন ইত্যাদি সম্বন্ধে এই তথ্য শ্রীসিরিজানন্দর স্মারচৌধুরী -প্রণীত শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গলার স্বদেশী যুগ গ্রন্থ হইতে গৃহীত।

৪ চিঠিপত্র ২, পৃ ৫-৬

রবীন্দ্রনাথ, বন্দেমাতরম্ পত্রে রাজত্বেহ প্রচারের অভিযোগে অভিব্যক্ত সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের উদ্দেশে 'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার' কবিতাটি' রচনা করেন।

পত্র ২৫। 'গীতাঞ্জলি... ইংরেজি পক্ষে তর্জমা'

'ওটা যে কেমন করে লিখলুম' সে বিষয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে লিখিত ৬ মে ১৯১৩ তারিখের পত্রে^১ রবীন্দ্রনাথ সর্বশেষ আলোচনা করিয়াছেন।

পত্র ২৫। 'শিকাগো যুনিভার্সিটিতে... বক্তৃতা'

বিষয় "Ideals of the Ancient Civilisation of India"। এই বক্তৃতা দিয়াছিলেন ১৯১৩ সালের জানুয়ারি মাসে^২— আলোচ্য পত্রের তারিখও সম্ভবতঃ তাহাই হইবে।

পত্র ২৬। 'Mrs Boole'

এই প্রসঙ্গে জগদানন্দ রায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের ২৯শে বৈশাখ ১৩২০ তারিখের পত্র^৩ দ্রষ্টব্য—

'কাল আমরা Mrs Boole নামক একজন বিখ্যাত আন্থিকের বাড়ি গিয়েছিলুম। তাঁর বয়স ৮২ বছর। কিন্তু কি স্মৃতিশক্তি তাঁর মানসিক শক্তি। ইনি বিধবা, এঁর স্বামী একজন বিখ্যাত গণিতবেত্তা

১ প্রকাশ : নবপর্ষদ বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১৩১৪। ১৩৪০ সাল হইতে সঙ্কলিত সংকলিত।

২ চিঠিপত্র ৫, পৃ ১২-২১

৩ এই বক্তৃতা প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের ৩০ জানুয়ারি ১৯১৩ তারিখের পত্র, প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪২, পৃ ৩০৪, এবং শ্রীমতী দেবীকে লিখিত ২২ জানুয়ারি [১৯১৩] তারিখের পত্র, চিঠিপত্র ৫, পৃ ৪২

৪ বিদ্যভারতী পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৩৪২, পৃ ২৩০

ছিলেন। খুব ছোট ছেলেদের মনে সহজে ও প্রত্যক্ষভাবে জ্যামিতির বোধ সঞ্চার করে দেবার যে উপায় ইনি উদ্ভাবন করেছেন তাই দেশে আমরা ভারি বিস্মিত হয়েছি। এঁর প্রণালী এবং তার সমস্ত উপকরণ আমরা সংগ্রহ কববার চেষ্টায় আছি। সঙ্গে করে নিয়ে যাব।’

পত্র ২৬। ‘একদিন এখানকার সভায় ‘চিত্রা’র [চিত্রাঙ্গদাব ইংবেজি অনুবাদ পড়িয়া শুনাইয়াছিলাম। এখানকার শ্রোতাদের ভালে লাগিয়াছে।’

এই পাঠ-সভার একটি বিবরণ^১ উদ্ধৃত হইল—

An Indian Drama. A Reading By Mr. Rabindra Nath Tagore The Indian Art, Dramatic and Friendly Society^২. has already made several serious efforts to fulfil its professed intention of bringing the East and the West into closer touch..The latest of these efforts took the form of a meeting yesterday afternoon, at which Mr. Rabindra Nath Tagore, who is described as India's "World Poet"... read his own translation of one of his own plays.

Before a large and deeply interested gathering that included many Anglo-Indians and many well-known men of letters Mr Tagore lent over his reading-desk—a tall, slim figure dressed in tight-

১ Westminster Gazette, ইন্দোলন্দার কঠিকা-সংগ্রহ প্রাপ্ত; কাগজটির তাৰিখ রক্ষিত হয় নাই।

২ পত্রাধারে লিখিত হইয়াছে India Society; এই সোসাইটিই Gitanjali, Chitra ও One Hundred Poems of Kabir প্রথমে প্রকাশ করেন। ইন্দোলন্দার (ও অদনোলন্দার) এই সোসাইটির সহকারী সভাপতি নিৰ্বাচিত হইয়াছিলেন।

fitting garments of black ; a face with finely chiselled features and with the deep-set eyes and the high brow of the thinker , long hair and a flowing beard in which grey is taking the place of black , and a strangely thin, but musical, voice . In the dusk of late afternoon the shaded light that was directed upon his manuscript was reflected in a copper glow upon his face , and he read with hardly a gesture, without a break, and in the accents of a refined Englishman from the beginning of his short prose-poem to the end

The reading was received with enthusiasm by the audience , and the poet, a quiet, almost a shy man was overwhelmed with compliments by the many admirers who crowded round him before he could escape from the room.

পত্র ২৬ । 'অষ্ট্রিয়' থিয়েটারে আমান ডাকঘর নাটকের অভিনয়ের দাবস্থ, হট্টেভেছে । এটি প্রসঙ্গে বিশেষ ডাকঘর অভিনয়ের একটি বিবরণে মুদ্রিত হট্টেল--

The Abbey Theatre First Performance Of A Tagore Play . On Saturday evening last [May 1913] a performance was given in the Abbey Theatre in aid of the Building Fund of St. Enda's College, when two plays were presented to a well filled but not overcrowded house. One was "The Post Office", by Rabindranath Tagore, the great modern Bengali

১ Daily Express, 19 May, 1913 । কলিকতা-সংবাদ, প্রবীণসভন

poet...A large amount of interest was displayed in connection with the first production in Dublin of "The Post Office", especially as an appreciative lecture delivered a couple of months ago by Mr. W. B. Yeats introduced us to this striking Eastern personality, and a recently published translation of "Song-offerings" brought many readers into closer touch with his method and genius. The company must be congratulated on the minuteness with which they "made up" for the parts...The scenes were composed of Gordon Craig screens, and were arranged by Mr. J. F. Barlow...Too much praise cannot be given to Miss Lilian Jago for her impersonation of the pathetic part of Amal...Mr. Farrell Pelly was very good as the Dairyman, and Mr. Michael Con-niffe as Gaffer. Mr. H. F. Hutchinson as the Watchman and Mr Philip Guiry as Madhav showed a very fine grasp of an unusual but apparently none the less congenial task. The other characters were ably represented by Miss Nell Stewart (Sudha), Mr. Charles Power (Doctor), Mr. James Duffy (Head-man), Mr. Thomas Barrett (King's Herald), and Mr. Sean Connolly (King's Physician), while the "Boys" parts were taken by Desmond Murphy, Owen Clarke, and Horace Jennings.

পত্র ২৭। এই পত্রখানি ১৩২১ (১৯১৪) সালের ১ বৈশাখে লিখিত ; রবীন্দ্রনাথ এই চিঠিতে রোটেনস্টাইনকে লিখিত তাঁহার যে পত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহার তারিখ ১ মার্চ ১৯১৪, *Arts and Letters*

(London) পত্রের ১৯৫১ সালের প্রথম সংখ্যার (পঞ্চবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা) তাহা ছাপা হইয়াছে—

Dr. J. C. Bose will be in England some time next May and I have been wishing I could accompany him there.

১৯১৪ সালের এই 'অম্বাভ্রা'র অগদীশচন্দ্র অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, রয়্যাল কলেজ অব সায়েন্স, রয়্যাল ইনষ্টিটিউশন প্রভৃতিতে বক্তৃতা দিয়া বিশেষ সমাদৃত হন ; ভিয়েনা, প্যারিস, আমেরিকাতেও গিয়াছিলেন ।

পত্র ২৮ । ১৯১৬ সালের মে মাসে রবীন্দ্রনাথ আপান গিয়াছিলেন ; তথা হইতে সেপ্টেম্বরে আমেরিকা যান ; এই চিঠি আমেরিকা হইতে লিখিত । আমেরিকা-প্রবাসের প্রথম ভাগে এই পত্র লিখিয়া থাকিবেন এই অনুমানে পত্রের মাস নির্দিষ্ট হইয়াছে ; তবে আমেরিকায় ছিলেন আনুমানিক তৃতীয় সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত । আমেরিকায় এইবার তাঁহাকে বিভিন্ন শহরে বহু বক্তৃতা দি করিতে হইয়াছিল^১, পত্রে তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন ।

পত্র ২৮ । 'তোমার গান ।'

অগদীশচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত বহু-বিজ্ঞান-মন্দিরের (প্রতিষ্ঠা ৩০ নভেম্বর ১৯১৭) উদ্‌বোধন উপলক্ষ্যে রচিত "মাতৃমন্দির-পূজা-অঙ্গন কর মহোৎসব আয় হে"^২ উদ্‌বোধন-উৎসব-পত্রী হইতে কবির হস্তাক্ষরে গানটি মুদ্রিত হইল ।

১ ডটবা, ঈশ্বরভট্টকুমার সুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড (১৩৫৫) "আমেরিকায় বক্তৃতা" অধ্যায় ।

২ গানটির প্রসঙ্গে ডটবা, ঈশ্বরভট্টকুমার সুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রসংস্কৃত (১৯৫৬), পৃ ২২২-৩০

পত্র ২২। ‘কন্‌গ্রেসের সময় একটা কিছু বলবার জন্মে’

১৯১৭ সালে ডিসেম্বর মাসের শেষে কলিকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কন্‌গ্রেসের দ্বাত্রিংশ বার্ষিক অধিবেশন হয়। রবীন্দ্রনাথ India's Prayer বা “Thou hast given us to live” এবং “Our voyage is begun, Captain” এই কবিতা দুটি পাঠ করিয়া প্রথম দিনের সভার (২৬ ডিসেম্বর) উদ্বোধন করেন। সংগচ্ছন্দঃ সংবদক্ষঃ এই বেদমন্ত্র, ও বন্দেমাতরম্ গীত হইবার পর, সভার সাফল্য কামনা করিয়া প্রেরিত পত্রাদি বিপিনচন্দ্র পাল-কর্তৃক পঠিত হইলে—

The Chairman of the Reception Committee [Baikuntha Nath Sen] then called upon Sir Rabindra Nath Tagore to read out his opening invocation. Sir Rabindra, who received a tremendous ovation, then recited the following verses in a voice, which, reaching the farthest corners of the pandal, hushed the vast audience with its heartfelt eloquence—

Thou hast given us to live..

Our voyage is begun, Captain ..’

শ্রীমতী সীতা দেবী তাঁহার পুণ্যস্মৃতি গ্রন্থে আলোচিত প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

‘উজ্জল কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে ভূষিত, তাঁহাকে যেন ধূম্র-আবরণে বেষ্টিত অলস অগ্নিশিখার মত দেখাইতেছিল। তখন ভাবিয়াছিলাম আমি

১ এই বিবরণ নিম্নোক্ত প্রতিবেদনগ্রন্থ হইতে গৃহীত— *Report of the XXXII Sesson of the Indian National Congress held at Calcutta on 26th, 28th, and 29th December 1917 (1918)*।

রবীন্দ্রনাথের *Poems* (1942) গ্রন্থে কবিতা দুইটি পুনর্মুদ্রিত।

যদি চিত্রকর হইতাম, তাহা হইলে তাঁহার এই মূর্তি আঁকিয়া রাখিতাম। পরে দেখিরাছি যে সে ইচ্ছা দেশবিখ্যাত চিত্রকরের মনেও আগিয়াছিল, এবং সে ছবি তিনি আঁকিয়া গেলেন।’...

‘...কবির কণ্ঠস্বর মধুর অথচ তীব্র তুখানাদের মত সভার প্রত্যেক অংশ হইতেই শোনা গেল। রবীন্দ্রনাথ উঠিয়া পাড়াইতেই জনতার ভিতর হইতে একটা কলরব উঠিল, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বর কানে ঘাটবামাত্রই সকলে মহমুগ্ধের মত স্থির ও নীরব হইয়া গেল।’

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ব্রাহ্মসমাজের পাত্রী মিসেস অ্যানি বেসান্টকে কংগ্রেসের এই অধিবেশনে সভানেত্রী-নির্বাচনের প্রস্তাব লইয়া চরমপন্থী ও মধ্যমপন্থীদের মধ্যে যে প্রবল দ্বন্দ্ব হয় সেই সূত্রে, ‘সকটকালে লোকের নির্লক্ষ্যতাশয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অভ্যর্থনা’ সমিতির সভাপতি

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অঙ্কিত, প্রচলিত রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড

২ ক্রীড়াঙ্গী, পূর্ণাঙ্গী, পৃ ১২৮-১০০

১৯১৭ সালের কংগ্রেসে রবীন্দ্রনাথের অ’র-একটি চিত্র লিপিবদ্ধ হইয়াছে জেম্‌স্‌ কাউন্স—

As political leaders were recognised on entering the great platform, they were uproariously greeted, with special emphasis for the President - elect [Mrs Annie Besant], and an immense climax for Sir Rabindranath Tagore, then at the peak of his fame. . . For the opening of the session he ascended a high pulpit with slow dignity, and recited the invocation.. His descent to the platform was one of the unrehearsed scenes that make history. Mrs Besant rose quickly from her chair, met the poet, offered her hands to him and touched his hands with her forehead. Then Rabindranath offered his hands to Mrs Besant and bent from his height and touched her hands with his forehead.

—James H. Cousins in *We Two Together* (1950), pp 316-17

হইতে স্বীকার করিলেন।’^১ মধ্যমপন্থীগণ মিসেস বেমাণ্টের সভানেত্রী-পদে নির্বাচনে স্বীকৃত হইলে, ‘রবীন্দ্রনাথ যেমন ভাবে বিপদনিবারণের জন্য অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইতে স্বীকার করিয়াছিলেন, তেমনই ভাবে— গোল মিটিয়া গেলে সে পদ ত্যাগ করিলেন।’^২

‘এই দঙ্গালির মধ্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আপনার মান-অপমানের কথা বিন্দুমাত্রও মনে স্থান না দিয়া অতি সহজে অভ্যর্থনা-কমিটির সভাপতির পদ ত্যাগ করিয়া যেরূপ মহানুভবতা দেখাইয়াছেন, তাহা তাঁহার মত মানবপ্রেমিক ও দেশভক্তের উপযুক্ত হইয়াছে। ভগবান্ ঋহাকে বাস্তবিক সম্মানার্হ করিয়াছেন, তিনি লোকের কাছে সম্মান পাইতেছেন কি না, সে চিন্তা কেন মনে স্থান দিবেন? নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে তাঁহার বিরোধীরাও বৃষ্টিতে পারিবেন যে তিনি বরাবর কর্তব্যবুদ্ধি-ও-সত্বদেষ্ণু-প্রণোদিত হইয়া অনাসক্তভাবে কাজ করিয়াছেন।’^৩

পূর্বকথারূপে এই প্রসঙ্গে আরও দু-একটি তথ্য উল্লেখ করা যাইতে পারে—

১৯১৭ সালের জুন মাসে, ভারতবর্ষে আত্মশাসন-প্রবর্তন-চেষ্টার ফলে, ‘নির্বাসিত, অবরুদ্ধ বা নজরবন্দী শত শত বাঙালীর ন্যায় শ্রীমতী অ্যানি বেমাণ্ট ও তাঁহার দুইজন সহকারীর স্বাধীনতা লুপ্ত’^৩ হয়। ‘কথা হয় যে, টাউন হলে এক সভায় প্রতিবাদ করা হইবে,

১ শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, কংগ্রেস, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ ৩১০

২ [রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়], “রবীন্দ্রনাথের মহত্ব”, বিবিধ প্রসঙ্গ, প্রবাসী, কার্তিক ১৩২৪

৩ “প্রতিবাদের অধিকার”, বিবিধ প্রসঙ্গ, প্রবাসী, ভাদ্র ১৩২৪

এবং তখন বঙ্গের সব জেলায় প্রতিনিধি উপস্থিত থাকিবেন। গবর্নমেন্ট পক্ষ হইতে মিঃ কামিং ও কলিকাতার পুলিশ কমিশনার এই সভায় কয়েকজন উচ্চোক্তাকে ডাকিয়া এই জানাইয়াছিলেন যে, বাংলা গবর্নমেন্টে টাউন হলে এই সভা হইতে দিবেন না; কেবল মাদ্রাজ গবর্নমেন্টের একটি কাঙ্ক্ষিত প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতা গবর্নমেন্ট সভা হইতে দিতে পারেন না; অন্য প্রদেশে যাহা হইতেছে তাহার প্রতিবাদ বা আলোচনা বাংলা গবর্নমেন্টে বঙ্গ হইতে দিতে পারেন না, কেহ সভা করিয়া প্রতিবাদ করিলে গবর্নমেন্ট তাহাদের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগ করিবেন।^১ এষ্টরূপ অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ “কর্তার ইচ্ছায় কম” প্রবন্ধ পাঠ করিয়া [৪ অগঃ ১৯১৭] রাষ্ট্রিক ও সামাজিক আয়কর্ষ ও মুক্তির প্রসঙ্গ আলোচনা করেন।

‘যখন বঙ্গের গবর্নর টাউনহলে শ্রীমতী বেসান্টের স্বাধীনতা-লোপের প্রতিবাদ করিতে দিবেন না বলিয়া চক্রম জারী করেন, তখন বাক্যস্ফূর্তি “রাজনীতিকক্ষেত্রে শিক্ষানবীস” (“novice in politics”) রবীন্দ্রনাথেরই হইয়াছিল, তখন তিনিই রামমোহন লাঠীব্রহ্মের “কর্তার ইচ্ছায় কম” পড়িয়া বঙ্গের ভীতিবিহ্বল নীরবতা ভঙ্গ করিয়াছিলেন, বঙ্গের রাজনৈতিক মহাবীর্য কখন নাই।’^২

সরকারী আদেশে অস্বাভাবিক শ্রীমতী বেসান্টকে সমবেদনা-আপন-পূর্বক চিঠি লিখিয়াছেন এই সংবাদে বিচলিত কোনো ইংরেজ

১ “এমন চক্রম কি আমরা মাথা ঠেট করিয়া মানিব?” — রবীন্দ্রনাথ, পরে উল্লিখিত “কর্তার ইচ্ছায় কম” প্রবন্ধ।

২ “প্রতিবাদের অধিকার”, দ্বিবিধ প্রসঙ্গ, প্রকাশী, তারিখ ১৯২৪

৩ [রামমোহন চট্টোপাধ্যায়], “রবীন্দ্রনাথের মত”, দ্বিবিধ প্রসঙ্গ, প্রকাশী, কাঠিক ১৯২৪

বন্ধুকে রবীন্দ্রনাথ যে পত্র লেখেন তাহাতেও সরকারী নিপীড়নব্যবস্থার প্রতিবাদ করেন।^১

কংগ্রেসের সময় দেশকে যে-সকল কথা বলিবার জন্য “অস্তরে বাহিরে তাগিদ” অনুভব করিয়াছিলেন তাহা ব্যক্ত হইয়াছে এই সময়ে রচিত “ছোট ও বড়”^২ “স্বাধিকারপ্রমত্তঃ”^৩ প্রভৃতি প্রবন্ধে—

‘ভিক্ষার দানে^৪ আমরা স্বাধীন হইব না— কিছুতেই না।...বাহিরের দিক হইতে স্বাধীনতা পাওয়া যায় এমন ভুল যদি মনে আকড়িয়া ধরি তবে বড় দুঃখের মধ্যেই সে ভুল ভাঙবে। ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে পারি নাই বলিয়াই অস্তরে বাহিরে আমাদের বন্ধন। বাহিরের একজন আমার দেশকে হাতে তুলিয়া দিলেই তবে তাহাকে পাইব একথা যে বলে সে-লোক দান পাইলেও দান রাখিতে পারিবে না।... ভিক্ষার ডাকে আমরা মাহুষ হইব না।’^৫

পত্র ২২। ‘নিবেদিতার বইয়ের সেই ভূমিকা’

এই ভূমিকা রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত লিখিয়াছিলেন— বহিধানির নাম *The Web of Indian Life*। ১৯১৮ সালে প্রকাশিত ইহার নবসংস্করণে এই ভূমিকা সন্নিবিষ্ট হয়, ভূমিকার তারিখ ২১ অক্টোবর ১৯১৭।

১ “The Internments and Mrs Besant। Sir Rabindranath Tagore’s Letter”, *Bengalee*, September 7, 1917

২ প্রবাসী, কাঠিক ১৩২৪ ৩ প্রবাসী, মাঘ ১৩২৪

৪ ভারতসচিব মন্টেগু ১৯১৭ সালের ২০ অগস্ট, ব্রিটিশ পদমেট কর্তৃক ক্রমশঃ জনসাধারণের নিকট দায়ী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন, সেই কথাই উল্লিখিত।

৫ “স্বাধিকার-প্রমত্তঃ”, প্রবাসী, মাঘ ১৩২৪, পৃ ৩৩০

পত্র ২২। 'তোমাদের লেকচারের সম্মুখে'

'ভবিষ্যতে এই [বস্তু-বিজ্ঞান-] মন্দিরে আরও অনেক নতুন নতুন বস্তুতা হইবে। বিজ্ঞান ছাড়া বিদ্যার অন্যান্য শাখা সম্বন্ধেও বস্তুতা হইবে। শ্রীমুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি বস্তুতা কবিবেন।'

পত্র ৩০। 'অজিতের অকালমৃত্যু'

অজিতকুমার চক্রবর্তী (১৮৮৬-১৯১৮) শাস্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম যুগে ত্যাগব্রতী শিক্ষকরূপে যোগ দেন; তরুণ বয়সেই তিনি সাহিত্যসমালোচক ও জীবনীকার -রূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। এই পত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার যে বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন সে বিষয়ে দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া ঘাইতে পারে; বিপিনচন্দ্র পাল ১৩১৮ চৈত্র -সংখ্যা বঙ্গদর্শনে "চরিত-চিত্র। রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধে, রবীন্দ্রসাহিত্য যে বস্তুতন্ত্রতাহীন এই মতবাদের প্রচার করেন, তাহার প্রতিবাদ করেন অজিতকুমার ১৩১৯ আশাঢ় -সংখ্যা প্রবাসীতে, "রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও দেশচর্যা কি বস্তুতন্ত্রতাহীন" এই প্রবন্ধে। ১৩২৪ সালের শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে অজিতকুমার "বৈষ্ণব কবিতা" নামে একটি প্রবন্ধে বৈষ্ণব কবিতার যে ব্যাখ্যা দেন তাহার ফলে নারায়ণ, উপাসনা, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্রে তাঁহাকে তীব্র প্রতিবাদের সম্মুখীন হইতে হয়— ইহাদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র পালের ("একপানি পত্র", নারায়ণ, মাঘ ১৩২৪) ক্ষাঘ 'প্রবল পক্ষ'ও ছিলেন। ১৩২৫ শ্রাবণের প্রবাসী পত্রে অজিতকুমার

১ "বস্তু-বিজ্ঞান-মন্দির", বিদিত প্রসঙ্গ, প্রবাসী, মাদ ১৩২৪

২ অজিতকুমারের তুরারোগ্য পীড়ার সংবাদে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞাননাথ বৈষ্ণবকে লিখিয়াছিলেন—

'...অন্ন দয়স থেকে ও আমার খুব কাছে এসেছিল— ও যদি চলে যায় ত একটা ঠাক রেখে যাবে।'

ইহাদের সকলেবই বক্তব্যের প্রত্যুত্তর দেন।

পত্র ৩১। জগদীশচন্দ্র বাংলায় যে-সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহাবই সংকলন 'অব্যক্ত' নামে ১৩২৮ সালে বাহির হয়। নিম্নপত্র^১-সহ জগদীশচন্দ্র উহা রবীন্দ্রনাথকে পাঠাইয়াছিলেন—

কলিকাতা

৩রা অগ্রহায়ণ

১৩২৮

বন্ধু

সুখে দুঃখে কত বংশরের স্মৃতি তোমার সহিত জড়িত।
অনেক সময় সে সব কথা মনে পড়ে। আজ জোনাকির আলো রবির
প্রথর আলোর নিকট পাঠাইলাম।

তোমার

জগদীশ

এই পত্র ও গ্রন্থেব প্রাপ্তিস্বীকারে রবীন্দ্রনাথের চিঠিখানি লিখিত।

পত্র ৩২। এই চিঠিখানিতে বন্ধনৌমধ্যে অপর যে তারিখ অনুমান
করা হইয়াছে তাহার কারণ, পত্রের শেষে বিশ্বভারতীর কনস্টিটুশন-
রেজেষ্ট্রির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার তারিখ ১৬ মে ১৯২২, মুদ্রিত
কনস্টিটুশনে এই তারিখ দেওয়া আছে।^২— জগদীশচন্দ্র বিশ্বভাবতীর

১ শ্রীপ্রমোদকুমার সনস্কৃতপুর সৌজশ্বে ১৩৪৫ পৌষের প্রদানী পত্রে মুদ্রিত।

২ বিশ্বভারতীর প্রথম যুগ্ম-কর্মসচিব শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ চিঠিখানির এই
অনুমিত তারিখ সমর্থন করেন।

‘প্রদান’ (ডাটম-প্রেসিডেন্ট)-পদ স্বীকার করিয়াছিলেন।

পত্র ৩৩। ‘অদ্বৈতম্ নৈবে এসে পৌছলুম।’

এই বৎসর (১৯২৬) যে মাস হইতে কবি বিদ্যমানমণ্ডলে বহু ছিলেন, ডিসেম্বরে শাস্তিনিকেতনে প্রত্যাবৃত্ত হন।

পত্র ৩৩। ‘আমার নামে উৎসর্গ-করা তোমার যে বই’

জগদীশচন্দ্র ১৯২৬ সনের ২১ এপ্রিলে লিখিতছেন—‘Nervous Mechanism in Plants তোমার নামে উৎসর্গ করিলাম।’

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথ তাহার *Sacrifice and other plays* (1917) -এর অন্তর্গত *Sannyasi or the Ascetic* (প্রকৃতির প্রতিশোধ -এর অন্তর্গত) জগদীশচন্দ্রকে উৎসর্গ করেন। পূর্বে, কথা (১৩০৬) ও মেঘা (১৩১৩) উৎসর্গ করিয়াছিলেন— উৎসর্গ-কবিতা দুইটি বর্তমান গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংকলিত।

পত্র ৩৫। ‘তোমার এই বিয়ম উদ্ভোগের দিনে’

এই সময় জগদীশচন্দ্র নিকটাত্মীয়ের কঠিন পাদায় উদবিগ্ন ছিলেন। জগদীশচন্দ্রের ২২ নভেম্বর ১৯২৮ তারিখের পরে উল্লিখিত।’

পত্র ৩৫। ‘তোমার ৭০ বছরের অভিনন্দনসভায়’

১ এই পত্র মুদ্রিত হইলে ৮, রবীন্দ্রনাথ-সংগ্রহে সংকলিত।

২ On the 30th November, 1928, Sir Jagadis completed the seventieth year of his life. A movement to celebrate the event was inaugurated by Sir Jagadis's life-long friend and admirer, the poet Rabindra Nath Tagore, with whom were associated some of the foremost of the great savant's pupils

—The Calcutta Municipal Gazette

Sir J. C. Bose Supplement, 27 November, 1937

জগদীশচন্দ্র ২২ অক্টোবর ১৯২৮ তারিখের পূর্বোক্ত পত্রে^১ লিখিত ছিলেন—

‘১লা ডিসেম্বরে আমার ৭০ বৎসর হইবে। সেদিন আমি সমস্ত বোঝাপড়া ঠিক করিব সেদিন তোমার সহিত দেখা হইলে সুখী হইব। তোমার শুভ ইচ্ছা যেন আমাকে সেদিন বলীয়ান করে।’

রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের সপুত্রিতম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে যে কবিতা রচনা করেন তাহা বনবাণী গ্রন্থে সংকলিত ; বর্তমান গ্রন্থেও কবিতা হস্তাক্ষরে মুদ্রিত হইল।

জগদীশচন্দ্রের উক্ত পত্রের অপর অংশও উদ্‌প্রতিযোগ্য—

‘তুমি যে মনেব কাছে আছ তাহাতে আমি তোমার বিষয় সর্বদা ভাবিতেছি। ত্রিশ বৎসর হইতে আমরা সহযোগী এবং সহকর্মী। তোমার কাছে আমাকে আঘাত করে। যদি কোন রকমে তোমার অভীষ্ট সাধনে সহায় হইতে পারি, তাহা হইলে আমি সফলকাম হইব।

‘তুমি যাহা সাধন করিয়াছ তাহা অবিনশ্বব রহিলে। আর যে বেশী তোমার দান তাহা অযাচিত। সে কাণ্ডে আমি তোমার চিরসহায় মনে করিও।

‘আমরা দুজনেই প্রবল শত্রুকে প্রবল মিত্র করিয়াছি। তবে যেখানে শত্রুও নাই, মিত্রও নাই, সেই ক্ষুদ্রতার মনো মনের জোর রাখা কঠিন। তাহার মনোও বড় কাছ হইয়াছে এবং হইবে। এই কথা সর্বদা মনে রাখিও। আমাদের মনো যে বহুদিনের একতা, তাহা দেবতাব দান বলিয়া মনে করি।...

১ এই পত্র মুদ্রিত হয় নাই, বদীন্দ্রসম্মন-সংগ্রহে আছে।

‘শেষদিন পযাম্বুও যে সাধন অমরা আনুষ কবিঘাছি তাহাতেই
জীবন অবসান করিব। শ্রিয়মাণ হইব না। অমৃত আমরা দুজন একে
অন্যের ভার বহন করিব।’

পত্র ৩৬। পত্রখানির মাল ইত্যাদি অমৃতমান কর য'য় নাই বলিয়া
ইহা সবশেষে বসানো হইয়াছে। তবে চিঠিখানি শাস্ত্রিনিকেতন হইতে
বিদ্যালয়ের প্রথম যুগে লিখিত এটুকু অমৃতমান করা যাউতে
পারে।

অন্য পত্র নাহা'র .ক লিখিত ৭।

পত্র ১। উষ্ট্রা জগনৌ'চক্রে লিখিত ৪ জুন। ১২ ১ তারিখের
পত্র, বহুমান গ্রন্থ, পৃ ২৮

পত্র ২। ‘নিবন্ধিত'র কল্যাণ' একটি জাপানী'র মর্মেত আমার
বন্ধুতা হইয়াছে।’

এই জাপানী মনীষী একাদর কাহাণী— ব.মান কাহাণীর সূচনা
বা'লায় নবজাগরণে ইহার উৎসাহদান' কতদূর কলবতী হইয়াছিল
বসীন্দ্রনাথ জাপানে একটি বন্ধুতার তাহান বিস্ময়িত আশ্চর্যনা
করিয়াছেন—

The voice of the East came from him to our
young men one of the influences which acted
towards the awakening of spirit in Bengal flowed
from the heart of that great man, Okakura ১

১ Rabindranath Tagore, On Oriental Culture and Japan's
Mission, Lecture delivered at the Industrial Club, Tokyo, May 15,
1929, pp. 1-12.

পত্র ৩। ‘আমার দুর্বলতা চলিয়া যায় .. আমি রণে ভঙ্গ দিব না।’

ইহার কিছু পূর্বে রবীন্দ্রনাথের কন্যা রেণুকার মৃত্যু হইয়াছে।

পত্র ৩। ‘আর কই মাছ নয়।’

‘বোঁঠাকুরাণী’ অবলা বসুর মৎস্যরন্ধনকলায় পটুতার সপ্রীতি উল্লেখ রবীন্দ্রনাথের একাধিক পত্রে আছে; সম্ভবতঃ পত্নী ও কন্যা -বিয়োগে, এ সময় রবীন্দ্রনাথ নিরামিষাশী।

পত্র ৪। ‘আমার এক বোঁঠাকরণ ছিলেন’

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী কাদম্বরী দেবী (মৃত্যু ১২৯১)। দ্রষ্টব্য জীবনস্মৃতির “মৃত্যুশোক” অধ্যায়, ও ছেলেবেলা গ্রন্থ।

পত্র ৫’। এই পত্রে ভগিনী নিবেদিতার পীড়ার উল্লেখ অসুসরণ করিয়া নিবেদিতার জীবনকথা হইতে যতদূর জানা যায় তাহাতে দেখি যে, তিনি ১২০৫ (১৩১২) ও ১২০৬ (১৩১৩) সালে দুইবার কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন, দুইবারই তিনি জগদীশচন্দ্র ও তাঁহার সহধর্মিণীর তত্ত্বাবধানে ছিলেন— ১২০৫ সালে অগস্ট মাসে পীড়িত হইয়া কয়েক মাস অসুস্থ ছিলেন, অক্টোবরে জগদীশচন্দ্র বসু ও অবলা বসুর শুশ্রুষায় দাঙ্কলিতে ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমীরা দেবীর মঙ্গলপুরে জ্যোষ্ঠা ভগিনীর গৃহে ষাইবার কথা এই পত্রে আছে; অপর একটি উল্লেখ পাওয়া যায় মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্রে— ‘মীরা, বেলায় কাছে মঙ্গলপুরে গেছে... ২৭শে কার্তিক ১৩১৩।’^২

১ প্রবাসীতে চিঠিখানির তারিখ এইরূপ মুদ্রিত হয়— ‘১৩ [কীটদষ্ট]’।

২ স্মৃতি, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত বিজ্ঞাননাথ ও রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলির সংগ্রহ (১৩৪৮), পৃ ৫২।

এই উভয় বিবেচনার, পত্রের তারিখ ১৩১২ বা ১৩১৩ হইতে পারে
এরূপ অনুমান করা হইয়াছে।

পত্র ৬। দ্রষ্টব্য অগদ্যচন্দ্রকে লিখিত ২৪-সংখ্যক পত্র, বর্তমান গ্রন্থ,
পৃ ৫৫, এবং তৎসংক্রান্ত গ্রন্থপরিচয়।

অবলা বসু -কর্তৃক রবীন্দ্রনাথকে লিখিত ২০ মার্চ ১৯০৮ তারিখের
পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথের এই পত্র ; তদনুযায়ী ইহার তারিখ অনুমিত
হইয়াছে। শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর কথা জানিয়া অবলা বসু মহোদয়া উক্ত
পত্রে লিখিয়াছিলেন—

‘চিঠিপত্র না লিখিলেও জানিবেন, আমাদের হৃদয় আপনার সমুদয়
শোকদুঃখে আন্দোলিত ও ব্যথিত। আপনার বিপদে আমরা ঘেরূপ
কষ্ট পাই, আপনার ধৈর্য ও ঈশ্বর-প্রীতি দেখিয়া আমরা সেইরূপ আশ্বস্ত
হই। আপনি যে-সব গুরুতর আঘাত পাঠতেছেন তাহা সামলাইয়া
প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেমিকের মত আরও গভীরতমভাবে সাধু কার্যে ও
চিন্তাতে মনোনিবেশ করিতেছেন। ইহাকেই প্রকৃত ঋষিভাব বলা যায়।
আপনার অসামান্য মহৎগুণ দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছি। সেবার বড়
দিনের ছুটির সময় অশান্তিপূর্ণ চঞ্চল হৃদয় লইয়া শিলাইদহে গিয়াছিলাম,
আপনার সঙ্গে দুটি কথা বলিঘাই নবজীবন লইয়া কলিকাতার
ফিরিয়াছিলাম। সে-কথা আমি কোন দিন ভুলিতে পারিব না।

‘বাহাকে এত যত্ন ও স্নেহে বঞ্চিত করিয়াছিলেন সে সব আশা
চূর্ণ করিয়া অকালে পৃথিবী ত্যাগ করিয়া যাবের কোলে গেল। আপনি
মনকে শাস্ত সমাহিত করিয়া দ্বিগুণতর উৎসাহে সমুদয় শক্তি ও চিন্তা

পত্র ৬, ৭

দেশের কাজে অর্পণ করিতেছেন, ইহার উপরে আমাদের বাক্য ব্যর্থ। আপনাকে আর কি বলিতে পারি— আপনার মনুষ্যত্ব দেবত্বে পরিণত হউক। আমরা ধন্য হই, জন্মভূমি ধন্য হোক। [পাবনায়] প্রাদেশিক [সম্মিলনীর] অধিবেশনে আপনার বক্তৃতা পড়িয়া সকলে চমৎকৃত হইয়াছে, ইহাতে আমাদের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতেছে। আপনি এই সঙ্কটের সময় দেশবাসী সকলকে একমুখে দীক্ষিত করিয়া বঙ্গদেশকে সকলের শীর্ষস্থানীয় করিয়াছেন।’

পত্র ৬। ‘আমাদের ব্রাহ্মধর্ম’

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ -সংকলিত ‘ব্রাহ্মধর্মঃ’ গ্রন্থ।

পত্র ৭। জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর (২৩ নভেম্বর ১৯৩৭) পর এই পত্র লিখিত।

পত্র ৭। ‘মৃত্যুর দ্বার থেকে সেদিন ফিরে এসেছি।’

এই পত্র লিখিবার কিছুকাল পূর্বে, সেপ্টেম্বর মাসে, ববীন্দ্রনাথ গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন, প্রাণসংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। ববীন্দ্রনাথ এই রোগমুক্তির পন ‘প্রামিতিক’ কাব্য লেখেন।

‘সত্যের মন্দিরে তুমি।’

এই কবিতা কোন্ সময়ে রচিত তাহা জানা যায় না। সম্ভবতঃ, ১৯০০-০২ সালে জগদীশচন্দ্রের বিলাতপ্রবাসকালে রচিত ও তাঁহার নিকট প্রেরিত। ১৩৩৪ বৈশাখ -সংখ্যা প্রবাসীতে কবিতাটি মুদ্রিত হয়।

‘সত্যের তুমি মিলে’

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, বরীন্দ্রনাথের ১৩ বৈশাখ ১৯০৬ তারিখের পত্র ও উৎসর্গস্থ গ্রন্থপরিচয়।

‘জগদীশচন্দ্র বসু’ : ভারতের কোন বৃহৎ কবির তরুণ মূর্তি তুমি

এই কবিতা ১৯০৮ আশাঢ় -সংখ্যা বঙ্গবর্নন পত্র, বরীন্দ্রনাথ-লিখিত ‘আচার্য্য জগদীশের জয়গাথা’ প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত পদ্যে, মুদ্রিত হইয়াছিল। কবিতাটি ‘উৎসর্গ’ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

৬ জুলাই ১৯০১ তারিখের পদ্যে জগদীশচন্দ্র সম্ভবতঃ এই কবিতারই প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছেন—

‘তোমার পদ্য ও কবিতা পাইয়া আমি কিরূপ উৎসাহিত হইয়াছি, তাহা জানাইতে পারি না। তোমার ঘরে আমি কোন মাতৃঘর শুনিতে পাই...’

প্রখ্যাত কবি মনোমোহন ঘোষ এই কবিতাটির একটি ইংরেজি অনুবাদ করেন— Theodore Douglas Dunn -কর্তৃক সম্পাদিত The Bengali Book of English Verse (1928) গ্রন্থে সংকলিত।

‘সম্বর্ধনা-সঙ্গীত’ : জয় তব হোক জয়

১৯০২ সালে সম্ভবতঃ অক্টোবর মাসে^১ জগদীশচন্দ্র স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ‘ভারত সঙ্গীত সমাজ’ জগদীশচন্দ্রকে সম্বর্ধনা-জ্ঞাপনের জন্য একটি ‘সারস্বত সম্মিলন’এর আয়োজন করেন (১৯ মাঘ ১৩০২ বা ২ ফেব্রুয়ারি ১৯০৩ তারিখে), ‘সেই সম্বর্ধনাক্ষণের সভাপতি— কুচবিহারের মহারাজা বাহাদুর। অক্ষণের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিম্নলিখিত সঙ্গীত-রচনা করিয়াছিলেন :—

জয় তব হোক জয়।^২

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা সম্পূর্ণ অবাস্তব হইবে না যে, সরলা দেবীর রচিত সুবিখ্যাত সংগীত “বন্দি তোমায় ভারতজননি বিজামুকটনারিনি” গানটিও এই সময় জগদীশচন্দ্রের সম্বর্ধনা উপলক্ষ্যে রচিত।^৩

‘বন্ধু, এ যে আমার লক্ষ্যবর্তী লতা’

উদ্ভিদে জীবনের মাত্রা সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্রের পরীক্ষার বিষয়ে একটি

১ সম্ভবতঃ জগদীশচন্দ্র ১৯০২, ১৯ মে মাসে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন, অগ্রহায়ণ ১৩০৩

২ শ্রীমতীমঙ্গলমঙ্গল (মাস ১৩৬০ জৈষ্ঠ-সংখ্যা) মাসিক বঙ্গমতীতে ‘সঙ্গীত সমাজ’ পত্রিকার এই সম্মিলনের বিবরণ লিখিয়াছেন, অক্ষণের তারিখ, উদ্ভিদাংশ ও রবীন্দ্রনাথের গানটি এই পত্রিকায় উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সম্বর্ধনা সম্বন্ধে আরো বিবরণ ও ‘সঙ্গীত সমাজ’এর পরিচয় এই পত্রিকায় আছে। গানটি ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের কোনো গ্রন্থ সংকলিত হয় নাই। শ্রীমতীমঙ্গল মঙ্গলমঙ্গলের নিকটে বঙ্গীত রবীন্দ্রনাথের একটি খাতায় গানটির পাণ্ডুলিপি আছে, তাহার প্রতিকৃতি মুদ্রিত হইল। হস্তাক্ষরের প্রতিকৃতি ও মুদ্রিত পাঠ কিছু পাথক্য আছে।

৩ এই গানটি ‘বন্দনা’ নামে, ১৩০২ ফাল্গুন-সংখ্যা ভারতী পত্র, নিম্নমুদ্রিত সম্পাদকীয় মন্তব্য-সহ প্রকাশিত হয়—

‘এই সংসদে সারস্বত-উৎসবকালে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রকে কলিকাতার বিভিন্ন সমাজ ও সম্প্রদায় হইতে সম্মান ও অঘা প্রদত্ত হইয়াছে। এই সঙ্গীতটি তাহাঙ্গলক্ষ্যে বিরচিত।’

বাহন ছিল লজ্জাবতী লতা, ইহা সুবিদিত^১, এই কবিতায় জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারের প্রতি যে ইঙ্গিত করা হইয়াছে তাহাও লক্ষ্যগোচর।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা বোধ করি অসম্ভব হইবে না যে, রবীন্দ্রনাথের নোবেল-পুরস্কার-প্রাপ্তির পর শাস্ত্রনিকেতনে সবসাধারণের পক্ষ হইতে যে অভিনন্দনসভা হয় তাহার সভাপতি ছিলেন জগদীশচন্দ্র দত্ত। তিনি এই উপলক্ষ্যে, সম্ভবতঃ স্বয়ং সাধনার প্রতীকস্বরূপ, 'ছে'ট মাটির টার বসানে একটি লজ্জাবতী লতা তাঁহাকে, রবীন্দ্রনাথকে। উপহার দিলেন।^২

পরিচিষ্ট ৩

'আধুনিক ভারতবর্ষে বিহারী মা'ক মা'ক'

ইহা ১৯০৫ পৌষ-মংগল প্রদীপ পদে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'মন্দিরাভিযুগে' প্রবন্ধের একংশ। 'মা'ক নামক বোম্বাই শিল্পবিদ্যালয়ের একটি নবিতা ছাত্র পার্বসি-প্রার্থীর এক নারীমূর্তি রচনা করিয়াছেন। তাহার নাম দিয়াছেন 'মন্দিরাভিযুগে'। এই মূর্তির আলোচনা প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধটি লিখিত, সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি এ দাব্য কোনো গৃহ-ভুক্ত হয় না। প্রদীপে, রচনার সহিত লেখক-রূপে রবীন্দ্রনাথের নাম নাট, তবে সচীতে আছে।

স্বয়ং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বিশেষের বিজ্ঞানীসমাজে আলোচনা ও প্রচার-প্ৰদর্শন বিলাতপ্রবাস ('First Scientific Deputation',

১ সত্বেশ, জগদীশচন্দ্র দত্ত, "অ'ভুত উদ্ভিদ", অধ্যক্ষ গ্রন্থ

২ কীমোতা দেবী, পূর্ণাঙ্গিত, পৃ ১০৪

পরিশিষ্ট ২

১৮৯৬-৯৭) হইতে জগদীশচন্দ্র স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইবার পর, এই প্রবন্ধ রচিত ; ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন, রয়াল ইনস্টিটিউশন প্রভৃতিতে জগদীশ-চন্দ্রের বক্তৃতা এ সময় বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল ।

‘আচার্য্য জগদীশের জয়বার্তা ।’

‘জড় কি সজীব ?’

রবীন্দ্রনাথের ৩ জুলাই ১৯০১ তারিখের পত্রে এই দুটি প্রবন্ধ উল্লিখিত— রচনা দুইটি ১৩০৮ সালের বঙ্গদর্শন পত্রে যথাক্রমে আষাঢ় ও শ্রাবণ -সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল । এ সময় জগদীশচন্দ্র তাঁহার দ্বিতীয় বিজ্ঞান-যাত্রায় (১৯০০-০২) বিদেশে স্মৃধীসমাজে আপনার আবিষ্কার -প্রচারে প্রবৃত্ত । বঙ্গদর্শনে রচনা দুটির শেষে বা সূচীতে রবীন্দ্রনাথের নাম নাই, তবে এ সময় রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনের সম্পাদক, তাঁহার সকল রচনা বিনা স্বাক্ষরেই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত । ৩ জুলাই ১৯০১ তারিখের পত্র -দ্বারাও রচনা দুইটি যে তাঁহার, এ কথা সমর্থিত ।

‘এ কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে’

১৩১১ আষাঢ় বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত ‘য়ুনিভার্সিটি বিল’ প্রবন্ধ হইতে উৎকলিত । উক্ত প্রবন্ধ পরে ‘আত্মশক্তি’ গ্রন্থে সংকলিত । চতুর্থখণ্ড রবীন্দ্র-রচনাবলী দ্রষ্টব্য ।

‘আমাদের যাহা নাই’

১৩১২ জ্যৈষ্ঠের ভাগ্যের পত্রে মুদ্রিত ‘বিজ্ঞানসভা’ প্রবন্ধ হইতে উৎকলিত । অধুনা রবীন্দ্র-রচনাবলীর দ্বাদশ খণ্ডে সংকলিত আছে ।

‘পত্র-পরিচয়’

রবীন্দ্রনাথকে লিখিত ‘জগদীশচন্দ্র বঙ্গের পত্রাবলী’র প্রকাশ প্রবাসী

পত্র ১৩৩৩ সালের জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যায় আরম্ভ হইয়া পৌষ-সংখ্যায় সমাপ্ত হয়।
উহার ভূমিকাস্বরূপ এই 'পত্র-পরিচয়' প্রথম কিস্তির প্রারম্ভে (প্রবাসী,
জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩) মুদ্রিত হইয়াছিল।

'জগদীশচন্দ্র'

জগদীশচন্দ্রের পরলোকগমনের (২৩ নভেম্বর ১৯৩৭) পর রবীন্দ্রনাথের
এই প্রবন্ধ প্রবাসী পত্রে (পৌষ ১৩৫৭) প্রকাশিত হয়।

রচনাটির স্বরেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত ইংরেজি রূপ ১৯৩৮ আশ্বিন-সংখ্যা
মডার্ন রিভিউ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।^১

১৯৩৭ ডিসেম্বর-সংখ্যা বিশ্বভারতী-নিউজ পত্রে এবং মডার্ন রিভিউ
পত্রে জগদীশচন্দ্রের স্বরণে রবীন্দ্রনাথের অল্প একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত
হইয়াছিল।

জগদীশচন্দ্রের পরলোক-গমনের পর বঙ্গ-বিজ্ঞান-মন্দিরে তাঁহার
জন্মদিনের তথা বঙ্গ-বিজ্ঞান-মন্দির-প্রতিষ্ঠার উৎসবে (৩০ নভেম্বর)
প্রতি বৎসর 'স্ব'চ'য় জগদীশচন্দ্র বঙ্গ-স্মৃতি' বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়। প্রথম
বক্তা নিযুক্ত হন রবীন্দ্রনাথ, তাঁহার লিপিত ভাষণ পুস্তিকাভায়ে প্রকাশিত
হইয়াছিল।^২ 'তিনি [রবীন্দ্রনাথ] আমিত্তে না পারায় উহা আচার্য
মহাশয়ের এক দৃক প্রাক্কন ছাড়া কদুক পঠিত হয়।'^৩ ইহা বিশ্বভারতী

১ এই প্রবন্ধের শেষে টীকা আছে যে, জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ পাঠিয়া রবীন্দ্রনাথ
অশ্রুনিঃকতনের ছাত্রোৎসব দাড়া বলিয়াছিলেন উহা তাহারই অনুমোদিত অনুবাদ।

২ Sir Jagadish Chandra Bose । Memorial Address । By । Dr.
Rabindra Nat' Tagore । 30th November 1938 । Bose Institute

৩ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৪ প্রবাসী, পৌষ ১৩৫৫, পৃ ৪৭২

পরিশিষ্ট ৩

কোয়ার্টার্স পত্রে (নভেম্বর ১৯৩৮) এবং মডার্ন রিভিউ পত্রেও (ডিসেম্বর ১৯৩৮) মুদ্রিত হইয়াছিল ।

শেয়ার্স ইংরাজি রচনা দুটিও 'জগদীশচন্দ্র' প্রবন্ধের অব্যবহিত পরে এই গ্রন্থে সংকলিত হইল ।

পরিশিষ্ট ৩

১. এই চিঠির প্রতিলিপি আগরতলার শ্রীমত্যাশ্রম বঙ্গের মৌজুনে প্রাপ্ত । ১৩৫৯ শারদীয়া দেশ পত্রিকায় (পৃ ১৪) মুদ্রিত ।

২. এই পত্র রবীন্দ্রস্মৃতি পূর্কানায় [১৩৪৮] প্রকাশিত (পৃ ১১০-১১) ।

৩. চিঠিখানি ১৩৫০ বৈশাখ-সংখ্যা বিশ্বভারতী পত্রিকায় (পৃ ৬০০) মুদ্রিত হইয়াছে । সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্র বঙ্গের ১০ সেপ্টেম্বর ১৯০০ তারিখের পত্র পাঠিয়া এই চিঠি লিখিত— জগদীশচন্দ্রের উক্ত পত্রের ভাষাও অংশতঃ এই পত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে । তদনুযায়ী এই চিঠি এই পরিশিষ্টে মুদ্রিত পূর্ববর্তী পত্রের আগে বসিবে । বিশ্বভারতী পত্রিকায় চিঠিখানির পোস্টমার্ক উল্লিখিত হইয়াছে— Shelidah 2 Oct [1900] । মূল পত্র রবীন্দ্র-সদনে রক্ষিত ।

৪. এই চিঠিখানি ১৩৫৯ আশ্বিন-সংখ্যা বিশ্বভারতী পত্রিকায় মুদ্রিত । এই পত্রে রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রের যে পত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার তারিখ ২০ জুলাই ১৯০১ ।

৫. এই পত্র ১৩৫৯ শারদীয়া দেশ পত্রিকায় কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত । আগরতলার শ্রীশৈলেশ দেববর্মার উদ্যোগে প্রাপ্ত ।

৬. পত্রখানির প্রতিলিপি আগরতলার শ্রীমত্যাশ্রম বঙ্গের মৌজুনে

প্রাপ্ত। শ্রীমদ্বৈষ্ণবকিশোর দেববর্দার সৌজন্যে চিঠিখানি ১৩৬০ শারদীয়া সংখ্যা ত্রিপুরাব কথা (আগরতলা) পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

৭. এই পত্র রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত আছে।

৮. এই চিঠিখানি ১৩৬২ অগ্রহায়ণ -সংখ্যা বিশ্বভারতী পত্রিকায় (পৃ ৩৩৩) প্রকাশিত।

১৯০৪

‘প্রজ্ঞাপত্র’

ভাণ্ডার (১৩১২-১৩) পত্রিকার সম্পাদকরূপে রবীন্দ্রনাথ ঐ পত্রে একটি ‘প্রজ্ঞাপত্র’ বিভাগের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, সাধারণতঃ দেশের প্রদান সমস্যাগুলি সহজে প্রসঙ্গ করা হইত, এবং দেশের অনেক মনোমী উত্তরে সে সহজে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিতেন। ১৩১২ জ্যৈষ্ঠ -সংখ্যা ভাণ্ডার হইতে এই প্রজ্ঞাপত্র উদ্ভূত হইয়াছে।

এই রচনার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জগদীশচন্দ্রের নিম্নলিখিত পত্রখানি অসুধাবনয়োগা—

16-5-1905

[২ জ্যৈষ্ঠ ১৩১২]

‘... ভাণ্ডারের লেখা বেশ হইয়াছে। তবে যেসময়ে আবৃত সিংহনাদ লোককে বৃদ্ধিতে পারিবে। একপ লেখা হইলে অ’ম’র বইখানা সহজেই বোধগম্য হইবে।’

সহস্রতঃ জগদীশচন্দ্রের অ’দিকার -বিসয়ে বাংলায় বই লিখিবার বা সম্পাদন করিবার কল্পনা এ সময় রবীন্দ্রনাথের মনে ছিল; তুলসীদাস জগদীশচন্দ্রের ২১ জুলাই ১৯০১ তারিখের চিঠি।

চিঠিপত্র : ৬

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের জন্য বাঙালী মনীষীপ্রধানদের লইয়া যে সমিতি গঠিত হয় জগদীশচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম ছিলেন, এবং দেশবাসীর প্রতি সমিতির নিবেদনপত্রে অন্যতম স্বাক্ষরকারী ছিলেন।^১

রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিপূর্তি-উৎসব (“রবীন্দ্র-জয়ন্তী”) উপলক্ষ্যে করিয়া ‘সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ হইতে, কলিকাতা নগরীতে, তাঁহার যথোচিত সংবর্ধনা এবং একটি আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠান’-এর ব্যবস্থা করিবার জন্য কলিকাতায় যে ‘পরামর্শ সভা’ বা ‘উদ্বোধন সভা’ (২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮) অনুষ্ঠিত হয় তাহার আশ্রয়-পত্রে (২৫ বৈশাখ ১৩৩৮) প্রথম স্বাক্ষর জগদীশচন্দ্রের— তিনিই জয়ন্তী-উৎসব-পরিষদের সভাপতিও নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

এই উৎসব উপলক্ষ্যে যে *Golden Book of Tagore* (১৯৩১) প্রকাশিত হয় তাহার অন্যতম উদ্যোক্তা বা sponsor ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু^২।

জগদীশচন্দ্র গোল্ডেন বুক অব টাগোর গ্রন্থে যে নিবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, ‘জয়ন্তী-উৎসর্গ’ (১৩৩৮) পুস্তকে তাহার অনুবাদ মুদ্রিত হয়; তাহাতে জগদীশচন্দ্র বলেন, ‘জীবনের বহুবিচিত্র বিকাশ ও ধারার পরিচয় লাভের পথে একদা আমি যখন তিলে-তিলে অগ্রসর হইতেছিলাম সেই ক্রান্তিহীন প্রয়াসে বৎসরের পর বৎসর তিনি আমাকে প্রতিদিন সখ্য ও সাহচর্য্য দান করিয়াছেন।’

১ *The Calcutta Municipal Gazette, Tagore Memorial Special Supplement, 13 September 1941, p. lvii*

২ অন্যান্য sponsor ছিলেন মহারা গাঙ্গী, রম্যা রমা, আলবার্ট আইনস্টাইন, কন্সটেন্স পালামাস।

প্রবন্ধপরিচয়

উৎসবানুষ্ঠানে (২৭ ডিসেম্বর ১৯৩১) জগদীশচন্দ্র উপস্থিত থাকিতে
পারেন নাই, রবীন্দ্রনাথকে নিম্নমুদ্রিত পত্রে^১ শুভকামনা জ্ঞাপন করেন —

সিঁরিখি

২৭শে ডিসেম্বর ১৯৩১

বন্ধু—

তুমি জন্মযুক্ত হও ।

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু

অবলা বসু মহোদয়া রবীন্দ্র-জগদীশ-সৌরভ্য-প্রসঙ্গে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন—

‘জীবনের শেষ বৎসরও উনি [জগদীশচন্দ্র] প্রভাহ গ্রামোফোনে
কবির স্বর,

আজি হতে শতবর্ষ পরে

তিনিয়া শয়ন করিতে যাইতেন ।’^২

১ The Calcutta Municipal Gazette. Tagore Memorial Special
Supplement, 13 September 1941, p. lxiii

২ প্রবাসী, পৌষ ১৩৪৫, পৃ ৪৭২

ব্যক্তিপরিচিতি

যাঁহাদের সম্পর্কে গ্রন্থপরিচয়ে বিশদ আলোচনা আছে, বর্তমান তালিকায় তাঁহাদের নাম তারকাচিহ্নিত ; অপিচ গ্রন্থপরিচয়ের পৃষ্ঠা নির্দেশ করা হইয়াছে ।

* অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় । দ্রষ্টব্য পৃ ১৬০-৬১ ।

• অজিত । দ্রষ্টব্য পৃ ২৩৭ ।

অধ্যাপক (পৃ ৮৫), অধ্যাপকমহাশয় (পৃ ৮৩) । জগদীশচন্দ্র বসু ।
অরবিন্দ । জগদীশচন্দ্রের ভাগিনের শ্রীঅরবিন্দমোহন বসু, শাস্তি-
নিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র । ইহার কৃত বলাকাকাব্যের ইংরেজি অনুবাদ :
A Flight of Swans ।

‘আমার জামাতা ।’ শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী ।

‘আর্য্যা’, পৃ ১২ । জগদীশচন্দ্রের সহধর্মিণী অবলা বসু ।

* আর্য্যা সরলা । দ্রষ্টব্য পৃ ১৭১ ।

* ‘একটি জাপানী’ । ওকাকুরা কাকুজো । দ্রষ্টব্য পৃ ২৭১-৪২ ।

* ‘একটি জাপানী ছাত্র’ । হোরি মান । দ্রষ্টব্য পৃ ২১৩-১৪ ।

‘কুচবিহার’ । কুচবিহার-মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ ।

কুঞ্জবাবু । কুঞ্জলাল ঘোষ । শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কনিষ্ঠ জামাতা,
এক সময়ে শাস্তিনিকেতনের অধ্যাপক ছিলেন ।

‘চীনদেশী বন্ধু ।’ ইনি চীনদেশীয় কবি Tsemon-Hsu । ১৯২৪
সালে চীনভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথের সহিত ইহার অস্বল্পকাল হইয়াছিল, এই সময়ে
অধিকাংশ কাল তিনি কবির সঙ্গী ছিলেন । রবীন্দ্রনাথ *Talks in
China* গ্রন্থ (১৯২৫) ইচ্ছাকে উৎসর্গ করেন—“to whose kind

চিঠিপত্র : •

offices I owe my introduction to the great people of China.”

জগদানন্দ । জগদানন্দ রায়, শাস্তিনিকেতনের পরলোকগত অধ্যাপক, ‘বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার’ (১৩১৯) ও অন্যান্য বহু গ্রন্থের লেখক । বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ সরল সুবোধ্য ভাবে রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন । জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে ইহার প্রবন্ধাবলী অগ্রত্বে উল্লিখিত ।

* তিলক । লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক । দ্রষ্টব্য পৃ ২০২ ।

‘তোমার ক্ষুদ্র বন্ধু মীরা’, ‘তোমার বন্ধু মীরা’ বা ‘তোমার বন্ধুটি’ । রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা (জন্ম ১৮৯২) ।

ত্রিবেদী । রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী । জগদীশচন্দ্র বহু সম্বন্ধে ইহার প্রবন্ধ অগ্রত্বে উল্লিখিত ।

* দ্বিজেন্দ্রলালসাবু । দ্রষ্টব্য পৃ ১৬৪-৬৫ ।

দেবেন । জগদীশচন্দ্রের ভাগিনেয় ডক্টর দেবেন্দ্রমোহন বহু, বর্তমান বহু-বিজ্ঞান-মন্দিরের অধ্যক্ষ ।

ধর্মপাল । অনাগারিক ধর্মপাল (১৮৬৪-১৯৩৩), মহাবোধি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ।

‘নাটোর’ । রবীন্দ্রনাথের প্রিয়স্বহৃৎ নাটোরের মহারাজা জগদীশচন্দ্রনাথ রায় । পঞ্চভূত গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথ ইহাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন ।

* পরম্পনে । দ্রষ্টব্য পৃ ২০২ ।

পিসিমা । রবীন্দ্রনাথের সহধর্মিণী মৃগালিনী দেবীর পিসিমার সপত্নী রাজলক্ষ্মী দেবী । ‘শাস্তিনিকেতনে কবির নূতন বাড়িতে সংসারের ভার লইয়া তিনি শিশুদের প্রতিপালন করিয়াছেন দেখিয়াছি ।’— শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, “মৃগালিনী দেবী”, কবির কথা গ্রন্থ, পৃ ২৩ ।

বলেন্দ্রনাথ । রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র ও সাহিত্য-শিল্প ।

বিচার্ণব । শিবধন বিচার্ণব । রবীন্দ্রনাথের পরিবারে সংকৃত শিক্ষক, পরে শান্তিনিকেতনেও শিক্ষকতা করিয়াছিলেন । দ্রষ্টব্য "রবীন্দ্রনাথ ও পণ্ডিত শিবধন বিচার্ণব," কবিপ্রণাম গ্রন্থ ।

বেলা । রবীন্দ্রনাথের ছোষ্ঠা কন্যা মাদুরীলতা দেবী (১৮৮৬-১৯১৮) ।

* বোঠাকুরাণী, বোঠাকরণ । অবলা বহু ।

বোয়া । ছোষ্ঠপুত্র-বধু শ্রীপ্রতিমা দেবী ।

মহারাজ (পৃ ১৩, ১৭, ২৩-২৫) । ত্রিপুরার মহারাজ রাধাকিশোর দেবমণিক্য ।

* মিস নোব্ল, নিবেদিতা । মার্গারেট নোব্ল, ভগিনী নিবেদিতা ।
দ্রষ্টব্য পৃ ২০৫-০৭ ।

Miss Macleod । স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি-শীল
মার্কিন মহিলা ।

Mrs Knight । বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের
গল্পসংকলন প্রভৃতির অনুবাদিকা ।

মীরা । রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা (জন্ম ১৮৯২)

মোহিতবাবু । মোহিতচন্দ্র সেন (১৮৭০-১৯০৬) । এক কালে শান্তি-
নিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের অধ্যাপক । বিচিত্র প্রবন্ধ গ্রন্থে (১৯১৭)
বহুবৃত্তি অধ্যায়ে ও অন্তত্ব রবীন্দ্রনাথ ইহার স্বরণে শ্রদ্ধা নিবেদন
করিয়াছেন ।

যোগেন । শান্তিনিকেতনের ছাত্র যোগেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ।

রশ্মী । রবীন্দ্রনাথের ছোষ্ঠপুত্র রশ্মীন্দ্রনাথ (জন্ম ১৮৮৮) ।

রমণী । বিবেকনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ জামাতা রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়

চিঠিপত্র : ৬

(১৮৫২-১৯১৯) ; শাস্তিনিকেতন আশ্রমের প্রথম তিনজন স্বেচ্ছাসেবকের
অন্ততম । শাস্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রারম্ভ হইতে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত
বিদ্যালয়ের পরিচালনকার্যে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন । রবীন্দ্রনাথের
উদ্যোগে তিনি ত্রিপুরারাজ্যের মন্ত্রীপদেও বৃত্ত হইয়াছিলেন ।

রমেশবাবু । প্রখ্যাত দেশপ্রেমিক ও মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৭৮-
১৯০৯) । জগদীশচন্দ্র-প্রসঙ্গে ইহার পত্র পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়াছে ।

বেণুকা । রবীন্দ্রনাথের মধ্যমা কন্যা (১৮৯০-১৯০৩) ।

রোটেনস্টাইন । খ্যাতনামা ইংরেজ শিল্পী উইলিয়াম রোটেনস্টাইন
— এই ‘স্বভাববন্ধু’র যোগে রবীন্দ্রনাথ ১৯১২ সালে ‘ইংলণ্ডের ভাবুক-
সমাজে’ প্রথম সুপরিচিত হন । পথের সঞ্চয় গ্রন্থে “বন্ধু” প্রবন্ধে
রবীন্দ্রনাথ ইহার প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করিয়াছেন । রোটেনস্টাইন
রবীন্দ্রনাথের সহিত পরিচয় ও যোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন
তাঁহার *Men and Memories* গ্রন্থে ।

* লরেন্স । দ্রষ্টব্য পৃ ১৬১-৬৩ ।

লোকেন । লোকেন্দ্রনাথ পালিত । তারকনাথ পালিতের পুত্র,
রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যরসিক বন্ধু । দ্রষ্টব্য জীবনস্মৃতি গ্রন্থের “লোকেন
পালিত” অধ্যায় ।

শরৎ । রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতামাতা শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী ।

সমাজপতি । ‘সাহিত্য’-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি । ১৯০৮ সালের
ভাদ্র-সংখ্যা সাহিত্যে ‘রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী’-লিখিত “অধ্যাপক
জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার” প্রবন্ধ মুদ্রিত হয় ।

সম্পাদক (পৃ ৮৫) । নবপর্ষায় বঙ্গদর্শন -সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ।

সুকেশী । বিদ্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র কৃতীন্দ্রনাথের পত্নী ।

সুবোধ । সুবোধচন্দ্র মজুমদার, এককালে শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ।
কয়েকখানি গ্রন্থের রচয়িতা ।

সুবেন । সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র সুব্রহ্মনাথ ঠাকুর । অগণীশচন্দ্র বসু
সম্বন্ধে ইহার প্রবন্ধ অস্তু উল্লিখিত ।

সুব্রহ্মবাবু । সুব্রহ্মনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । স্বদেশী আন্দোলনের এক
পর্বে, দেশনায়ক প্রবন্ধে (পৃষ্ঠিত ১৫ বৈশাখ ১৩১৩) রবীন্দ্রনাথ “কোনো
একজনকে আমাদের অধিনায়ক বলিয়া স্বীকার” করিবার প্রস্তাব করেন,
এবং সুব্রহ্মনাথকে “সকলে মিলিয়া প্রকাশ্যভাবে দেশনায়করূপে বরণ
করিয়া লইবার স্তু” সমস্ত বঙ্গবাসীকে আহ্বান করেন । দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র-
রচনাবলী ১০, গ্রন্থপরিচয়, পৃ ৬১২-৫৬ ।

সুব্রহ্ম । সুব্রহ্মচন্দ্র নাগ ।

হেমলতা । দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের পত্নী ।

বিজ্ঞপ্তি

বর্তমান খণ্ড চিঠিপত্র পুস্তকে মুদ্রিত জগদীশচন্দ্রকে লিখিত ১, ১১, ১৩, ১৮, ৩১-৩৩ এবং অবলা বসু মহোদয়াকে লিখিত ১-৩ -সংখ্যক মূল পত্র, বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের অধ্যক্ষ শ্রীদেবেন্দ্রমোহন বসু ও তাঁহার সহধর্মিণী শ্রীমতী নলিনী বসু অল্পগ্রহপূর্বক ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। জগদীশচন্দ্রকে লিখিত ২১, ২২, ৩৪ ও ৩৫ এবং অবলা বসু মহোদয়াকে লিখিত ৪ ও ৬ -সংখ্যক মূল পত্র, অবলা বসু মহোদয়া বিশ্বভারতীকে দিয়াছিলেন, সেগুলি বিশ্বভারতী-রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত আছে। বর্তমান গ্রন্থ -প্রকাশে এই চিঠিগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে।

চিঠিপত্র গ্রন্থমালার পৃথাকমুদ্রিত রীতি অনুযায়ী মূল পত্রের, তদভাবে সাময়িক পত্রে প্রথম মুদ্রণের, পাঠ বানান ইত্যাদি রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে; এইজন্য গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে বানানপদ্ধতির তারতম্য লক্ষিত হইবে।

গ্রন্থপরিচয়ে উল্লিখিত কোনো কোনো আনুসঙ্গিক বিষয়, যথা কোনো কোনো ঘটনার তারিখ ও ব্যক্তিপরিচয় -প্রসঙ্গে, শ্রীঅমল হোম, শ্রীকুলপ্রসাদ সেনগুপ্ত, শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীদেবেন্দ্রমোহন বসু, শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীরঞ্জন রায় ও শ্রীরথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরীর পত্রোত্তর তথ্যনির্ণয়ে সহায়ক হইয়াছে। তথ্যনির্বাচন-পদ্ধতিতে শ্রীকানাই সামন্ত ও শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেনের পরামর্শ পাওয়া গিয়াছে। শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় কোনো কোনো উপকরণ ও তথ্য নির্দেশ করিয়া প্রকৃত সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীঅমল হোম কয়েকখানি ছাপ্রাপ্য পুস্তক ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের চিত্রখানি শ্রীপ্রণবেশ সিংহের সৌজন্যে প্রাপ্ত। আরও অনেকে অনেক বিষয়ে যে সাহায্য

চিঠিপত্র : ৩

করিয়াছেন গ্রন্থপরিচয়ে যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। সম্পাদক ও প্রকাশক ইহাদের সকলকেই কৃতজ্ঞতা জানাইতে ইচ্ছা করেন।

রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি চিঠিতে তারিখ নাই; পত্রে উল্লিখিত বিভিন্ন ঘটনা হইতে, বা রবীন্দ্রনাথকে লিখিত অগদীশচন্দ্রের পত্রাবলীর সাহায্যে তারিখ নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে; এই-সকল অসুমিত তারিখ [] বন্ধনী-মধ্যে মুদ্রিত। পত্রসংখ্যার নিম্নে ছোটো অক্ষরে যে তারিখ ছাপা হইয়াছে তাহা পত্রের অংশ নহে—পত্রপারস্পর্ষ সহজে লক্ষ্যগোচর করিবার উদ্দেশ্যে, পত্রে মুদ্রিত বা অসুমিত তারিখ ঐভাবে মুদ্রিত হইয়াছে।

—
LIBRARY

1911

1911

॥ শুद्धিপত্র ॥

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯২	শেষ	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	শ্রীরবীন্দ্রনাথ
১৭৯	১৪	ত্রিপুরার মহারাজ 'পূর্বপ্রতিশ্রুত	'ত্রিপুরার মহারাজ...পূর্বপ্রতিশ্রুত
১৯৯		পাদটীকার শেষে বসিবে— পৃ ২০৫	
২১৯	১৯	ভদ্রানীভদ্র	ভূতপূর্ব
১৪৮	২৫	Mascine মুদ্রণপ্রমাদ হইতে পারে, Mascart হওয়া সম্ভব । মূল পত্র এই স্থলে সহজপাঠ্য নহে ।	

